ঐতিহাসিক
সিরিজ উপন্যাস
সুলতান
মাহমুদ গজনবীর
ভারত
অভিযান

ভারত অভিযান - ৫

ভারত অভিযান

(পঞ্চম খণ্ড)

এনায়েতুল্লাহ

অনুবাদ

শহীদুল ইসলাম

গবেষক, সম্পাদক, গ্রন্থকার

এদারায়ে কুরআন

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল — ২০০৯

প্রকাশক ▶ আরিফ বিল্লাহ, এদারায়ে কুরআন, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, স্বত্ব ▶ সংরক্ষিত, প্রচ্ছদ ▶ নাজমুল হায়দার
কম্পিউটার কম্পোজ ▶ এম. হক কম্পিউটার্স, মুদ্রণ ▶ ফারিয়া প্রিন্টিং প্রেস, মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

মূল্য ঃ একশত ষাট টাকা মাত্র

BHAROT OVIJAN-5 : Writer Enayatullah, Translated by Shahidul Islam, Published by Edara-e- Quran, 50 Banglabazar, Dhaka-1100, Printed by Rafia Printing Press. Date of Publication April 2009.

PRICE TAKA ONE HUNDRED SIXTY ONLY

ISBN 984-70109-0000-3 SET

উৎসর্গ

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পিলখানার বিডিআর সদর দফতরে চক্রান্তমূলক হত্যাকাণ্ডে নিহত সেনা অফিসারদের রূহের মাগফিরাত এবং প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত সকল সদস্যের ঐক্য, সংহতি ও সাফল্য কামনায়–
যারা হবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়–

'শির দেগা নাহি দেগা আমামা'

এর মূর্ত প্রতীক।

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! 'এদারায়ে কুরআন' কর্তৃক প্রকাশিত সুলতান মাহমূদ এর ভারত অভিযান সিরিজের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। এজন্য আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং পাঠক মহলকে জানাচ্ছি মোবারকবাদ। নিয়মিত বিরতি দিয়ে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশের ঐকান্তিক ইচ্ছা আমাদের ছিল। কিন্তু নানাবিধ কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের বিলম্বের কারণে অনেক আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা ও সুহৃদ আমাদের তাকিদ দিয়েছেন, কেউ কেউ তো রীতিমতো অসন্তোষ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বস্তুত সম্মানিত পাঠকদের এই তাগাদা, ক্ষোভ একজন প্রকাশক হিসেবে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। কারণ সিরিজের গোটা উপাখ্যানটি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়বোধ আমার আছে। সেই সাথে একটি প্রিয় সিরিজের অপঠিত অংশের জন্যে একজন উৎসাহী পাঠকের মধ্যে কতোটা তাড়না থাকে এই অনুভূতিটুকুও আমাকে তাড়িয়েছে। মোদ্দাকথা হলো, বিলম্ব বিলম্বই। কোনর জবাবদিহিতাই বই সামনে পেশ করা ছাড়া পাঠকের আহত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। অতএব শত যৌক্তিক কারণ থাকার পরও সবার কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে পঞ্চম খণ্ডটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে সুখানুভব করছি।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতার পরও আমরা এ খণ্ডটি আগেরগুলোর চেয়ে আরো সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তবুও মুদ্রণ প্রমাদ ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। বিজ্ঞমহলের কাছে যে কোন ত্রুটি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের মতো পঞ্চম খণ্ডটিও পাঠক-পাঠিকা মহলে আদৃত হলে আমাদের সার্বিক প্রয়াস সার্থক হবে।

—প্রকাশক

লেখকের কথা

"মাহমূদ গজনবীর ভারত অভিযান" সিরিজের এটি পঞ্চম খণ্ড। উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান মাহমূদ গজনবী সতের বার ভারত অভিযান পরিচালনাকারী মহানায়ক হিসেবে খ্যাত। সুলতান মাহমূদকে আরো খ্যাতি দিয়েছে পৌত্তলিক ভারতের অন্যতম দু' ঐতিহাসিক মন্দির সোমনাথ ও থানেশ্বরীতে আক্রমণকারী হিসেবে। ঐসব মন্দিরের মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন মাহমূদ। কিন্তু উপমহাদেশের পাঠ্যপুস্তকে এবং ইতিহাসে মাহমূদের কীর্তির চেয়ে দুষ্কৃতির চিত্রই বেশী লিখিত হয়েছে। হিন্দু ও ইংরেজদের রচিত এসব ইতিহাসে এই মহানায়কের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে তাঁর সুখ্যাতি চাপা পড়ে গেছে। মুসলিম বিদ্বেষের ভাবাদর্শে রচিত ইতিহাস এবং পরবর্তীতে সেইসব অপইতিহাসের ভিত্তিতে প্রণীত মুসলিম লেখকরাও মাহমূদের জীবনকর্ম যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের বোঝার উপায় নেই, তিনি যে প্রকৃতই একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলামের সৈনিক ছিলেন, ইসলামের বিধি-বিধান তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। জাতিশত্রুদের প্রতিহত করে খাঁটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করণের জন্যেই নিবেদিত ছিল তার সকল প্রয়াস। অপলেখকদের রচিত ইতিহাস পড়লে মনে হয়, সুলতান মাহমূদ ছিলেন লুটেরা, আগ্রাসী ও হিংস্র। বারবার তিনি ভারতের মন্দিরগুলোতে আক্রমণ করে সোনা-দানা, মণি-মুক্তা লুট করে গজনী নিয়ে যেতেন। ভারতের মানুষের উন্নতি কিংবা ভারত কেন্দ্রিক মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তার কখনো ছিলো না। যদি তৎকালীন ভারতের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করা এবং পৌত্তলিকতা দূর করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার একান্তই ইচ্ছা তাঁর থাকতো, তবে তিনি কেন মোগলদের মতো ভারতে বসতি গেড়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন না? ইত্যাকার বহু কলঙ্ক এঁটে তার চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে।

মাহমূদ কেন বার বার ভারতে অভিযান চালাতেন? মন্দিরগুলো কেন তার টার্গেট ছিল? সফল বিজয়ের পড়ও কেন তাকে বার বার ফিরে যেতে হতো গজনী? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব; ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ সৈনিক সুলতান মাহমূদকে তুলে ধরার জন্যে আমার এই প্রয়াস। নির্ভরযোগ্য দলিলাদি ও বিশুদ্ধ ইতিহাস ঘেটে আমি এই বইয়ে মাহমূদের

প্রকৃত জীবন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রকৃত পক্ষে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর মতোই মাহমূদকেও স্বজাতির গাদ্দার এবং বিধর্মী পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে একই সাথে লড়াই করতে হয়েছে। যতো বার তিনি ভারত অভিযান চালিয়েছেন, অভিযান শেষ হতে না হতেই খবর আসতো, সুযোগ সন্ধানী সাম্রাজ্যলোভী প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা গজনী আক্রমণ করছে। কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাধ্য হয়েই মাহমূদকে গজনী ফিরে যেতে হতো। একপেশে ইতিহাসে লেখা হয়েছে, সুলতান মাহমূদ সতের বার ভারত অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু একথা বলা হয়নি, হিন্দু রাজা-মহারাজারা মাহমূদকে উৎখাত করার জন্যে কতো শত বার গজনীর দিকে আগ্রাসন চালিয়ে ছিল।

সুলতান মাহমূদের বারবার ভারত অভিযান ছিল মূলত শত্রুদের দমিয়ে রাখার এক কৌশল। তিনি যদি এদের দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হতেন, তবে হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকতাবাদ সাগর পাড়ি দিয়ে আরব পর্যন্ত বিস্তৃত হতো।

মাহমূদের পিতা সুবক্তগীন তাকে অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, "বেটা! ভারতের রাজাদের কখনও স্বস্তিতে থাকতে দিবে না। এরা গজনী সালাতানাতকে উৎখাত করে পৌত্তলিকতার সয়লাবে কাবাকেও ভাসাতে চায়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়ের মত ভারতীয় মুসলমানদেরকে হিন্দুরা জোর জবরদস্তি হিন্দু বানাচ্ছে। এদের ঈমান রক্ষার্থে তোমাকে পৌত্তলিকতার দুর্গ গুড়িয়ে দিতে হবে। ভারতের অগণিত নির্যাতিত বনি আদমকে আযাদ করতে হবে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।"

আলবিরুনী, ফিরিশ্তা, গারদিজী, উতবী, বাইহাকীর মতো বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ তৎকালীন সবচেয়ে বড় বুযুর্গ ও ওলী শাইখ আবুল হাসান কিরখানীর মুরীদ ছিলেন। তিনি বিজয়ী এলাকায় তার হেদায়েত মতো পুরোপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি নিজে কিরখানীর দরবারে যেতেন। কখনও তিনি তাঁর পীরকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠাননি। উপরন্তু তিনি ছদ্মবেশে পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে ইসলাহ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে কখনও নিজেকে সুলতানের দূত হিসেবে পরিচয় দিতেন। একবার তো আবুল হাসান কিরখানী মজলিসে বলেই ফেললেন, "আমার একথা ভাবতে ভালো লাগে যে, গজনীর সুলতানের দূত সুলতান নিজেই হয়ে থাকেন। এটা প্রকৃতই মুসলম[illegible] আলামত।"

মাহমূদ কুরআন, হাদীস ও দীনি ইলম প্রচারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর দরবারে আলেমদের যথাযথ মর্যাদা ছিল। সব সময় তার বাহিনীতে শত্রু পক্ষের চেয়ে সৈন্যবল কম হতো কিন্তু তিনি সব সময়ই বিজয়ী হতেন। বহুবার এমন হয়েছে যে, তার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ময়দানে দু'রাকাত নামায আদায় করে মোনাজাত করতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, "আমি বিজয়ের আশ্বাস পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে।" বাস্তবেও তাই হয়েছে।

অনেকেই সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী আর সুলতান মাহমূদকে একই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বীর সেনানী মনে করেন। অবশ্য তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একই ছিল। তাদের মাঝে শুধু ক্ষেত্র ও প্রতিপক্ষের পার্থক্য ছিল। আইয়ুবীর প্রতিপক্ষ ছিল ইহুদী ও খৃস্টশক্তি আর মাহমূদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দু পৌত্তলিক রাজন্যবর্গ। ইহুদী ও খৃস্টানরা সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর সেনাদের ঘায়েল করতো প্রশিক্ষিত সুন্দরী রমণী ব্যবহার করে নারী গোয়েন্দা দিয়ে আর এর বিপরীতে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে এরা ব্যবহার করতো শয়তানী যাদু। তবে ইহুদী-খৃস্টানদের চেয়ে হিন্দুদের গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল দুর্বল কিন্তু সুলতানের গোয়েন্দারা ছিল তৎপর ও চৌকস।

তবে একথা বলতেই হবে, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা যেমন দৃঢ়চিত্ত ও লক্ষ্য অর্জনে অবিচল ছিল, মাহমূদের গোয়েন্দারা ছিল নৈতিক দিক দিয়ে ততোটাই দুর্বল। এদের অনেকেই হিন্দু নারী ও যাদুর ফাঁদে আটতে যেতো। অথবা হিন্দুস্তানের মুসলিম নামের কুলাঙ্গররা এদের ধরিয়ে দিতো। তারপরও সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর চেয়ে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা কার্যক্রম ছিল বেশি ফলদায়ক।

ইতিহাসকে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য, বিশেষ করে তরুণদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশনের জন্যে গল্পের মতো করে রচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থ। বাস্তবে এর সবটুকুই সত্যিকার ইতিহাসের নির্যাস। আশা করি আমাদের নতুন প্রজন্ম ও তরুণরা এই সিরিজ পড়ে শত্রু-মিত্রের পার্থক্য, এদের আচরণ ও স্বভাব জেনে এবং আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে পূর্বসূরীদের পথে চলার দিশা পাবে।

এনায়েতুল্লাহ
লাহোর।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

রত্না হলো রাজিয়া

কন্নৌজ এখন গযনীর দখলে। গযনী বাহিনীর সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকী কন্নৌজের গভর্নর। কন্নৌজের মহারাজা রাজ্যপাল গযনী বাহিনী কন্নৌজ অবরোধের আগেই কন্নৌজ ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে গিয়েছিলেন। কন্নৌজে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর রাজা রাজ্যপাল ছদ্মবেশে কন্নৌজ এসে মুসলিম শাসক সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকীর কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন এবং তার লোকদের পুনর্বাসনের জন্যে আব্দুল কাদেরের কাছে রাড়ী নামক স্থানে বসতি স্থাপনের অনুমতি চাইলেন। সেই সাথে আবেদন করলেন, তাকে সেখানে নগর স্থাপনের অনুমতি দেয়া হোক এবং রাড়ীকে রাজধানী করে পুনরায় তার সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করার সুযোগ দেয়া হোক।

গভর্নর আব্দুল কাদের সেলজুকী রাজা রাজ্যপালের আবেদনে সাড়া দিলেন। তিনি বললেন–

আপনাকে আমি রাড়ীতে রাজধানী গড়ে তোলার অনুমতি দিচ্ছি! কিন্তু পরাজয় স্বীকার করার পর মুসলিম শাসনাধীন থাকতে হলে আপনাকে যে সব শর্ত মেনে নিতে হবে সেগুলো সুলতান মাহমূদ ঠিক করবেন এবং তিনিই নির্ধারণ করবেন আপনাকে কি পরিমাণ যুদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং বাৎসরিক খাজনার পরিমাণ কি হবে? তাছাড়া আপনি কি কি সুবিধা ভোগ করতে পারবেন, আপনার কোন কোন বিষয় আমাদের কর্তৃত্বে থাকবে তাও সুলতানই নির্ধারণ করবেন।

যে কোন শর্ত মেনে নিয়ে মুসলিম শাসনাধীনে থেকে রাজা রাজ্যপাল তার লোক লস্কর নিয়ে কন্নৌজের পরিবর্তে রাড়ীকে রাজধানী করে রাজত্ব পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিলেন। যাতে তার অস্তিত্বও টিকে থাকে এবং তার অনুগত সৈনিক ও প্রজারা নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে।

রাজ্যপাল স্বেচ্ছায় কন্নৌজ এসে গযনী সুলতানের অধীনে রাড়ীকে রাজধানী করে নিজের লোকদের পুনর্বাসন করতে চান– এ খবর দিয়ে সেই দিনই গযনী সুলতানের কাছে দূত পাঠালেন কন্নৌজের শাসক আব্দুল কাদের সেলজুকী।

খবর পেয়ে দূতের কাছে আদিঅন্ত সবকিছু জেনে সুলতান মাহমূদ রাজ্যপালের জন্যে পালনীয় শর্তাদি ঠিক করে দিলেন। সুলতান যে সব শর্ত দিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল–

'রাজ্যপাল কখনো গযনীবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেন না। গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে কাউকে প্ররোচনা দেয়া বা সামরিক সহযোগিতা করতে পারবেন না।

নতুন রাজধানীতে রাজা রাজ্যপালের যে সব সৈনিক থাকবে তারা শুধু অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজ করবে; কিন্তু তারা থাকবে গযনীর নিয়ন্ত্রণে। স্বায়ত্তশাসনের মতো রাজ্যপাল সুবিধাদি ভোগ করবেন, প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা ট্যাক্স ইত্যাদি উসূল করবেন। কিন্তু তার সবকিছু থাকবে গযনী সরকারের কাছে জাবাদেহিমূলক। রাজ্যপালের উপর যদি কোন বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তবে গযনী বাহিনী তাকে সাহায্য করবে। মোটকথা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে রাজ্যপালের উপর। তবে সার্বিক নিরাপত্তা ও সামরিক কর্তৃত্ব থাকবে গযনী বাহিনীর হাতে! বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ ও রাষ্ট্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে গযনী বাহিনীর কাছে।

গযনী সুলতানের দেয়া সব শর্তই রাজা রাজ্যপাল মেনে নিলেন এবং তিনি সুলতানকে নির্ধারিত অংকের ক্ষতিপূরণ ও বার্ষিক খাজনা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

স্বেচ্ছায় গযনীর গভর্ণর আব্দুল কাদেরের কাছে আত্মসমর্পণের পর রাজ্যপাল নিজেই বলেছিলেন, গযনী বাহিনী কন্নৌজ অবরোধ করার আগেই তিনি তার রাজ্যের সকল রাজকীয় সম্পদ অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। অতএব সুলতান মাহমূদকে ধার্য করা ক্ষতিপূরণ দিতে তার কোন আপত্তি নেই এবং তাতে তার কোন বেগও পোহাতে হবে না।

সুলতানের নির্দেশ মতো গভর্ণর আব্দুল কাদের রাজ্যপালের কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও বার্ষিক খাজনা উসূল করে নিলেন। সুলতান মাহমূদ গভর্ণর আব্দুল কাদের সেলজুকীকে নির্দেশ দিলেন, 'রাজা রাজ্যপালের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তার সম্পর্কে সবধরনের সংবাদ সব সময় গযনী পাঠাতে থাকবে।

সুলতানের এই নির্দেশ থেকে বুঝা যায়, রাজা রাজ্যপাল সম্পর্কে সুলতানের মধ্যে একটা কৌতুহল ছিল। অথবা রাজা রাজ্যপালের মনোভাবের উপর তিনি নির্ভর করতে পারছিলেন না। কারণ, রাজ্যপাল সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে

নেয়ায় সেখানকার অন্যান্য হিন্দু রাজাদের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। সুলতান মাহমূদ প্রকারান্তরে চাচ্ছিলেন রাজা-রাজ্যপালকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে। যাতে করে সে পুনর্বার শক্তি সঞ্চয় করে গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ না পায়।

মহারাজা রাজ্যপাল বশ্যতা স্বীকার করে যুদ্ধ ক্ষতিপূরণ ও সুলতানকে বাৎসরিক খাজনা পরিশোধ করে গযনী সরকারের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে ছিলেন বটে, কিন্তু এতে সারা হিন্দুস্তান রাজ্যপালের শত্রুতে পরিণত হলো। তৎকালীন হিন্দুস্তানের পার্শবর্তী মহাশক্তি তিন শক্তিধর হিন্দুরাজা রাজ্যপালের এতোটাই শত্রুতে পরিণত হলো যে, তারা রাজ্যপালকে হত্যা করার চেষ্টায় মেতে উঠলো।

রাজ্যপালের শত্রুদের মধ্যে কালাঞ্জরের রাজা গোবিন্দ ছিল অন্যতম। দ্বিতীয় ছিল গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন, তৃতীয় লাহোরের মহারাজা তরলোচনপাল। লাহোরের মহারাজা ভীমপাল তখন বৃদ্ধ ও অসুস্থ। ফলে তার ছোট ভাই তরলোচনপালকে লাহোরের রাজা ঘোষণা করা হয়। তরলোচনপাল রাজত্বের আসনে বসে কালাঞ্জর ও গোয়ালিয়রের রাজাদের সাথে হাত মিলিয়ে নতুন উদ্যমে গযনীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করল।

অবশ্য রাজা তরলোচনের বড় ভাই ভীমপাল সুলতান মাহমূদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে সুলতানের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল এবং গযনীর সুলতানকে বাৎসরিক খাজনা পরিশোধ করে গযনীর বিরুদ্ধে কোন ধরণের সামরিক তৎপরতায় যোগ দিবে না বলে চুক্তিতে সই করেছিল। ফলে রাজা তরলোচন পালের পক্ষে প্রকাশ্যে গযনী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব ছিলো না। কিন্তু গোপনে সে রাজা গোবিন্দ ও অর্জুনের সাথে মৈত্রী গড়ে তোলে এবং তিন রাজ্যের সেনাবাহিনী গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

তরলোচনপাল তার সৈন্যদের প্রকাশ্যে না এনে কন্নৌজ থেকে দূরে একটি ঘন জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছিল। সে অন্য রাজাদের বলেছিল তার সেনারা প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। প্রয়োজনের সময় সে তার সেনাদের প্রকাশ্যে নিয়ে আসবে। প্রকৃতপক্ষে তরলোচনপালের সামরিক প্রস্তুতি এবং লাহোর থেকে তার সেনাদের এনে কন্নৌজের কাছের কোন জঙ্গলে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটি ছিল অন্যান্য হিন্দু রাজাদের জন্য একটা গোলক ধাঁধা। তারা তরলোচনপালকে ঠিক বিশ্বাসও করতে পারছিল না, আবার তার বাহিনীকে এ দিকে নিয়ে আসার ব্যাপারটিকে অস্বীকারও করতে পারছিল না।

অবশ্য এই তিন রাজা মনে প্রাণে চেষ্টা করছিল, রাজা রাজ্যপালকে তাদের পক্ষে আনতে এবং গযনীর বশ্যতা প্রত্যাখ্যান করে তাদের কাতারে শামিল করতে। কিন্তু রাজ্যপাল ইচ্ছা করেই এসব রাজাদের সাথে সবধরণের যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদের দেয়া কোন সংবাদ যেমন গ্রহণ করতেন না, তিনিও তাদের সাথে কোন ধরনের যোগাযোগের চেষ্টা করতেন না। এর কারণ ছিল, গযনী সরকার তার তৎপরতা পর্যবেক্ষণের জন্য রাজ্যপালের নতুন রাজধানী রাড়ীতে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগ করে রেখেছিল এবং সামরিক বাহিনীর কয়েকজন কমাণ্ডার পর্যায়ের ব্যক্তি সব সময় রাড়ীতে অবস্থান করে রাজ্যপালের সার্বিক কাজ কর্ম ও তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করতো।

রাড়ীতে গযনী বাহিনীর যে ক'জন সেনা কমান্ডারকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিল কমান্ডার যুলকারনাইন। কমান্ডার যুলকারনাইন ছিল হিন্দুস্তানের যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞতার অধিকারী। সে হিন্দুস্তানের প্রায় সবগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তাছাড়া দীর্ঘ দিন সে লাহোর ও মুলতানে অবস্থান করেছিল। ফলে অনায়াসে যুলকারনাইন স্থানীয় ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারতো। স্থানীয় ভাষা জানার কারণে হিন্দুদের মনোভাব সে ভালো বুঝতে পারতো। এজন্য যুলকারনাইনকে রাড়ীতে মহারাজা রাজ্যপালের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

যুলকারনাইন ছিল দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক। একটা স্মিতহাসি সব সময় তার মুখে দেখা যেতো। সে যে কোন মানুষের সাথে খুব সহজেই মিশতে পারতো, ফলে হিন্দুদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যুলকারনাইন।

ঘটনাক্রমে এই যুলকারনাইন এক হিন্দু তরুণীকে বিয়ে করেছিল। এই তরুণীর নাম ছিল রত্মা। অবশ্য যুলকারনাইনের সাথে বিয়ের আগেই রত্না তার নাম বদল করে রাজিয়া রেখেছিল। এই রত্মাকে যুলকারনাইন পেয়েছিল মথুরায়। এক ভয়ানক পরিস্থিতিতে রত্মা যুলকারনাইনের সান্নিধ্যে আসে।

সুলতান মাহমূদ যখন মথুরা আক্রমণ করেছিলেন তখন ছিল পূজার মৌসুম। পূজা দেয়ার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার হিন্দু ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে মথুরায় এসে জমায়েত হয়েছিল। পুরো মথুরা শহর আগতদের তাঁবুতে ভরে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ এক রাতের তুফান ও ঘূর্ণিঝড় গোটা শহর লন্ডভণ্ড করে ফেলে। তাঁবু উড়িয়ে নেয়। শত শত মানুষ গাছ কিংবা বিধ্বস্ত ঘর বাড়ির নিচে চাপা পড়ে মারা যায়। প্রচণ্ড ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় মথুরা নগরী।

ঠিক সেই ঝড়ের দু'দিন পর গযনীবাহিনী মথুরা আক্রমণ করেছিল। হিন্দু বাহিনীর সাথে শহরের বাইরে গযনী বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। মথুরার আকাশে তখন শকুনের উড়াউড়ি আর বাতাসে মৃত লাশের গন্ধ। সর্বত্র ভগ্নস্তূপ। মথুরার সৈন্যরা গযনী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

এক রাতে পাহারার জন্যে যুলকারনাইন দুই সঙ্গীকে নিয়ে শহরের বাইরে টহল দিচ্ছিল। ভয়াবহ পরিস্থিতি সবখানে। যত্রতত্র গাছপালা ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মৃত মানুষের দেহ। হাজার হাজার তাঁবুর জঞ্জাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সর্বত্র। শহরের ভেতরে ও বাইরে বহু লোক দুই বাহিনীর সংঘর্ষের সময় পদপিষ্ট হয়ে মারা পড়ে।

ঘোর সন্ধ্যার অন্ধকারে টহলরত অবস্থায় হঠাৎ যুলকারনাইনের কানে ভেসে এলো কারো পালানোর শব্দ। যুলকারনাইন ভেসে আসা শব্দের দিকে ঘোড়া হাঁকাল। ঘোড়ার খুঁড়ে শব্দ শুনে পলায়নপর লোকটি থেমে গেল এবং চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। যুলকারনাইন ঘোড়া থেকে নেমে দেখল, ভেঙ্গে পড়া একটি গাছের আড়ালে একটি তরুণী মেয়ে নিজেকে লুকাতে চেষ্টা করছে। যুলকারনাইন হাত বাড়িয়ে যেই মেয়েটিকে ধরতে গেল, মেয়েটি গলা চড়িয়ে কান্না শুরু করল। দেখেই বুঝা যাচ্ছিল মেয়েটি ভয় ও আতংকে কাঁদছে।

যুলকারনাইন মেয়েটির আরো কাছে গিয়ে তাকে যখন টেনে দাঁড় করাল, তখন বুঝতে পারল, মেয়েটি যুবতী, সম্ভবত কুমারী।

আমাকে মেরে ফেলো– আতংকগ্রস্ত কণ্ঠে বললো মেয়েটি। আমার গায়ে হাত দিয়ো না, আমাকে মেরে ফেলো। আমাকে তুমি তুলে নিয়ো না– নিবেদনের সুরে বললো মেয়েটি।

এখানে আমরা কোন মেয়েকে হত্যা করতে আসিনি– বললো যুলকারনাইন। আমরা নারী ও মেয়েদের মর্যাদা দিতে এসেছি। তাদের জীবন বাঁচাতে এসেছি। আমরা অসহায় জীবন ও ইজ্জতের হেফাযত করতে এসেছি। বলো মেয়ে? তুমি কোথায় যেতে চাও, আমরা তোমাকে সেখানেই পৌছে দেবো।

আমি কোথাও যেতে চাই না, আমি মরতে চাই। আমাকে হত্যা করে আমার মা বাবার কাছে পৌঁছে দাও– কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো তরুণী।

তোমার মা বাবা কি মারা গেছে?

হ্যাঁ, তারা উভয়েই মারা গেছে। আমি যে স্থান থেকে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি, সেখানে তাদের মরদেহ পড়ে আছে। আমার একটি যুবক ভাই ছিল সেও মারা গেছে।

এই মেয়েটি বহু দূর থেকে তার মা বাবা ও ভাইয়ের সাথে মথুরা এসেছিল পূজা দিতে। ঝড়ের দিন তাদের তাঁবু বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তার যুবক ভাইটি গাছ চাপা পড়ে মারা যায়। আর দু'দিন পর যুদ্ধ শুরু হলে তার বাবা ও মা ভীত সন্ত্রস্ত ছুটন্ত মানুষের ভিড়ে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ঠ হয়ে মারা যায়। যুদ্ধ শুরু হলে মেয়েটিকে তার মা বাবা এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। ফলে সে বেঁচে যায়।

গযনী সৈন্যদের এদিকে আসতে দেখে সে আতংকে কেঁপে উঠে, চরম আতঙ্কে দৌড়ে পালাতে গিয়ে পড়ে যায়। তার মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে সে ভাঙ্গা গাছের আড়ালে বসে পড়ে। যুলকারনাইন এসে তাকে ধরে দাড় করায়। এই অবস্থায় মেয়েটিকে রেখে যাওয়া সমীচীন মনে করেনি যুলকারনাইন। সে মেয়েটিকে আশ্বস্ত করতে চায়। কিন্তু মেয়েটি তার পায়ে পড়ে মিনতি করতে থাকে–

আমি কুমারী। পরপুরুষের হাতে নিগৃহীত হওয়ার চেয়ে আমার মরে যাওয়া ভালো। দয়া করে তুমি আমাকে মেরে ফেলো।

যুলকারনাইন কিছুতেই তরুণীকে নিজের সাথে নিয়ে যেতে পারছিল না, বাধ্য হয়েই যুলকারনাইন তাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। তাও অসম্ভব হওয়ায় এক পর্যায়ে সে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিল। যুলকারনাইন তাকে বার বার অভয় দিতে দিতে বলছিল–

এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে যাওয়াটা হবে আমাদের জন্যে অন্যায়। বিশ্বাস করো, আমাদের হাতে তোমার কোন ধরনের নির্যাতিত হওয়ার আশংকা নেই। নারীর মর্যাদা রক্ষাকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেই। তোমার গায়ে কেউ হাত দেবে না। তোমার আতংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তুমি নির্ভয়ে আমার সাথে এসো।

মেয়েটিকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যুলকারনাইন তার উর্ধতন সেনা কমান্ডারের কাছে এলো। সময়টা ছিল খুবই জটিল। এ সময় কোন অসহায় মেয়েকে সেবা দেয়ার অবকাশ ছিল না। কমান্ডার যুলকারনাইনকে বললেন, একে তোমার কাছে রাখতে চাইলে রাখতে পারো, নয়তো কোন হিন্দুর কাছে রেখে আসতে পারো। তবে সতর্ক থাকবে এ যেনো তোমার কর্তব্য পালনে কোন ধরনের ক্রটির কারণ না হয়।

অবশ্য সে দিন এই অসহায় হিন্দু তরুণী যুলকারনাইনের কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে কোন ক্রটি সৃষ্টি করতে পারেনি। তার কর্তব্য কর্মে কোন বাধা হয়নি, তবে তার জীবনের বাঁধনে আটকা পড়ে এই তরুণী! হয়ে পড়ে জীবন সঙ্গিনী।

সেই রাতের বাকী সময়টা তরুণী যুলকারনাইনের তাঁবুতেই কাটায়। যেহেতু যুলকারনাইন ছিল কমান্ডার। এজন্য তার জন্য ছিল স্বতন্ত্র তাঁবু। সেই তাঁবুতে পড়ে মেয়েটি কাঁদতে থাকল এবং তাকে মেরে ফেলার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল। যুলকারনাইন তাকে নানাভাবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তরুণী কিছুতেই আশ্বস্তবোধ করছিল না। এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে মেয়েটির চোখ বন্ধ হয়ে এলো। ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুম থেকে জেগে সে যখন যুলকারনাইনের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখতে পেল না তখন নিজের মধ্যেও কোন অস্বাভাবিকতা অনুভব করল না। তার মনে হলো মা বাবার সান্নিধ্যে যেভাবে ঘুমাতো সেভাবেই ঘুমিয়েছে সে।

এমন অবস্থা দেখে তরুণী যুলকারনাইনকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার? আমাকে কি তোমার মনে ধরেনি?

তোমাকে যদি ভালো না লাগতো, তাহলে আমার সাথে না রেখে তোমাকে অন্য কোন স্থানে রেখে আসতাম। বললো যুলকারনাইন। তুমি বলছিলে না, তুমি কুমারী। আমি বলছিলাম– হ্যাঁ, তুমি খুবই সুন্দরী। আমি তোমাকে একজন পবিত্র মেয়েই মনে করেছি এবং পবিত্র রাখারই মনস্থির করেছি। এখন মন থেকে সব ভয় ঝেড়ে ফেলে বলো– কোথায় যেতে চাও?

তরুণী কোন কথা না বলে দীর্ঘ সময় যুলকারনাইনের দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় তার দু'পা জড়িয়ে ধরে পায়ে মাথা ঠেকালো। যুলকারনাইন দ্রুত তার পা সরিয়ে নিয়ে বললো– আমাদের ধর্মে কোন মানুষকে অপর মানুষের সেজদা করার অনুমতি নেই। তুমি আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আমাকে গোনাহগার বানিও না। বলো, কোথায় যেতে চাও তুমি?

তরুণী একটি দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বললো, মেয়ে হয়ে জন্মালে মা বাবার ঘর ছেড়ে একদিন না একদিন কারো না কারো ঘরে যেতেই হয়। আমার মা বাবা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন তুমিই বলো, আমি কি করবো? কোথায় যাবো?

আমার সাথে থাকতে চাইলে তোমাকে তোমার ধর্মত্যাগ করতে হবে, বললো যুলকারনাইন। কিন্তু তোমর ধর্ম-ত্যাগ করলে অল্প দিনের মধ্যেই তুমি অনুভব করতে পারবে, ধর্মত্যাগ করে তুমি ভালই করেছো।

যুলকারনাইনের মুখে ধর্মত্যাগের কথা শুনে তরুণী চিন্তায় পড়ে গেল। যুলকারনাইন তরুণীকে বুঝতে দিতে চাচ্ছিল না, সে তরুণীর প্রেমে পড়ে গেছে। তরুণী ছিল খুব সুন্দরী, চলন বলনে মার্জিত। তরুণীর মুখের ভাষা ও কণ্ঠস্বর যে

কারো হৃদয় রাজ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করার মতো আকর্ষণীয়। যুলকারনাইন অনুভব করছিল, এই তরুণীকে তার বিয়ে করে ফেলা উচিত। নয়তো এই মেয়ে তার কর্তব্য কাজে বাধা হয়ে উঠতে পারে। এমনিতেও যুলকারনাইনের মনে প্রচণ্ড একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সে কিছুতেই এই তরুণীকে হারাতে চাচ্ছিল না কিন্তু হিন্দু একটি মেয়েকে সাথে রাখা এবং তাকে বিয়ে করাও সম্ভব ছিল না।

আমি তোমর উপর কোন শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছি না। তোমাকে অসহায় পেয়ে আমি তোমার মনের বিপরীতে কোন কিছু করতে বাধ্য করছি না। যদি চলে যেতে চাও, তবে বলো, কোথায় যেতে চাও?

আমাকে হরিকৃষ্ণের পায়ে বসিয়ে দাও, বাকী জীবন মন্দিরে দেবীর পূজা করে কাটিয়ে দেবো।

তরুণীর মুখে একথা শুনে যুলকারনাইনের রক্তে আগুন ধরে গেল। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– নিজেকে কেন ধোঁকা দিচ্ছো। এসব মন্দিরে কি হয় তা সবাই জানে। এসব রহস্য আর গোপন নেই যে, দেব-দেবীর নামে জীবন উৎসর্গকারিণী কুমারীদেরকে সব সময় মন্দিরের পুরোহিতরা রক্ষিতার মতো ব্যবহার করে। এই মন্দিরে গিয়ে তোমাকেও তো পুরোহিতদের রক্ষিতা হয়েই কাটাতে হবে। তোমাদের পাথরের গড়া দেবদেবী আসলে একটা ধোঁকা। কেন নিজে এই নোংরা জীবন বেছে নিতে চাচ্ছো। তোমার বয়স কম, জীবন জগত সম্পর্কে তোমার ধারণাও কম। এজন্যই তোমার প্রতি আমি এতটা দরদ দেখাচ্ছি। নয়তো তুমি তো আমার কাছে একজন বিধর্মী মেয়ে ছাড়া কিছুই নও। তোমার মতো একজন তরুণীই তো আর গোটা হিন্দুস্তান নয়। আমি এতো দূর থেকে শুধু তোমার মতো একটি তরুণীকে পাওয়ার জন্যে আসিনি। আমি এসেছি তোমাদের এই পূজনীয় মূর্তি ধ্বংস করতে। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে দেখো, তোমাদের দেবদেবীদেরকে আমরা টুকরো টুকরো করে ফেলে রেখেছি। মানুষ এগুলোকে পায়ে পিষে আসা যাওয়া করছে।

যুলকারনাইনের কথা শুনে তরুণী গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। কারণ সে ধর্মীয় আবেগ তাড়িত হয়েই তো মা বাবার সাথে ভারতের এক কোণ থেকে মথুরায় পূজা দিতে এসেছিল। তখন তার মনে হিন্দুত্ববাদের আবেগ ছিল প্রবল। তাই ধর্ম ত্যাগের কথা শুনে সে চিন্তায় পড়ে গেলো।

যুলকারনাইন বললো, তুমি যেখানে যেতে চাও, সেখানেই তোমাকে পৌছে দেয়া হবে। কিন্তু কোন মন্দিরে তোমাকে থাকতে দেয়া হবে না।

ঝড়ের তাণ্ডব, যুদ্ধের বিভীষিকা, মা বাবা ভাইয়ের মৃত্যু আর অগণিত মৃতের লাশ দেখে তরুণী এতোটাই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, যুলকারনাইনের তাঁবু থেকে বাইরে যাওয়ার সাহস সে পাচ্ছিল না। তা ছাড়া বিগত একরাতের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কারণে যুলকারনাইনের প্রতি যে আস্থা জন্মেছে সেই আস্থা ও আশ্রয় সে হারাতে চাচ্ছিল না। মনের অজান্তেই তরুণীর কাছে যুলকারনাইনই হয়ে পড়ে ছিল আস্থা ভরসা ও নির্ভরতার মূর্তপ্রতীক।

এভাবে কেটে গেল তিন চার দিন। এ কয় দিনের মধ্যে তরুণী আর যুলকারনাইনের তাঁবু থেকে বের হলো না। কিন্তু নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কেও সে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারল না। এ দিকে যুলকারনাইনকে মথুরা ত্যাগ করে আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। যুলকারনাইন যখন তরুণীকে একথা জানাল তখন তরুণী কোন কিছু চিন্তা না করেই বললো– তুমি যেখানে যাও, আমাকেও সেখানে নিয়ে চলো।

বিগত তিন চার দিনে তরুণী অনুভব করলো এবং প্রত্যক্ষ করলো, সুন্দর সুঠামদেহের অধিকারী আকর্ষণীয় এই যুবক বাস্তবে একটা পাথর হৃদয়ের মানুষ নয়তো ফেরেশতা। এ তিন চার দিনে একটি বারও তার দিকে হাত বাড়াবে দূরে থাক একটু স্পর্শও করেনি। তাই রওয়ানা হওয়ার আগে সে যুলকারনাইনকে বললো, আমার ব্যাপারে যা করতে হয় তুমি সেই ব্যবস্থা করো, আমি কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে যাবো না। প্রয়োজনে আমি ধর্ম ত্যাগ করতেও রাজি।

তরুণীর কণ্ঠে ধর্মত্যাগের আগ্রহ শুনে যুলকারনাইনের মনে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সে দিনই এক ফাঁকে তরুণীকে সেনাবাহিনীর ইমামের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ইমাম তাকে কলেমা পড়িয়ে ইসলামে দীক্ষা দিলেন এবং তার নতুন নাম দিলেন রাজিয়া।

তরুণীর নাম ছিল রত্মা। এবার সে রত্না থেকে রাজিয়া। রত্মার ইসলাম গ্রহণের ফলে সেনাপতি নিজেই উদ্যোগী হয়ে যুলকারনাইনের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। সেনাবাহিনীর সাথে থাকা আরো কয়েকজনের স্ত্রীরা এসে নতুন বধুকে বরণ করে নিল। রাজিয়াকে তাদের কাছে অর্পণ করে যুলকারনাইন তার কর্তব্য পালনে সেনাদলের সাথে অভিযানে চলে গেল।

অভিযান থেকে ফিরে এলে যুলকারনাইনকে রাজিয়া সম্পর্কে জানানো হলো, নওমুসলিম রাজিয়া তাকে ফেরেশতার মতোই পবিত্র মানুষ বলে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ইসলামের হুকুম আহকাম বিশেষ করে নামায পড়তে গিয়ে এই তরুণী কেমন জানি হাঁপিয়ে ওঠে এবং তার কাছে নামায কঠিন মনে হয়। অথবা এমনও

হতে পারে এই তরুণী অন্তর দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি। তার মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। নিজের জীবন বাঁচানোর তাকিদেই হয়তো সে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

মথুরা জয়ের পর এক বছর চলে গেছে। যুলকারনাইন এখন রাড়ীতে মহারাজা রাজ্যপালের উপদেষ্টা হিসেবে অবস্থান করছে। রাজ্যপাল বাহ্যত নামে রাজা থাকলেও তার সেই দাপট ও কর্তৃত্ব ছিল না। সে এখন আর একজন লড়াকু রাজা নয়, প্রকৃতই একজন পুতুল রাজা মাত্র। অঢেল বিত্তবৈভবের কারণে সে রাজার হালতেই চলতো বটে। কিন্তু আগের জাঁকজমক আর ছিল না।

অবশ্য নর্তকীর নাচ বাদকদের বাজনা ছাড়া মহারাজার দিন কাটতো না। ফলে রাজ্য হারা রাজা হলেও এসব আয়োজনের কোন ঘাটতি ছিল না রাজ্যপালের। রাড়ীতে রাজ্যপাল অল্প দিনের মধ্যেই একটি রাজ প্রাসাদ গড়ে তুলেন এবং রাজমহলের এসব গান বাজনায় গযনীর কমান্ডার ও উপদেষ্টাদেরও দাওয়াত দেন। কিন্তু গযনী সরকারের কোন কর্মকর্তা রাজার গান বাজনাও নৃত্যগীতে অংশগ্রহণ করেন না।

রাড়ীতে পূর্ব থেকেই একটি মন্দির ছিল। সেটিতে আগে জৌলুস না থাকলেও রাজধানী ঘোষণার পর মন্দিরটি জৌলুসপূর্ণ হয়ে ওঠে। দলে দলে পূজারীরা মন্দিরে পূজা দিতে ভীড় করে। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গা থেকে মন্দিরে এসে আস্তানা গেড়ে বসে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ পুরোহিত।

সুলতান মাহমূদের নির্দেশে তার কর্মকর্তারা রাজ্যপাল ও হিন্দুদের পূজা অর্চনায় কোন প্রকার বিধি নিষেধ আরোপ করেনি। সুলতান নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, হিন্দুদের কাছে যেন ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয় এবং তাদের সামনে ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়।

গযনীর নিয়োজিত কর্মকর্তা ও সেনারা দাওয়াতী কাজ যথারীতি চালু করেছিল। ফলে দু'চারজন করে হিন্দু প্রতিদিনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল।

এ দিকে যুলকারনাইন তার স্ত্রী রাজিয়াকে বলেছিল, সে যেনো হিন্দু মহিলাদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে। সে যেনো হিন্দু মহিলাদের বলে ইসলাম কতটা সুন্দর। ইসলামের রীতি নীতি কতো মানবিক এবং মুসলমানদের আচার আচরণ ও চরিত্র কতো পবিত্র। সে যেনো হিন্দু মহিলাদের জানায়, ইসলামের অনুশাসন এমনই সুন্দর যে, তা মানুষকে পবিত্র করে তোলে।

রাজিয়া ইসলামের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর গুণগ্রাহী ছিল। সে মুসলমান পুরুষদের উন্নত নৈতিকতা নিজের জীবনে অনুভব করেছিল। ফলে হিন্দু কোন মহিলা এলে সে তার জীবনের কাহিনীই বর্ণনা করতো।

এদিকে গযনীতে সুলতান মাহমূদ প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিলেন। তিনি তার প্রতিবেশী গযনী বিরোধী মুসলমান শক্তিগুলোকে রণাঙ্গনে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন। অবশ্য শত ব্যস্ততার মধ্যেও তার একটি কান সব সময় হিন্দুদের দিকে উৎকর্ণ হয়ে থাকতো। কারণ হিন্দুস্তানের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তিনি মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলিম যোদ্ধাকে রেখে এসেছিলেন। যাদের চতুর্দিকে অবস্থান করছিল বিপুল শক্তির অধিকারী হিন্দু রাজা মহারাজারা। যারা এক ফুৎকারে গযনীর এই সৈন্যদেরকে উড়িয়ে দেয়ার জন্য রাত দিন চেষ্টা-সাধনা করছিল। মেতে উঠে ছিল গযনী বিরোধী নানা আয়োজনে। মথুরা ছিল হিন্দুদের হৃৎপিণ্ডের মতো। এই হৃৎপিণ্ডে ইসলামের খঞ্জর বিদ্ধ হয়েছিল। ফলে বুকের মধ্যে বিদ্ধ খঞ্জর নিয়ে হিন্দু রাজা মহারাজাদের নীরব নির্বিকার বসে থাকার উপায় ছিল না।

সুলতান মাহমূদ কয়েকটি কঠিন অভিযান পরিচালনার পর অনুভব করতে পেরেছিলেন, হিন্দুজাতি মুশরিক ও বহু দেবদেবীর পূজারী হলেও এরা ভীতু নয়, লড়াকু। সুলতান প্রত্যক্ষ করে ছিলেন হিন্দুরা অকাতরে তাদের জাতি ও ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্যে জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তাদের প্রধান দুর্বলতা সেনাপতিদের অদূরদর্শিতা। তারা কৌশলের চেয়ে জনবল এবং আবেগের উপর বেশী নির্ভর করে। রণাঙ্গনে মাথার চেয়ে শক্তিকে বেশী ব্যবহার করে। নির্ভিক চিত্তে হামলে পড়া এবং প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করাকেই তারা মনে করে লড়াই।

পক্ষান্তরে সুলতান মাহমূদ লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সব সময়ই শক্তির চেয়ে কৌশলকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। তিনি দারুণ কার্যকর কৌশলে শক্তির ব্যবহার করতেন। ফলে তিনগুণ চারগুণ প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করেও তিনি অনায়াসে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারতেন। ইতিহাসবিদগণ এ কারণেই পৃথিবীর ক্ষণজন্মা সমরবিদদের অন্যতম স্থানটি সুলতান মাহমূদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন। সুলতান মাহমূদ তাই বিশ্ব ইতিহাসে একজন দূরদর্শী সমরনায়ক হিসেবে বিবেচিত।

সুলতান মাহমূদের যুদ্ধ কৌশল সব সময় প্রতিপক্ষকে ফাঁদে আটকে ফেলতো। তখন শত্রুপক্ষের সামনে দুটি পথই খোলা থাকতো। লড়াই করে জীবন দিতে হতো, নয়তো হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পনের পথ বেছে নিতে হতো।

ধর্মীয় ভাবাবেগের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা কম ধর্ম অনুরাগী ছিলো না। বলা চলে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মের আবেগ ছিল

মুসলমানদের চেয়ে বেশী। মুসলমানরা অদৃশ্য আল্লাহর ফরমান বিশ্বাস করে লড়াই করতো। আর হিন্দুরা তাদের দৃশ্যমান দেবদেবীদের সম্মান রক্ষার জন্যে জীবন উৎসর্গ করতো।

হিন্দু ধর্ম যে ভ্রান্ত এমন ধারণা তারা কখনোই মনে স্থান দিতো না। তারা বংশপরম্পরায় মূর্তিপূজাকেই একমাত্র সঠিক ধর্ম বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতো। সেই সাথে শৈশব থেকে মনের মধ্যে গেঁথে নিতো রূপকথার মতো দেবদেবীদের নানা কাহিনী। বাস্তবতা ও যুক্তির বিচারে এগুলো প্রত্যাখ্যানযোগ্য হলেও হিন্দু মণী ঋষি ও পুরোহিতেরা যুগ যুগ ধরে সাধারণ হিন্দুদেরকে এসব উপখ্যানই ধর্মের আবরণে পেশ করে আসছিল। পরম শ্রদ্ধায় হিন্দুরা পুরোহিতদের সৃষ্ট এসব কাহিনীকেই ধর্ম পালনের অংশ ভেবে আসছিল।

হিন্দুরা কখনেই বুঝতে চাইতো না, তারা সত্য ধর্মের বিপরীতে মিথ্যার পক্ষ হয়ে লড়ছে। তাদেরকে কেউ বলতো না, সত্য মিথ্যার লড়াইয়ে সত্যের পক্ষেই থাকে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ।

সুলতান মাহমূদের অস্বাভাবিক সামরিক দূরদর্শিতা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর দেয়া বিশেষ এক দান ছিল। আল্লাহ্ তাআলা সুলতান মাহমূদকে এমন সামরিক দূরদর্শিতা, সাহস ও দৃঢ়তা দিয়েছিলেন যার সামনে কঠিন পাহাড়ও ধসে যেতো। সুলতান মাহমূদ বলতেন, সাপ শেষ পর্যন্ত মানুষের হাতেই মারা পড়ে কিন্তু মানুষকে সতর্ক থাকতে হয়, তার অসতর্কতায় সাপ না আবার তাকে দংশন করে বসে। তিনি হিন্দুদেরকে সাপ বিচ্ছুর সাথে তুলনা করতেন। কারণ, বিচ্ছুর মতোই হিন্দুরা সব সময় কিভাবে মুসলমানদের দংশন করবে এ চিন্তায় বিভোর থাকতো।

আমি হিন্দুদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না– সামরিক উপদেষ্টাদের বলছিলেন সুলতান মাহমূদ। কারণ হিন্দুদের সমূলে উপড়ে ফেলা আমার পক্ষে এখনো সম্ভব হয়নি। আমি হিন্দুদের আত্মসমর্পণের উপর নির্ভর করতে পারি না। সাপ-যদি গর্তেও চলে যায় কিংবা সাপকে যদি বাক্সেও ভরে ফেলা হয় তবে তার স্বভাব বদলে যায় না, তার বিষ নিঃশেষ হয়ে যায় না। সুযোগ পেলেই সে ছোবল মারতে পারে।

তিনি প্রায়ই বলতেন, আমাকে আল্লাহ হয়তো এতো বেশী বয়স দেবেন না, যাতে আমি মুহাম্মদ বিন কাসিমের আযাদকৃত যমীনকে পুনর্বার ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসবো। এটাও জানা নেই, আমার পরবর্তী গযনী শাসকরা এ দিকে মনোযোগ দেবে কি না। পরবর্তী শাসকরা যদি হিন্দুদের সাথে সখ্যতা গড়ে

তোলে তা হবে মুসলমানদের সাথে দুশমনী। যতো দিন পৃথিবীতে হিন্দু থাকবে তারা ইসলামকে ছোবল মারবেই এবং হিন্দুস্তানের যমীন মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হতেই থাকবে। হিন্দুস্তানের মজলুম মুসলমানদের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসবে না। যাদের এগিয়ে আসার কথা তাদেরকে হিন্দু শাসকরা মৈত্রী ও বন্ধুত্বের জালে আটকে রাখবে।

সুলতান মাহমূদ বলতেন, হিন্দু শাসকরা বহুগামী স্ত্রীর মতো, যে প্রকাশ্যে স্বামীর পা ধুইয়ে দেয় এবং দৃশ্যত সে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে নিজেকে জাহের করে, কিন্তু স্বামীর আড়াল হলেই সে আরো কয়েক জনের সাথে প্রেম করে। প্রকৃত পক্ষে সে স্বামী বেচারার জন্যে প্রেমের ফাঁদ এবং জীবন্ত প্রতারণা হয়ে সবসময় স্বামীর সাথে প্রতারণা করে। এমন স্ত্রী যে কোন সময় তার প্রেমিকদের মনোরঞ্জনের জন্য স্বামীকে হত্যা করতে দ্বিধা করে না।

সুলতাম মাহমূদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও মুর্শিদ শায়খ আবুল হাসান কিরখানী তাকে বলেছিলেন, মানবেতিহাসে দু'টি জাতি একই মাটি থেকে একই সাঁচে বানানো হয়েছে। এই দু'টি জাতি হলো ইহুদী ও হিন্দু। মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ এদের স্বভাবজাত এবং এদের ধর্মের অংশ। যে যুগে মুসলমানরা এই দুই জাতি সম্পর্কে অসতর্ক হবে কিংবা এই দুই জাতিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সেই যুগ হবে মুসলমানদের পতনের যুগ।

মুসলিম মিল্লাত তখন তাদের আত্মমর্যাদাবোধকে হারিয়ে ফেলবে, তাদের মান মর্যাদা ধ্বংস হয়ে যাবে। শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলিম শাসক গোষ্ঠী মুসলিম জনতাকে প্রজা ভাবতে শুরু করবে। তখনকার শাসক শ্রেণী নাগরিকদের মুখ বন্ধ করে দেবে। ইহুদী ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানরা কিছুই বলার সুযোগ পাবে না। কারণ তখনকার শাসক গোষ্ঠী ইহুদী ও হিন্দুদের মনোরঞ্জন করে ক্ষমতায় থাকতে চেষ্টা করবে। সেই যুগ হবে ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার যুগ। তখন আল্লাহর যমীন মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হতে থাকবে।

সুলতান মাহমূদ খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে তার শায়খের কথা শুনতেন। এ সব কথা শোনার সময় তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। তাকে দেখে মনে হতো তিনি সেই সময়ের কথা ভেবে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। দুঃখ যন্ত্রণায় তার অন্তর কেঁপে উঠতো। একদিন আবুল হাসান কিরখানী বললেন, এমন একদিন আসবে, যখন তোমার এই রাজ্যে বিধর্মী শক্তি তাদের ইচ্ছামতো শাসন কাজ চালাবে। তোমার রাজ্যে মুনাফিকদের দৌরাত্ম চলবে। গযনী, কান্দাহার, গারদিজ তখন বিধর্মীদের পদপিষ্ট হবে। যাদের কোন দীন ধর্ম থাকবে না, তাদেরকেই একদল মুসলিম দীনের প্রহরী ভাবতে শুরু করবে।

সম্মানিত মুর্শিদ! কম্পিত কণ্ঠে একথা শুনে বললেন সুলতান, সে সময়ের অনাগত সেই জাতির দুর্ভাগ্য আজ আমি কি ভাবে রোধ করতে পারবো? আমাকে এজন্য কি ভূমিকা পালন করতে হবে?

আরে সুলতান! তুমি তো তখন হবে কবরের অধিবাসী। তোমার কবর তাদের কিছুই করতে পারবে না। তোমার আমার কবরের চার পাশেই ভবিষ্যতে রক্তের হুলি খেলার আয়োজন হবে। তখন আর আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হবে না। অতএব যা করার এখনই করতে হবে। অবশ্য তুমি তোমার কর্তব্য যথার্থই পালন করছো।

এই প্রেক্ষিতে আজ আমি তোমাকে কি কাজ করা ঠিক হবে না সে ব্যাপারটি বলতে চাচ্ছি। তুমি বার বার মোহময় মায়াবী হিন্দুস্তানে যাচ্ছো। হিন্দুস্তানে রয়েছে সোনা-দানা ও সহায়-সম্পদের চমক এবং হিন্দুস্তানের মেয়েরাও মারাত্মক চমক। এরা কোন প্রকার পর্দা করে না। শুধু মেয়ে নয়, হিন্দুস্তানের প্রাকৃতিক পরিবেশও মোহময়। তুমি, তোমার সেনাপতি ও কমান্ডাররা যদি এসব মোহ-মায়া থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারো, তাহলে তোমাদের পক্ষে সেই দুর্গ তৈরী করা সম্ভব হবে, যে দুর্গ প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরবে হিন্দুরা।

সম্মানিত মুর্শিদ! অনেক সময় আমার সৈনিকরা হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করে ফেলে। অবশ্য যেসব মেয়ে বিয়ের আগেই স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষা নেয় তাদেরকেই গযনীর সেনারা বিয়ে করে। আমি কি এই ধারা চালু থাকতে দেবো, না বন্ধ করে দেবো?

শোন মাহমূদ! এই প্রেক্ষিত্রে তোমাকে একটি গল্প বলি– বললেন শায়খ কিরখানী! আমি যখন যুবক, তখন আমার আব্বার একজন বন্ধু প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসতেন। আব্বার এই বন্ধুটি ছিলেন খুবই দূরদর্শী সৎ ও ব্যবসায়ী। একবার তিনি কোন স্থান থেকে একটি চিতার বাচ্চা নিয়ে এলেন। আমি সেই চিতার বাচ্চাটি দেখেছি। লোকটি চিতার বাচ্চাটিকে খুবই আদর করতেন। মনে হতো তিনি একটি বিড়ালের বাচ্চাকে আদর করছেন। আব্বার সেই বন্ধু চিতার বাচ্চাকে তার কোলে বসিয়ে দুধ পান করাতেন এবং নিজের বিছানায় শোয়াতেন।

চিতার বাচ্চাটি যখন বড় হলো, তখন আব্বার ব্যবসায়ী বন্ধু সেটিকে পাখি ও হরিণের গোশত খাওয়াতেন। ব্যবসায়ী যে দিকে যেতেন, চিতার বাচ্চাও সেদিকেই যেতো। মুনীবের সাথে চিতার বাচ্চার খুবই ভালোবাসা জন্মে গিয়েছিল।

একদিন সেই ব্যবসায়ী আমার আব্বার সাথে দেখা করতে এলেন। তার একটি হাত কুনুই থেকে বাজু পর্যন্ত কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, হাতের গোশত চিতার বাচ্চা ছিড়ে খেয়েছে। একথা শুনে আমার আব্বা বললেন, আরে চিতার বাচ্চা না তোমাকে খুবই আপন ভাবতো, তুমি তাকে আদর করতে? ব্যবসায়ী বললো, আদর করেই সে কামড় দিয়েছে। আদর করে কামড়ে দিলেও দাঁত আমার হাঁতে বিঁধিয়ে ফেলে। ফলে খুব কষ্টে তার দাঁত ছাড়াতে হয়েছে। এতে তার শরীরের অর্ধেক রক্ত ঝরে গেছে।

লোকটি চলে যাওয়ার পর আব্বা আমার উদ্দেশে বললেন, কিছু বুঝলে হাসান?

হিংস্রদের আদরেও হিংস্রতা থাকে। চিতার বাচ্চা তার স্বভাবের কারণে মানুষের বন্ধু হতে অক্ষম, স্বভাবগত কারণে সে মানুষকে শত্রু ভাবতে বাধ্য। মাহমূদ! হিন্দু আর ইহুদীরা হলো সেই চিতার বাচ্চার মতোই হিংস্র। এদের ভালোবাসার মধ্যেও হিংস্রতা রয়েছে। স্বভাবগতভাবেই এরা মুসলমানদেরকে শত্রু ভাবতে বাধ্য। এ থেকে তুমিই সিদ্ধান্ত নাও, মুসলমানরা হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করবে কি না। পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন এই দুই জাতির নারী পুরুষ একে অন্যের শরীরের মধ্যে কোনরূপ বিরূপতা বা শত্রুতা অনুভব করবে না ঠিক, যতটুকু স্বাদ অনুভব করার কথা ততটুকুই করবে বৈ কি? কিন্তু তাতে রক্তের শত্রুতা ও বৈরীতার বিলুপ্তি ঘটবে না। এবং ব্যাপকভাবে আত্মিক মিলনও কখনো ঘটবে না। দৈহিক সম্পর্ক আদর্শিক বিরোধ নিঃশেষ করে না। সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। যা কেবল সঠিক সময়েই বুঝা যাবে।

সুলতান মাহমূদ হিন্দু মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি বটে, কিন্তু তিনি সেনাবাহিনীর ইমামদের বলেছিলেন, তারা যেন হিন্দু মেয়েদের ব্যাপারে সেনাদের সতর্ক রাখে। এই সতর্কতা অবলম্বনের পরও পরিস্থিতির কবলে পড়ে অনেক সৈনিকই হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছিল। এমনই এক পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়ে কমান্ডার যুলকারনাইনও রত্মা নামের মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল। যে রত্মা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে রাজিয়া নাম ধারণ করেছিল এবং যুলকারনাইনকে তার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিল।

রাজিয়া ছিল একেবারে নিঃস্ব ও নিরূপায়। বাবা মা ভাইকে হারিয়ে আশ্রয় পাওয়ার মতো তার কেউ ছিল না। তার সামনে একমাত্র পথ ছিল মন্দিরে আশ্রয় নেয়া। কিন্তু মেয়েটিকে মন্দিরের অন্ধকার জীবনে ঠেলে দিতে চাচ্ছিল না

যুলকারনাইন। কারণ রত্মার রূপ সৌন্দর্য ও তার অসহায়ত্বের দিকটি যুলকারনাইনকে অনেকটা বাধ্য করে তুলেছিল মেয়েটির দায় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে এবং অন্ধকার জীবন থেকে মেয়েটিকে আলোর পথে নিয়ে আসতে। মেয়েটির অসহায়ত্ব এবং যুলকারনাইনের প্রতি আত্মনিবেদন সেনাবাহিনীর ইমাম ও সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকীকেও মেয়েটির প্রতি দয়াপরবশ করে তুলেছিল। ফলে তারা কেউ যুলকারনাইনের সাথে রাজিয়া ওরফে রত্নার বিয়েতে বাধা দেননি।

সময়ের ব্যবধানে রাজিয়ার বিয়ের সংবাদ সুলতান মাহমূদের কানেও পৌছাল কিন্তু যুলকারনাইনের কর্তব্য নিষ্ঠা এবং রাজিয়ার অসহায়ত্ব ও যুলকারনাইরে কাছে তার স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের কথা শুনে এ ব্যাপারে সুলতানও কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি।

একটা নিয়ম মতো রুটিন মাফিক হিন্দুস্তান থেকে বিভিন্ন সংবাদ নিয়ে গযনীতে দূত পাঠানো হতো। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গায় গযনী সুলতানের যেসব গোয়েন্দা অবস্থান করছিল তাদের সরবরাহকৃত খবরও সমন্বয় করে গযনী সুলতানের কাছে পাঠানো হতো।

গোয়েন্দাদের পাঠানো তথ্যমতে লাহোরের মহারাজা তরলোচনপাল তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজধানী থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। সে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী কোথাও অবস্থান না করে আরো উত্তরের দিকে কোন পাহাড়ী এলাকায় আত্মগোপন করেছিল। কেন সে রাজধানী থেকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে আত্মগোপন করেছিল, তার উদ্দেশ্য ও অবস্থান সম্পর্কে গোয়েন্দারা সঠিক কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারেনি।

রাজা তরলোচনপালের ইচ্ছা যাই থাকুক, তার কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা পূরণের আয়োজন চলছিল কালাঞ্জরে। কালাঞ্জরের রাজা গোবিন্দের রাজ মহলে গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন এবং লাহোরের রাজা তরলোচনপাল মিলিত হলো। তাদের সাথে গোবিন্দ নামের এক অভিজাত হিন্দু এবং কালাঞ্জরের প্রধান পুরোহিতও উপস্থিত ছিল। তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল, মহারাজা রাজ্যপাল তাদেরকে ধোকা দিয়েছে এবং মৈত্রী চুক্তির আড়ালে সে সুলতান মাহমূদের বশ্যতা স্বীকার করে তার গোলামী করছে। তারা আলোচনা করছিল কিভাবে রাজ্যপালকে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়া যায়।

নানামুখী আলোচনা পর্যালোচনা যখন তুঙ্গে ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের কক্ষের বাইরে চুড়ির রিনিঝিনি আওয়াজ শোনা গেল। চুড়ির রিনিঝিনি আওয়াজ শুনে

সবাই উপরের দিকে তাকালেন। তারা ভাবলেন উপর তলায় হয়তো কোন নর্তকী কিংবা মহিলা নাচের ঘুঙুর পরে উঁকি দিয়েছে। কিন্তু চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘুরে কক্ষের মধ্যে ঝুলন্ত রেশমী কাপড়ের পর্দায় তাদের দৃষ্টি আটকে গেল। ওই পাতলা পর্দার আড়ালে সাধারণত রাণী বা রাজকুমারীদের কেউ এসে বসতো। সবাই লক্ষ করলো অতি পাতলা পর্দার আড়ালে সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক নারী দাঁড়িয়ে। বিবস্ত্র নারীর অস্তিত্ব দেখে সবার দৃষ্টি অবনমিত হয়ে গেল।

এই নাও, গল্পে গল্পে আর মদের গ্লাসে আসর না মাতিয়ে তোমরা এই চুড়িগুলো পরে নাও! পর্দার ওপাশ থেকে তীর্যক শ্লেষাত্মক বাক্য উচ্চারিত হলো।

কী ব্যাপার? দৃষ্টি নীচের দিকে ফিরিয়ে নিয়েছো কেন? আমার দিকে তাকাও। আমি তোমাদের সম্ভ্রম, আমি ভারত মাতা, আমি ইন্দ্রাদেবী। দেখে নাও আমাকে, আমি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। তোমরা আমাকে এমন বিবস্ত্র করেছো। তোমরা নির্লজ্জ। এখন সব লজ্জার ভান করে দৃষ্টি নীচের দিকে নামিয়ে নিয়েছো কেন?

এই ইন্দ্রাদেবী ছিল মহারাজা গোবিন্দের স্ত্রী, বড় রাণী। রানীর এই অবস্থা দেখে মহারাজা গোবিন্দ রাগে ক্ষোভে অপমানে জ্বলে উঠলো। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গর্জন করে বললো– ভালো চাও তো এখান থেকে চলে যাও শকুন্তলা! শোনে রাখো, শিবাজী এবং হরেকৃষ্ণের অমর্যাদার প্রতিশোধ নিয়েই আমি তোমার কাছে আসবো। যে পর্যন্ত ভারত মাতার বুকে গযনীর একটি সৈন্যও অবশিষ্ট থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত আমি তোমার চেহারাও দেখবো না, তোমাকে স্পর্শও করবো না। ইন্দ্রাদেবীকে রাজা শকুন্তলা নামে ডাকতো।

রাখো তোমার এই শপথ! তাচ্ছিল্য মাখা কণ্ঠে বললো রাণী শকুন্তলা। রাজপুতদের রক্ত আর তোমাদের দেহে প্রবাহিত নেই। শরাবের নেশা রাজপুত রক্তকে পানি করে ফেলেছে। তোমরা যদি সত্যিকার আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হতে, তাহলে সলাপরামর্শের নামে রাজমহলে বসে শরাবের নেশা করতে পারতে না। তোমরা কেন সেই ময়দানে যাচ্ছো না, যেখানে ভারত মাতার হাজারো সন্তান জীবন দিয়েছে? তোমরা সেই সব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের নীচে পড়ে কেন মৃত্যুবরণ করলে না মুসলমানরা যেসব মন্দির ধ্বংস করেছে?

রাণী! এখনো তুমি এখান থেকে যাচ্ছো না? আমাকে কি কোন ব্যবস্থা নিতে হবে? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো রাজা গোবিন্দ।

রাজার একথা শুনে কালাঞ্জরের প্রধান পুরোহিত দাঁড়িয়ে গেল। সেই যুগে হিন্দু রাজা মহারাজারা রাজ্য শাসন করতো আর রাজাদের শাসন করতো পুরোহিতেরা। কোন কোন এলাকায় সরাসরি পুরোহিতদের শাসন চলতো। গোটা

হিন্দুস্তান জুড়ে ছিল পুরোহিতদের দাপট। রাজা মহারাজাদের যতো দাপটই থাক না কেন কোন না কোন ভাবে তারা পুরোহিতদের দ্বারা প্রভাবিত হতো। পুরোহিতদের অদৃশ্য শাসন চলতো সবখানে।

কালাঞ্জরের এই বৈঠকে পুরোহিত যখন রানী শকুন্তলাকে পর্দার ওপাশে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখতে পেল তখন সে রাগে ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং রাজাদের উদ্দেশ্যে বললো– আপনারা বলছেন, রানী এখান থেকে যাচ্ছো না কেন? আমি বলি রাণী এই অবস্থাতেই আমাদের সামনে আসছে না কেন? যাতে আমরা ভালো ভাবে বুঝতে পারি, বিবস্ত্র অর্ধার্মিক আত্মমর্যাদাহীন একটি জাতি কেমন হতে পারে?

সুলতান মাহমূদ ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য দখল করে নিয়েছে দু'বছর হয়ে গেলো। এই দু'বছর, তোমরা আসর বসিয়ে গল্প মারা ছাড়া আর কি করেছো? তাই তোমাদের অস্ত্র সস্ত্র তরবারী এই দেশের নারী ও পুরোহিতদের হাতে দিয়ে তোমরা চুড়ি পড়ে রাজপ্রাসাদে থাকো। নারী আর পুরোহিতরা গিয়ে লড়াই করুক। এখনো তোমাদের নর্তকী আর শরাব নিয়ে রাজমহলে আনন্দ ফূর্তিতে ভাটা পড়েনি। দেবতাদের নামে তোমরা বার বার কসম করেছো, এসব প্রতীজ্ঞা আর কসমও তোমরা রক্ষা করো নি।

এক পর্যায়ে রাণীকে ইঙ্গিত করে পুরোহিত বললো? চলে যাও রাণী! আমি মহারাজাদের কপালে ঘামের ফোটা দেখতে পাচ্ছি। আশা করি, লজ্জার এই ঘাম তাদের রক্তকে গরম করবে।

রাণী চলে গেল বটে, কিন্তু দরবার মহলে নেমে এলো নীরবতা। এই নীরবতার মধ্যেই জন্ম নিলো গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে মারাত্মক এক তুফান। অবস্থা এমন হলো যে, উপস্থিত তিন মহারাজার কেউ কারো প্রতি লজ্জা ও অপমানে তাকাতে পারছিল না।

কন্নৌজ দুর্গে গযনীর সৈন্য সংখ্যা এক হাজারও হবে না– বললো পুরোহিত। তোমরা হামলা করলে লড়াই ছাড়াই তাদেরকে পরাস্ত করতে পারো। তোমাদের বিপুল জনশক্তি দেখে ওরা লড়াই না করেই হাতিয়ার ফেলে দিতে বাধ্য হবে। কারণ, তাদের সাহায্য করার কেউ এখানে নেই। কে আসবে তাদের সাহায্য করতে?

তাদের এই এক হাজার সৈন্যকে হত্যা করলেও কিছু হবে না; গযনী থেকে মাহমূদ ঝড়ের বেগে চলে আসবে– বললো গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন। আর তখন মাহমূদ এসে এমন প্রতিশোধ নেবে যা হিন্দুস্তানের মানুষ কখনো ভুলতে

পারবে না। লড়াই করা এবং লড়াই করানো আপনার সাধ্যের ব্যাপার নয় পণ্ডিত মহারাজ! বললো মহারাজা গোবিন্দ। এ ব্যাপারে আপনার চিন্তার চেয়ে আমাদের চিন্তা আরো গভীর। আমাদের সাময়িক কোন বিজয়ের ব্যবস্থা করলেই চলবে না, চিরদিনের জন্যে মাহমূদের শক্তিকে নিঃশেষ করে দিতে হবে।

আমাদেরকে ভাবতে হবে সবাই মিলে কিভাবে গযনী দখল করা যায়। আমাদের এই প্লাবনের উৎস বন্ধ করতে হবে নয়তো কিছুদিন তা থেমে থাকার পর আবার এই প্লাবন আমাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

আপনাদের পক্ষে গযনী দখল করা সম্ভব নয় মহারাজ! বললো পুরোহিত। লাহোরের মহারাজা তরলোচনপাল এখানে আছেন, তারা দাদা মহারাজা জয়পাল গযনীর উপর কতোবার আক্রমণ করেছেন, কিন্তু তার পরিণতি কি হয়েছে আপনারা সবাই জানেন। এই প্রেক্ষিতে আমি তরলোচনপালকে জিজ্ঞেস করতে চাই, গযনী বাহিনী মথুরাকে এভাবে লন্ডভন্ড করে জনমানবহীন করে ফেলল, বুলন্দশহর মুনাজকে ধ্বংস করে দিল, এখন কন্নৌজকেও ধ্বংস করে দিয়েছে, লাহোরের মহারাজা এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন? তিনি কোথায় জানি তার সৈন্যদেরকে লুকিয়ে রাখলেন আর অন্যদেরকে লড়াই করতে উস্কানি দিয়ে গেলেন।

এ ক্ষেত্রে আমি ভিন্ন কোন চাল দিতে চাচ্ছিলাম, সেটি করার সুযোগ আমার হয়নি– বললো মহারাজা তরলোচনপাল। আমি গযনী বাহিনীর উপর পেছন থেকে আক্রমণ করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু কোন জায়গাতেই দীর্ঘ সময় মোকাবেলা করতে পারেনি আমাদের কোন সহযোগী বাহিনী। মাহমূদ বলতে গেলে প্রতিদিনই আমাদের একেকটি দুর্গ জয় করে নিয়েছে। কন্নৌজে তো কোন মোকাবেলাই হয়নি। রাজা রাজ্যপাল আগেই রাজধানী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আমিতো শত্রুবাহিনীর পিঠ দেখারই সুযোগ পাইনি।

তরলোচনপাল! বললো মহারাজা গোবিন্দ। আপনার এই চাল আমার মোটেও পছন্দ হয়নি। আপনি যদি আপনার সৈন্যদের গযনী বাহিনীর আগমন পথে নিয়ে আসতেন, তাহলে আর এরা এতো সহজে অগ্রসর হতে পারতো না। তখন পরিস্থিতি ভিন্নতর হতো।

মহারাজা তরলোচনপালের চাল আমি বুঝতে পেরেছি– বললো পুরোহিত। তিনি তার বাহিনীকে লাহোর থেকে এজন্য বাইরে নিয়ে গিছেন, যাতে তার যোদ্ধারা লাহোরের বাইরে থাকে, আর তিনি অন্যদেরকে যুদ্ধে নামাতে পারেন।

পুরোহিতের কথা শুনে তরলোচনপাল ক্ষোভে অপমানে চিৎকার করে বললো– এসব কথা বলে আমাকে অপমান করা হচ্ছে; এমন অপমান বরদাশত করা হবে না।

তরলোচনপালের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের মুখে পুরোহিত বললো, ঠিক আছে মহারাজ! আমি শুধু বিষয়টির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্যে কথাটি বলেছিলাম। আপনাকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এতে যদি লাহোরের মহারাজা অপমানবোধ করে থাকেন তবে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

কিন্তু লাহোরের সেনাবাহিনীকে আপনি খুব শীঘ্রই সম্মুখ সমরে নিয়ে আসবেন এবং শত্রুর মুখোমুখি সেনা সমাবেশ ঘটিয়ে ঘোষণা করবেন, আপনি গযনীর বশ্যতা স্বীকার করেন না এবং গযনীর সাথে আপনার পূর্ব পুরুষের কৃত মৈত্রীচুক্তি আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন।

প্রথমে তিন মহারাজার এই সম্মিলন ছিল একটি ঘরোয়া বৈঠকের মতো। বৈঠকী মেজাজেই কথাবার্তা হচ্ছিল। কিন্তু রাণী শকুন্তলার বিবস্ত্র হয়ে মহারাজাদের উত্তেজিত ও অপমানিত করার পর মহারাজাদের এই বৈঠক হট্টগোলের রূপ ধারণ করে। আর পুরোহিতের উস্কানির পর সবাই এক সাথে উত্তেজিত কথা বলার কারণে রীতিমতো হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। বৈঠকের শুরু থেকেই সেখানে উপস্থিত গোবিন্দ নামের এক বুদ্ধিজীবী সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললো–

আপনারা শান্ত হোন। আপনাদের মতো মহারাজাদের পক্ষে সুলতান মাহমূদকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। আপনারা মাহমূদের কিছুই করতে পারলেন না।

সবাই শুনুন! আমি যা জানি আপনারা কেউ তা জানেন না। আপনারাই তো আমার বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংসা করেন। আপনারা জেনে অবাক হবেন, কন্নৌজের বর্তমান গভর্নর আব্দুল কাদের সেলজুকীর সাথে আমার যে পরিমাণ হৃদ্যতা আছে এমন হৃদ্যতা তার সেনাবাহিনীর কারো সঙ্গেও তার নেই। সে আমাকে তার বিশ্বস্ত গোয়েন্দা মনে করে, অথচ তার বুকের ভেতর থেকে কথা বের করে আজ আমি আপনাদের সামনে রাখছি। আমিই বর্তমানে কন্নৌজে আপনাদের চোখ আপনাদের কান। আমি যে কথাগুলো বলছি, আপনারা পারস্পরিক মতভেদ ভুলে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

গোবিন্দের মুখে একথা শুনে সবাই কথাবলা বন্ধ করে তার দিকে মনোযোগী হলো। আসলেই উপস্থিত মহারাজাদের সবাই গোবিন্দের যোগ্যতার

প্রশংসা করতো। তার দূরদর্শিতা বিশেষ করে একজন হিন্দু হয়েও গযনীর গভর্ণরের কাছে নিজেকে বিশ্বস্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারার ব্যাপারটি ছিল সেই সময়কার ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

গোবিন্দ এই তিন মহারাজার কাছে সঠিক সময়ে সঠিক সংবাদটি পৌঁছে দিতো, ফলে সবাই তাকে আপনজন এবং নিজের পক্ষের গোয়েন্দা বলেই বিশ্বাস করতো।

অপর দিকে গোবিন্দ গযনীর গভর্ণর আব্দুল কাদের সেলজুকীরও আস্থা ভাজন ছিল। সেলজুকী তাকে অতি বিশ্বস্ত বন্ধু মনে করতো। সেলজুকীর দরবারে গোবিন্দের অবাধ যাতায়াত ছিল। অথচ গোবিন্দ ছিল একজন গোড়া হিন্দু। আব্দুল কাদির সেলজুকীকে গোবিন্দ বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল, আমি মুসলমান হয়ে গেলে হিন্দুরা আমার সাথে মনের কথা দূরে থাক কাছে ধারেও বসতে দেবে না।

বাস্তবে গোবিন্দ ছিল ডাবল এজেন্ট। সে উভয় দিকের খবরাখবর উভয় দলের কাছেই সরবরাহ করতো। অবশ্য খবর সরবরাহের ব্যাপারে সে নিজে আগে যাচাই বাছাই করতো, কতটুকু তথ্য কোন দলকে দেয়া যাবে, কি পরিমাণ বললে উভয় দলের কাছে খবরটি বিশ্বাসযোগ্য হবে। এই বিষয়টি নির্বাচন করার ব্যাপারটি ছিল খুবই কূটিলতা ও চতুরতার ব্যাপার। এ কাজে গোবিন্দ শতভাগ উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল। প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দ হিন্দু-মুসলমান কারো পক্ষেই কাজ করছিল না, সে অর্থের লোভে দ্বিমুখী চরিত্র ধারণ করে দু'হাতে কাড়ি কাড়ি পয়সা কামাতে ব্যস্ত ছিল। হিন্দু মুসলিম কেউ গোবিন্দের এই দ্বিমুখী চেহারা আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই নির্বিঘ্নে গোবিন্দ তার চাতুর্যপূর্ণ কৌশল কাজে লাগিয়ে হিন্দু মুসলিম উভয় শাসকদের আস্থাভাজন রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলো।

এবার সে মহারাজাদের বৈঠকে তাদেরকে বলল, আপনাদেরকে প্রথমেই এই পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে যে, কন্নৌজে মাত্র এক হাজার গযনী সৈন্য রয়েছে বিধায় সেখানে আক্রমণ করা উচিত। আমি বলছি, আপনাদেরকে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। আপনাদের মনে রাখতে হবে, রাজ্যপালের বর্তমান রাজধানী রাড়ীকে গযনীর সেনারা ক্যাম্প বানিয়ে ফেলেছে। রাড়ীতে এখন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে।

কন্নৌজ থেকে যেসব হিন্দু পরিবার পালিয়ে গিয়েছিল, তারা এখন রাড়ীতে এসে বসতি স্থাপন করেছে। রাজ্যপালের যে সব সৈন্য রাড়ীতে রয়েছে তাদেরকে গযনীর সেনা কমান্ডাররা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। গযনীর সেনাদের আচার ব্যবহার

এতোটাই সন্তোষজনক যে, এ পর্যন্ত শ'খানেক হিন্দু সৈনিক ইসলাম গ্রহণ করেছে। হিন্দুদের অনেক কুমারী মেয়েও ইসলাম গ্রহণ করেছে।

রাজা রাজ্যপালের পুত্র লক্ষণপালও রাড়ীতেই অবস্থান করছে। লক্ষণপাল খুবই পেরেশান। সে মনে মনে মুসলমানদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ। কিন্তু তার বাবা মুসলমানদের অধীনতা মেনে নেয়ার কারণে তার পক্ষে বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে কোন কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। সে আমাকে একথাও বলেছে, সুযোগ পেলে সে তার বাবাকে হত্যা করে হলেও মুসলিম অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু সে ভয় পায় গযনী বাহিনীর প্রতিশোধকে। কারণ রাজা গযনী বাহিনীর মিত্র। কোন অবস্থাতেই রাজা গযনী শাসকদের বিরুদ্ধে যেতে চায় না। রাজার কথা হলো, সম্মুখ সমরে কোন হিন্দুর পক্ষেই গযনী বাহিনীকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। চক্রান্ত করেও গযনী বাহিনীকে পরাস্ত করা অসম্ভব। তাদের অধীনতা মেনে নিয়ে আমি যে কোন সময়ের তুলনায় ভালো আছি। অকারণে তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে কোন বিপর্যয় ডেকে আনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আমি বর্তমানে ভেতরের অবস্থা যতটুকু জানি; তাতে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, রাজ্যপালকে অতি গোপনে হত্যা করতে পারলে হয়তো রাড়ীতে গযনী বিরোধী একটা পরিবেশ তৈরী করা যাবে। তবে এই হত্যা কাণ্ড এমন সংগোপনে ঘটাতে হবে যাতে গযনী বাহিনীর কোন সন্দেহ করার অবকাশ না থাকে যে, এই কাণ্ড চক্রান্তমূলকভাবে কোন হিন্দুর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

গোবিন্দের একথা শুনে মহারাজা গোবিন্দ তার উরুতে থাপ্পর মেরে বললেন, এতক্ষণে তুমি আসল কথাটি বলেছো, আমি একথাটিই ভাবছিলাম। রাজ্যাপালকে যদি হত্যা করা যায় কিংবা সে মারা যায় তাহলে আমরা তার ছেলে লক্ষণপালকে আমাদের সাথে মেলাতে পারবো। সে গযনী বাহিনীর অধীনে থেকেও আমাদের পক্ষে গযনীর বিরুদ্ধে কাজ করতে পারবে। আমরা যখন সম্মিলিত বাহিনী গঠন করবো, তখন সে তার সৈন্যদের নিয়ে রাড়ীতে অবস্থানরত গযনীর গুটিকয়েক কমাণ্ডারকে বন্দি করে ঘোষণা দিয়ে দেবে, আমি এখন থেকে গযনীর সাথে কৃত মৈত্রী চুক্তি অস্বীকার করলাম। এরপর যদি সুলতান মাহমূদ সেনাভিযান চালায়, আমরা তখন দুর্গ-বন্দি না হয়ে উন্মুক্ত ময়দানে তার সঙ্গে মোকাবেলা করবো।

এ ব্যাপারে আলোচনা পর্যালোচনার পর 'সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হলো, লক্ষণপালকে হিন্দুদের পক্ষে কাজ করার সুযোগ দেয়ার জন্য রাজা রাজ্যপালকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু কোন রাজা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারলো না, কে রাজ্যপালকে হত্যা করবে এবং কিভাবে করবে?

গোবিন্দ জানালো, রাজ্যপাল কার্যত মুসলমানদের হাতে বন্দি। তার নিরাপত্তা বাহিনীতে সব সময় তিন চারজন গযনী সেনা অবস্থান করে। কাজেই রাজ্যপালকে প্রকাশ্যে হত্যা করে ফিরে আসা সহজ ব্যাপার নয়।

একজন বললো, রাজ্যপালের কোন নর্তকীকে হাত করে তার মাধ্যমে খাবারে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করতে হবে। আরেকজন এটা প্রত্যাখ্যান করে বললো, এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। কোন পেশাদার নর্তকী একাজ করতে মোটেও রাজি হবে না।

এ ব্যাপারে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে– বললো পুরোহিত। আমাকে কালাঞ্জর রাজ্যের দূত হিসেবে মহারাজা রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হোক। আমার সাথে আরো কিছু লোক দেবেন। আমি রাড়ীর বাইরে তাঁবু ফেলে রাজ্যপালকে খবর দিবো যে, কালাঞ্জরের পক্ষ থেকে মহারাজার কাছে দূত এসেছে। দূত তার তাঁবুতেই মহারাজার সাথে মিলিত হতে চান। আমার তাঁবুতে যদি রাজ্যপাল আসে, তাহলে আমি কোন পানীয় বা খাবারে মিশিয়ে তাকে এমন বিষ খাইয়ে দেবো, যা খুব ধীরে ধীরে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে, কেউ কিছুই টের পাবে না।

কয়েক দিন পরই রাজা দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে যাবে। দশ/পনেরো দিনের মধ্যে পেটের পীড়ায় ভুগে সে মারা যাবে। কোন ডাক্তার বদ্যি কাজে আসবে না। বিষ প্রয়োগের বিষয়টি কেউ মাথায়ও আনবে না।

তবে বিষ প্রয়োগের আগে আমি তাকে সম্মত করাতে চেষ্টা করবো, দৃশ্যত তিনি যেন গযনী বাহিনীর মিত্র হয়েই থাকেন এবং সময় সুযোগ মতো বিদ্রোহ করেন। আমি তার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করবো, আসলে সে আমাদের ধোঁকা দেবে না, গযনী সরকারকে ধোঁকা দেবে। পরিস্থিতি বুঝে আমি সিদ্ধান্ত নেবো, তার বেঁচে থাকা দরকার না মৃত্যু দরকার।

আপনার এই পরিকল্পনায় কোন কাজ হবে না। কারণ, গযনীর কমান্ডাররা তাকে রাড়ীর সীমানার বাইরে যেতে দেবে না– বললো গোবিন্দ। আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কিন্তু আমি যতটুকু জানি, আমি গভর্ণর আব্দুল কাদেরের ব্যক্তিগত বন্ধু ও অতি আস্থাভাজন লোক। আমাকেও রাজার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হয় না।

অবশ্য আমার কাছে একটা ফর্মূলা আছে। মহারাজা রাজ্যপাল খুবই নারী পাগল। তার সবসময় নতুন নুতন সুন্দরী মেয়ে না হলে চলে না। আপনি যদি দু'তিনটি সুন্দরী মেয়েকে সাথে নিয়ে যেতে পারেন। আর কোনভাবে রাজার

কানে খবরটি পৌঁছে দিতে পারেন যে, রাজার জন্য অতি সুন্দরী মেয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। তাহলে সে গযনীর শাসকদের অনুরোধ করে, বলে কয়ে আপনার কাছে চলে আসতে পারে।

তোমরা এ ব্যাপারে যে পদ্ধতিই অবলম্বন করোনা কেন, যে কেউ হোক কাজটি যে করে দিতে পারবে এবং প্রমাণ করতে পারবে যে, সে রাজ্যপালকে হত্যা করেছে, আমি তাকে জায়গীর ও সোনাদানা দিয়ে ভরে দেবো। তাকে এমন সুন্দরী মেয়ে জীবনের জন্যে দিয়ে দেবো, যা কোন দিন সে কল্পনাও করতে পারবে না– বললো গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন।

রাজা অর্জুন গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, গোবিন্দ! তুমি ইচ্ছা করলে এ কাজটি করতে পারো। যেহেতু তুমি ওখানে সবার কাছে বিশ্বস্ত, তাই রাজাকে খুন করার কোন না কোন একটি পন্থা তুমি বের করে নিতে পারবে।

পণ্ডিত মশাইও যেতে পারেন। সবাইকে জানিয়েই বলছি, দু'জনের মধ্যে যেই সফল হবে, সেই হবে আমার রাজ্যের সবচেয়ে বড় জায়গীরের মালিক। ভারতের সবচেয়ে সুন্দরী রক্ষিতা থাকবে তার ঘরে। রাজ্যাপালের মৃত্যুর পর আমরা আবার সবাই বসে সিদ্ধান্ত নেবো, আমাদেরকে কি করতে হবে। আপাদত এই কাজটিই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হোক।

গোবিন্দের এই ফর্মূলা সবার পছন্দ হলো এবং সবাই এক বাক্যে গোবিন্দকেই রাজ্যপালকে খুন করার দায়িত্ব দিল। সেই সাথে রাজা অর্জুনের মতো অন্যেরাও একাজে সফল হলে তাকে মোটা অংকের পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিল।

তিন মহারাজার এই চক্রান্তমূলক বৈঠকের কয়েক দিন পর দ্বিমুখী গোবিন্দ কন্নৌজে গভর্নর আব্দুল কাদের সেলজুকীর সামনে বসা ছিল। গোবিন্দ গভর্ণর সেলজুকীকে বলছিল, তিন রাজার বৈঠকে কি কি সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই সাথে বললো, মহারাজা রাজ্যপালের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত করা দরকার।

লাহোরের মহারাজা তরলোচনপালের সৈন্যরা কোথায় অবস্থান করছে? গোবিন্দের কাছে জানতে চাইলেন গভর্ণর সেলজুকী। যতটুকু মনে হয় এখান থেকে খুব দূরে নয়, তবে ঠিক কোথায় তারা অবস্থান করছে তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, বললো গোবিন্দ। এমনও হতে পারে তরলোচনপালের সৈন্যরা এখান থেকে লাহোর ফিরে গেছে। অবশ্য এখন তরলোচনপালই সব চেয়ে বেশি ভয়ংকর লোক।

এরপরও আমি আপনাকে বলতে চাই, সব রাজা মহারাজা এখন রাজ্যপালের প্রাণের শত্রু। তারা সবাই রাজ্যপালকে হত্যার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে। যে কোন দিন রাজ্যপাল কোন আততায়ীর হাতে নিহত হতে পারেন। কারণ, আপনাদের কোন লোকই তার সব নিরাপত্তারক্ষী, দরবারী আমলা এবং রাজমহলের বাসিন্দাদের চেনে না। কিন্তু আমি সবাইকে চিনি। কাজেই আমাকে রাজমহলের ধারে কাছে কোথাও থাকতে দিন; যাতে আমি ওখানকার পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে পারি।

মনে রাখতে হবে, রাজ্যপালের ছেলে লক্ষণপালও তার বাবার ঘোরতর শত্রু। তাকেও রাজার কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে এবং লক্ষণের উপর কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে।

গোবিন্দ ছিল স্বার্থপর। শিক্ষিত চতুর। অর্থলোভী গোবিন্দের কাছে জাতি ধর্মের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থটাই ছিল বড়। এ জন্য তার কাছে জাতিধর্ম সবই ছিল সমান। শাসক হিন্দু না মুসলমান এটা তার কাছে মুখ্য ব্যাপার ছিল না। সে ছলচাতুরী করে যে কোন শাসককেই পক্ষে নিয়ে আসতে পারতো। কন্নৌজ গযনী বাহিনী দখল করে নেয়ার পর কোন হিন্দুর পক্ষে ওখানকার গভর্ণরের কাছাকাছি যাওয়ার সাহস হয়নি। কিন্তু নিজেকে একজন আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষ ও শাসকদের জন্যে হিতাকাংখী সেজে মুসলিম গভর্নর আব্দুল কাদের সেলজুকীর কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গোবিন্দের কোনই বেগ পেতে হয়নি।

তিন রাজ্যের মহারাজাদের বৈঠকে গোয়ালিয়রের মহারাজা যখন গোবিন্দের প্রশংসা করে বললেন, গোবিন্দ! তোমার পক্ষেই কেবল বাড়ীতে গিয়ে রাজা রাজ্যপালকে খুন করানো সম্ভব। তুমিই পারবে সাফল্যের সাথে এ কাজ করতে। যদি তা করতে পারো, তবে আমার রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় জায়গীরের অধিকারী হবে তুমি। বাকী জীবন রাজার হালতে কাটিয়ে দেবে। সেই সাথে দেশের সেরা সুন্দরী মেয়েটিকে তোমার রক্ষিতা বানিয়ে দেয়া হবে।

বিশাল এই ভূসম্পত্তির প্রতিশ্রুতি ছিল গোবিন্দের জন্য লোভনীয়। ছোট খাটো একটি এলাকার অধিকারী হওয়া কম কথা নয়। মোটামুটি রাজা না হলেও পরগনার শাসক। লোকেরা এমন জায়গীরদারকেও রাজার মতোই সম্মান করে। কর দেয়, খাজনা দেয়। জায়গীরদারের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী থাকে। যখন যাকে ইচ্ছা তাকে ভোগ করতে পারে।

গোবিন্দ একজন অর্থ পিশাচ ও চতুর লোক। এই অঞ্চলের সব রাজ্য শাসকই তার ভক্ত। সবাই গোবিন্দের বুদ্ধি ও মেধার প্রশংসা করে। কিন্তু তাই বলে কেউ তো আর তাকে রাজার মতো কুর্ণিশ করে না। অথচ এসব রাজা মহারাজা কেউ তার মতো এতো প্রখর মেধার অধিকারী নয়। গোবিন্দের মতো লোকেরই রাজা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভারতের বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ধারা অনুযায়ি এটা অসম্ভব। সাধারণ মানুষ মনে করে রাজ্য শাসন সবার পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কোন বংশের লোকেরা রাজ্য শাসন করবে।

জায়গীর পাওয়ার লোভ সামলাতে পারলো না গোবিন্দ। সে সুযোগ খুঁজতে লাগলো কি ভাবে রাজ্যপালকে খুন করবে। গভর্ণর সেলজুকীর কাছ থেকে সে অনুমতি আদায় করে নিল। গোবিন্দ রাজার সাথে সাক্ষাত করতে না পারলেও রাজমহলের আশেপাশের এলাকায় বিনা বাধায় ঘোরাফেরা করতে পারবে।

এদিকে গভর্নর আব্দুল কাদের সেলজুকীর জন্যে গোবিন্দের দেয়া তথ্যগুলো ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি গোবিন্দকে বহু মূল্যের পুরস্কার দিয়ে বললেন, তুমি রাড়ী চলে যাও এবং রাজমহলের আশেপাশে থেকে সন্দেহজনক লোকদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখো। সেই সাথে কমান্ডার যুলকারনাইনের কাছে গভর্নর সেলজুকী বার্তা পাঠালেন, কোন ভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি যদি রাজার সাথে সাক্ষাত করতে আসে তবে তাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেবে না।

এর কয়েকদিন পর কালাঞ্জরের পুরোহিত কালাঞ্জরের রাজা গোবিন্দের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাতের জন্যে রাড়ীতে পৌছাল। রাড়ীর শহরতলীতে তাঁবু ফেলে কালাঞ্জর রাজার প্রতিনিধি রাজ্যপালের কাছে খবর পাঠালো, মহারাজা গোবিন্দের প্রতিনিধি আপনার সাথে রাজমহলের বাইরে তাঁবুতেই সাক্ষাত প্রত্যাশা করে।

কমান্ডার যুলকারনাইন সংবাদবাহী পুরোহিতকে রাজার কাছে পৌছতেই দিল না। পুরোহিত যখন হতাশ হয়ে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলো, তখন গোবিন্দ তার কাছে পৌছাল। গোবিন্দ পুরোহিতকে জানাল, বাস্তবে রাজা রাজ্যপাল এখন মুসলমানদের হাতে বন্দি। বর্তমানে তার উপর বিধি নিষেধের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে । হতাশ হয়ে পুরোহিত গোবিন্দকে অনুরোধ করলো, আমি তো ব্যর্থ হলাম। আপনি রাজ্যপালকে হত্যার সমুদয় ব্যবস্থা করুন।

গোবিন্দ মহারাজাদের থেকেও সুবিধা নিতো। গোবিন্দ তার প্রতি রাজাদের আস্থার মাত্রা আরো বাড়ানোর জন্য পুরোহিতকে বললো, আপনি রাজ্যপালের

ছেলে লক্ষণপালকে আপনার সাথে নিয়ে যান। নয়তো রাজা নিহত হলে গযনী বাহিনী লক্ষণপালকে কয়েদ করতে পারে। গোবিন্দ পুরোহিকে জানালো, লক্ষণ একটি যুবক ছেলে। যৌবনের উষ্ণতায় সম্প্রতি সে এমন কিছু কাজ করেছে যে, গযনী বাহিনী তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করছে। গযনীর শাসকরা ভাবছে, তারা লক্ষণের চলাফেরার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করবে, অথবা লক্ষণকে নজরবন্দি করে রাখবে।

পুরোহিতকে একথা বলে গোবিন্দ সোজা লক্ষণ পালের কাছে চলে গেল। লক্ষণকেও সে একই কথা শোনাল যা পুরোহিতকে বলেছিল। একথা শুনে গোপনে লক্ষণপাল পুরোহিতের সাথে চলে গেল এবং যাবার সময় গোবিন্দকে বলে গেল, সে যেন তার বাবাকে হত্যার ব্যবস্থা করে। লক্ষণ নিজেও গোবিন্দকে লোভনীয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিল। লক্ষণের মুখে পুরস্কারের ঘোষণা শুনে গোবিন্দ রাজ্যপালকে হত্যার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলো।

গোবিন্দ গভর্ণর আব্দুল কাদের সেলজুকীকে যে তথ্য দিয়েছিল এসব তথ্য লিখে তিনি দ্রুত একজন সংবাদবাহককে গযনী সুলতানের কাছে প্রেরণ করলেন। সেলজুকী পয়গামে লিখলেন, এখানকার মহারাজাদের উপর আস্থা রাখা যায় না। কাজেই এখানকার কোন উদ্ভুত পরিস্থিতি কিংবা হামলা বা অবরোধ ঠেকাতে একটি অশ্বরোহী ইউনিটকে জলদি পাঠিয়ে দিন। বড় কোন আঘাত হলে যাতে আপনাদের আসা পর্যন্ত শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখা যায়।

একের পর এক ফন্দি এঁটে গোবিন্দ মহারাজা রাজ্যপালের রাজমহলে যাতায়াতের অনুমতি পেয়ে গিয়েছিল। এবার সে রাজ্যপালকে কিভাবে হত্যা করা যায় এ ফন্দি আঁটতে লাগল। হিন্দু হওয়ার সুবাদে হিন্দুদের সাথে সে মেলামেশা বাড়িয়ে দিল। স্থানীয় গোঁড়া হিন্দুদের সাথে সম্পর্ক মজবুত করার জন্যে গোবিন্দ মন্দিরে যাতায়াত বাড়িয়ে দিল। মন্দিরের পুরোহিতদের সাথেও সে গড়ে তুললো গভীর সম্পর্ক। মন্দিরের গোপণ প্রকোষ্ঠে বসে সে পুরোহিতদের সাথে রাজা রাজ্যপাল ও সুলতান মাহমূদ সম্পর্কেও খোলামেলা আলাপ আলোচনা করতো। মন্দিরে গিয়ে গোবিন্দ নিজেকে একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিক হিন্দু হিসেবে জাহির করতো।

একদিন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত গোবিন্দকে জানাল, এক হিন্দু মেয়ে মুসলমান হয়ে কমান্ডার যুলকারনাইনকে বিয়ে করেছে। হিন্দু মেয়েরা আমাকে জানিয়েছে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুলকারনাইনের স্ত্রী মুসলমান হয়েছে বটে, কিন্তু তার হৃদয়ে হিন্দুত্ববাদ বহাল রয়েছে। স্বামীকে সে এতোটাই শ্রদ্ধা করে যে,

স্বামীর ধর্মকেই সে নিজের ধর্ম মনে করে। কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে সরে গিয়ে আশপাশের চতুর্দিকে তাকালে তার কাছে হিন্দুত্ববাদই আকর্ষণীয় মনে হয়। সে হিন্দু মহিলাদের জানিয়েছে, তার স্বামী তাকে বলেছে, সে যেন হিন্দু মেয়েদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে। এই সুবাদে সে হিন্দু মেয়েদের সাথে মেলামেশা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ইসলামের কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না।

অসহায় এই মেয়েটিকে এই ডাকাতের হাত থেকে মুক্ত করা দরকার। মেয়েটি শৈশব থেকেই ধর্মনিষ্ঠ পরিবারে বেড়ে উঠেছে। ধার্মিক পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে হিন্দুত্ববাদ তার রক্তের শিরায় শিরায় মিশে আছে। কিন্তু কমান্ডার যুলকারনাইন মেয়েটির প্রতি এমন সহানুভূতি দেখিয়েছে যে, মেয়েটি যুলকারনাইনের উপকার ভুলতে পারছে না।

একথা শোনে গোবিন্দের মাথায় দারুণ বুদ্ধি এলো। সে বুঝে নিল এই মেয়েটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। গোবিন্দ ছিল ধূর্ত। চাতুর্যপূর্ণ বুদ্ধিমত্তায় তার কোন জুড়ি ছিল না। সে ভাবনায় পড়ে গেল, এই মেয়েটিকে কি রাজ্যপালের হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা যায়?

চিন্তা ভাবনা করে সে একটা পথ আবিষ্কার করে ফেলল। পণ্ডিতকে গোবিন্দ বললো, আপনি আমাকে সেই সব হিন্দু মেয়েদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন যেসব মেয়েদের সাথে এই মেয়েটি মেলামেশা করে।

পণ্ডিত গোবিন্দকে জানালো, মেয়েটি হিন্দু মেয়েদের সাথে শুধু গল্পগুজবই করে না, সে তাদের সাথে স্নান করতে নদীতেও যায়। তার স্বামী এসবকে কিছু মনে করে না। স্বামী মেয়েটিকে খুবই বিশ্বাস করে এবং তার উপর গভীর আস্থা রাখে।

এই আলোচনার কয়েক দিন পর এক দিন দুপুরে রাজিয়া আরো কয়েকজন হিন্দু মেয়ের সাথে নদীতে গোসল করতে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে ছিল বড় বড় অশ্বথ বৃক্ষ ও ঝোপ ঝাড়।

একটি বড় অশ্বথ গাছের নীচে একজন সন্যাসীরূপী বয়স্ক লোক মাথা নীচের দিকে করে বসেছিল। লোকটির ছিল লম্বা দাড়ি এবং মাথার চুল কাধ পর্যন্ত দীর্ঘ। চেহারা ছবি অনেকটা মুসলমানদের মতো। কিন্তু তার পোষাক পরিচ্ছদ হিন্দু সন্ন্যাসী ঋষিদের মতো। রাজিয়া ও তার সঙ্গীনী মেয়েরা যখন লোকটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন মাথা সোজা করে আঙুল উঁচিয়ে মেয়েদের থামতে ইঙ্গিত করল। মেয়েরা তার ইঙ্গিতে দাঁড়ালো। সাধুরূপী লোকটি তাদেরকে পাশে বসিয়ে রাজিয়ার চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

রাজিয়ার দৃষ্টিও লোকটির চেহারার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। সন্ন্যাসী রাজিয়ার চোখে চোখ রেখে তার দু'টি হাত রাজিয়ার মাথায় রাখল এবং ধীরে ধীরে তার কপালে হাত বুলাতে লাগল। সঙ্গিনী মেয়েরা দেখল, রাজিয়া পলকহীন দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীকে দেখছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে মেয়েটি যেন সম্বিত হারিয়ে ফেলেছে, সে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে সন্ন্যাসীর চেহারার দিকে।

তোমার আত্মা পথ হারিয়ে দিগ্বিদিক ঘুরছে– দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ক্ষীণ আওয়াজে কানে কানে বলার মতো করে রাজিয়ার উদ্দেশ্যে বললো সন্ন্যাসী। সে আরো বললো, তোমার অন্তর এক জায়গায়, আর দেহ আরেক জায়গায়। অন্তর পবিত্র, কিন্তু দেহ অপবিত্র। এক চোখে আলো অপর চোখে ঘোরতর অন্ধকার। পর জনমের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। পর জনমে শিয়ালের রূপ ধারণ করবে। মানুষ ধূর্ত শিয়াল বলে ঘৃণা করবে।

হঠাৎ সন্ন্যাসী মাথা ঝাকুনী দিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠার মতো করে বললো– যাও! চলে যাও। ছিঃ! জগতে এমন পাপিষ্ঠ অন্তরও থাকে?

নওমুসলিম অনভিজ্ঞ রাজিয়ার অন্তরে সন্ন্যাসীরূপী এই লোকের সংশয়পূর্ণ কথায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হলো। রাজিয়ারূপী রত্মার অন্তরে শুরু হলো দ্বান্দ্বিক তোলপাড়।

সন্ন্যাসী স্বগতোক্তির মতো করে বলতে লাগল– এক চোখে ঘোরতর অন্ধকার। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা, তুমিও কিছুই দেখবে না। তুমি তা বরদাশত করতেও পারবে না। যাও, চলে যাও। মসজিদ ও মন্দিরের মাঝামাঝি ঘোরতর অন্ধকার। তুমি এই অন্ধকারে হাতড়ে মরবে। নিজের পরিণতির কথা জিজ্ঞেস করো না। যদি জিজ্ঞেস করো, তাহলে মরে যাবে। যদি মরতে না পারো তাহলে পাগল হয়ে যাবে।

সন্ন্যাসীর কথা, তার দৃষ্টি ও ভবিষ্যতবাণী বলার মধ্যে এমন যাদুময়তা ছিল যে, অনভিজ্ঞ রাজিয়া তাৎক্ষণিক বদলে গেলো। কারণ, রক্তমাংসে রাজিয়া ছিল হিন্দু। তাছাড়া বিগত বছরখানেক ধরে রাড়িতে এসে সে হিন্দু মেয়েদের সাথে মেলামেশা করতে থাকে। যার ফলে হিন্দু কৃষ্টি কালচার মনের অজান্তেই তার অন্তরে পুনর্বার বাসা বাধে।

জাতিগতভাবে হিন্দুরা প্রকৃতি পূজারী এবং মানুষের পুনর্জনমে বিশ্বাসী। হিন্দুরা মনে করে মানুষ একবার মরে গিয়ে কৃতকর্মের ভিত্তিতে পুনর্বার পৃথিবীতে পুনর্জন্ম লাভ করে। ধর্মকর্ম পালন করলে মরে গিয়ে মানুষ আবার বিভিন্ন হিংস্র জন্তু জানোয়ারের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসে।

সন্ন্যাসীর এই যাদুকরী বাক্য ও ভবিষ্যতবাণী শুনে রাজিয়া এতোটাই তন্ময় হয়ে পড়ল যে, সে সন্ন্যাসীর সামনে থেকে উঠতেই চাচ্ছিল না। সন্ন্যাসীর কথায় সে বুঝতে পারল, ইসলাম গ্রহণ করে সে মারাত্মক অপরাধ করেছে, যে অপরাধের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। এই অপরাধের জন্যে পুনর্জন্মে রাজিয়া শিয়ালের রূপধারণ করে দুনিয়াতে আসবে এবং ইতর জানোয়ারের জীবন যাপন করবে।

সঙ্গী মেয়েরা সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করতে লাগলো। তারা সন্ন্যাসীর উদ্দেশে বললো– বাবাজী! এই মেয়ে বুঝে শুনে ধর্ম ত্যাগ করেনি। আপনি তার প্রতি একটু সদয় হোন। কিন্তু সন্ন্যাসী আর কোন কথা বলল না। অনেক্ষণ পর যদিও মুখ খুলল, কিন্তু বজন গাইতে লাগল। অনেক অনুরোধের পর বললো–

এই মেয়েটিকে আর নদীতে নিয়ে যেয়ো না– গম্ভীর কণ্ঠে বললো সন্ন্যাসী। মথুরার জলহস্তি ওকে আস্ত গিলে ফেলার জন্যে এসে গেছে। শুধু শুধু আমি মেয়েটিকে দেখিনি। বাতাসে একটি গন্ধ ভেসে এসেছে, যা দুনিয়ার কোন মানুষ টের পায় না। এই গন্ধ হলো সেই সব পাপিষ্ঠ আত্মার গন্ধ, যে সব আত্মারা পাপের মধ্যে ডুবে থাকে এবং ভেতরে ভেতরে নরকের আগুনে জ্বলতে থাকে।

তোমরা আমার কাছাকাছি এলে এই মেয়েটির দেহ থেকে আমার নাকে এমন গন্ধ লেগেছিল। এজন্য আমার ধ্যান ভেঙ্গে যায়। আমি মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে থাকি। আহা! মরার পর যার আত্মা পাপিষ্ঠ হবে, জীবন্ত অবস্থায়ই তা নরকে জ্বলতে শুরু করেছে!

হঠাৎ রাজিয়া রূপী রত্না বলতে লাগল– হ্যাঁ, ঋষি বাবা! আমি সত্যিকার অর্থেই পাপি। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করেছি। এক লোক আমার অন্তরকে জয় করে নিয়েছিল। ভালোবাসার টানে আমি ধর্মান্তরিত হয়ে তাকে বিয়ে করি। কিন্তু আমার ধর্মকে আমি ভুলতে পারিনি। আমি আসলে কিছুই জানি না সাধু বাবা! আমি একটা মূর্খ। আমাকে এই নরক থেকে বাঁচার পথ দেখান।

কিন্তু যে পাপ তুমি করে ফেলেছো, এর শাস্তি থেকে তুমি কিভাবে মুক্তি পাবে?

কিভাবে এই পাপ থেকে বাঁচতে পারবো, সে কথা আপনি বলে দিন ঋষি বাবা! আপনি অবশ্যই সেই পথের খবর রাখেন। আত্মাকে পাপের শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্যে আমি জীবন্ত চিতায় শুতেও রাজি আছি। পরজনমের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে আমি নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও রাজি।

কি বলবো, বলতেও ভয় করে! তোমার যদি সাহস থাকে তবে শোন। পানি থেকে সব সময় দূরে থাকবে। তোমাকে একটি জীবনের বলিদান করতে হবে!

'দু'চোখ বন্ধ করে খুব ক্ষীণ আওয়াজে কথা বলছিল সন্ন্যাসী। হ্যাঁ, তোমার পাপ মোচনের জন্যে তোমাকে অনেক বড় মানুষের বলিদান করতে হবে। তোমাকে বড় মানুষ খুন করতে হবে। হ্যাঁ, বলা মুশকিল মহারাজাকে বলিদান...।

হ্যাঁ, যেকোন পাপীকে হত্যা করে পাপের স্খলন ঘটাতে হবে। মহারাজাও পাপী, যে মহারাজা তার বাপদাদার ভগবানদেরকে মুসলমানের হাতে ধ্বংস করিয়ে এখন তাদের বন্দী জীবন নিয়ে পরম তৃপ্তিতে আছে।

হ্যাঁ, সে পাপী, বড় পাপীষ্ঠ, মহাপাপী রাজা।

শোন মেয়ে! যদি তোমার পাপের স্খলন চাও, তাহলে এই পাপি রাজাকে খুন করে ফেলো। প্রথমে মহারাজার রক্তের টিপ নিজের কপালে লাগাও, পরে এই টিপের উপরে তোমার পাপিষ্ট স্বামীর রক্তের টিপ লাগাও। এর পর সোজা মন্দিরে চলে যাবে। সেখানে গেলে আলো দেখতে পাবে। এই আলো হবে তোমার মুক্তির ইঙ্গিত।

হত্যা? স্বগতোক্তি করলো রাজিয়া। কেঁপে উঠলো তার সর্বাঙ্গ। না, না! আমি তা পারবো না!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। রাজপুতের মেয়ে একটা পাপিষ্টকে হত্যা করতে ভয় পায়- বললো সন্ন্যাসী। ঠিক আছে, যদি ভয় পাও তবে নদীতে চলে যাও। নদীতে নেমে জলহস্তির পেটে চলে যাও, আর পরজনমে শিয়াল হয়ে ফিলে এসো।

আজ যাকে ছেড়ে দিচ্ছো, সেই মহারাজার পালিত কুকুরেরা তোমাকে ছিড়ে খাবে। এই মহারাজার তীরের আঘাতে তুমি আহত হবে। তীরবিদ্ধ অবস্থায় জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মরবে। তোমার জখমে ঘা হবে। ঘায়ে পোকা হবে। আর পোকার কামড়ে তুমি চিৎকার করে জঙ্গলে দৌড়াবে। যাও! তাই হবে, তাই হবে।

রাজিয়ার সঙ্গীনী এক মেয়ে সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে বললো- সাধু মহারাজ! দেবতাদের অভিশাপ ঠেকানো যায় না। আপনি রাজাকে খুন করার কোন সহজ পন্থা তাকে বলে দিন। যাতে একাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। তার প্রতি দয়া করুন। মহারাজ! ভগবানের কৃপা থেকে তাকে দূরে ঠেলে দেবেন না। রাজিয়া ও সঙ্গীনী মেয়েদের উপর্যুপরী অনুরোধে সন্ন্যাসী মহারাজা রাজ্যপালকে হত্যার যে পদ্ধতি বললো, তা ছিল এমন-

মহারাজা রাজ্যপাল নারী লোভী। রাজিয়া খুবই সুন্দরী যুবতী। ইসলাম ধর্ম প্রচারের নামে সে রাজপ্রাসাদে যাবে এবং সুযোগ মতো মহারাজার খাস কামরায়

ঢুকে পড়বে। যেহেতু রাজিয়া কমান্ডার যুলকারনাইনের স্ত্রী এজন্য তাকে দেখে মুগ্ধ হলেও মহারাজা তার প্রতি হাত বাড়াবে না। কিন্তু রাজিয়াকেই উদ্যোগী হয়ে নিজের রূপ সৌন্দর্য দিয়ে মহারাজাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে হবে, যাতে মহারাজা বুঝে যে, রাজিয়া নিজেই স্বেচ্ছায় মহারাজাকে সঙ্গ দিয়ে ধন্য হতে চাচ্ছে। তাহলে একান্তে মিলনের জন্য রাজাই এগিয়ে আসবে।

রাজিয়া তার শাড়ীর আঁচলে একটি ধারালো খঞ্জর লুকিয়ে রাখবে। সুযোগ মতো সেই খঞ্জর দিয়ে রাজাকে হত্যা করে ঘরে এসে স্বামীকে হত্যা করবে। উভয়ের হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত হলে সোজা মন্দিরে চলে আসবে। মন্দিরে এলে পুরোহিত তাকে দূরে কোথাও নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।

ঋষি মহারাজ! আমি কি এতোটা সাহসী হতে পারবো? কীভাবে খুন করবো আমি? আমার তো হাত কাঁপবে! বললো রাজিয়া।

সন্ন্যাসী তার পাশে রাখা একটি বাক্স হাতড়িয়ে একটি কৌটা বের করল এবং তা থেকে কিছুটা তুলার মতো বের করে একটি কাপড়ের টুকরোতে বাঁধতে বাঁধতে বললো– তুমি যখন রাজাকে হত্যার উদ্দেশ্য ঘর থেকে বের হবে তখন এক গ্লাস পানিতে এই তুলাটি ভিজিয়ে পান করে নেবে। দেখবে তোমার মধ্যে সাহস এসে যাবে। কোনরূপ ভয়-ভীতি থাকবে না।

সেই দিন রাতের বেলায় গোবিন্দ রাড়ির প্রধান মন্দিরে বসা ছিল। তার সামনে দু'জন হিন্দু মহিলা তাকে বলছিল– রাজিয়া দিনের বেলায় তাদের সাথে নদীতে যাওয়ার পরিবর্তে ঘরে ফিরে এসেছিল।

সে আমাকে কোনরূপ সন্দেহ তো করেনি? জিজ্ঞেস করল গোবিন্দ।

আরে আমরা তো আপনাকে আগে থেকেই জানতাম, তার পরও আমাদেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, সেই সন্ন্যাসীরূপী লোকটি আপনিই– বললো এক মহিলা।

আপনার এই সন্ন্যাসীরূপ ধারণ ছিল অকৃত্রিম। আপনার কাজে আপনি শতভাগ উত্তীর্ণ হয়েছেন। এরপর আমরাও রাজিয়াকে কয়েকটি কাহিনী শুনিয়ে এ কাজে সম্মত করিয়ে ফেলেছি– বললো অপর মহিলা।

রাজিয়াকে এই হত্যাকাণ্ডে রাজি করানোর জন্যে এতো জল ঘোলা করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ ধর্মান্তরিত হওয়ার অনুশোচনায় সে এমনিতেই দগ্ধ হচ্ছিল। সে খুঁজে ফিরছিল স্বধর্মে ফিরে গিয়ে পাপ স্খলনের একটা উছিলা। সন্ন্যাসীরূপী গোবিন্দের কথার মধ্যে সে পাপ স্খলনের উছিলা দেখতে পাচ্ছিল।

রাজিয়ার স্বামী যুলকারনাইন তাকে হিন্দু মেয়েদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু অপরিপক্ক রাজিয়া যখন হিন্দু মেয়েদের সাথে মিশতে

শুরু করল, তখন হিন্দু মেয়েরা তার মধ্যে বাপদাদার ধর্মকেই পুনরুজ্জীবিত করল। রাজিয়া তার পৈতৃক ধর্মমতকেই পুনরায় আবিষ্কার করল এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলো। ইসলাম ধর্ম প্রচার দুরের কথা, ইসলামের কোন কথাই সে কোন দিন হিন্দু মহিলাদের কাছে উচ্চারণ করতে পারেনি।

পরদিন নানা কাজের চাপে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত যুলকারনাইন রাতে ঘরে ফিরে ক্লান্তির কারণে শুয়ে পড়লো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। রাজিয়ার প্রতি ঘুনাক্ষরেও কোন দিন যুলকারনাইনের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। ফলে তার আস্থা পরীক্ষার কোন প্রয়োজনও সে কোন দিন বোধ করেনি।

কিন্তু দিনের বেলায় সন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী রাজিয়াকে অস্থির করে তুলে ছিল। যুলকারনাইন ঘুমিয়ে পড়তেই রাজিয়ার মধ্যে জেগে উঠলো রত্মার বৈশিষ্ট্য। সে পাপ স্খলনের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো।

সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠে সন্ন্যাসীর দেয়া তুলা পানিতে ভিজিয়ে পান করল রাজিয়া।

এতক্ষণ তার মধ্যে যে ভয়, আতংক ও জড়তা ছিল তুলা ভেজানো পানি পান করার পর তার মন থেকে সব ভয় শংকা ও জড়তা দূর হয়ে গেল। এরপর রাজিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে চাঁদের আলোয় পায়চারী করছিল সে। তখন নিজের মধ্যে একটা পাশবিক শক্তি উন্মাদনা টের পেলো সে। রাজিয়া অনুভব করছিল, যেন সে গযনী আক্রমণ করে সুলতান মাহমুদকে খুন করে ফেলবে।

এই ঘটনার এক দিন আগে রাজিয়া তার স্বামী যুলকারনাইনের সাথে বলেছিল, আগামী কাল থেকে সে রাজমহলে যেতে চায়, যাতে সেখানকার মহিলাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে পারে। রাজিয়ার কথা শুনে কমান্ডার যুলকারনাইন এই ভেবে খুবই খুশী হয়েছিল যে, তার প্রিয় স্ত্রী তার কথামতো হিন্দু মেয়েদের মধ্যে নিজ দায়িত্বে ইসলাম প্রচার করছে।

পরদিন যথারীতি রাজিয়া রাজমহলে গেল। রাজমহলের সবাই জানতো রাজিয়া কমাণ্ডার যুলকারনাইনের স্ত্রী। রাজিয়া মেয়েদের এঘর সে ঘর ঘুরতে ঘুরতে সুযোগ বুঝে মহারাজা রাজ্যপালের কক্ষে চলে গেল। রাজা তাকে দেখে খুব খুশী হলেন। খুশীর কারণ এই নয় যে, রাজিয়া তার উপদেষ্টা কমান্ডার যুলকারনাইনের স্ত্রী। খুশীর মূল কারণ রাজিয়া যুবতী এবং অস্বাভাবিক সুন্দরী। রাজা রাজিয়াকে পরম আগ্রহে ও সম্মানে তার পাশে বসাল।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা উভয়ে একে অন্যের সাথে এমন অন্তরঙ্গ ভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল যেন অনেক দিন থেকে তারা পরস্পরের পরিচিত।

রাজিয়ার মধ্যে অপরিচিতের দূরত্ব দূর হয়ে যাওয়ার বড় কারণ হলো সে ছিল মূলত হিন্দু। আর মনে প্রাণে সে হিন্দুই থেকে গিয়েছিল। ফলে একজন জাত হিন্দুর সাথে তার হৃদ্যতা তৈরী হতে বেশী সময় লাগেনি। তাছাড়া রাজিয়া ছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের প্রতি মনোযোগী। যত দ্রুত সম্ভব সে রাজার সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করল। রাজাকে আপন করে নেয়ার জন্যে সে নারীত্বের যতটুকু কারিশমা তার মধ্যে ছিল সবটুকুই সে প্রয়োগ করল। কথায় কথায় নিজের রূপ-লাবণ্য রাজার সামনে তুলে ধরার জন্য নিজে থেকেই সে রাজার কাছাকাছি বসল এবং বার বার বিভিন্ন ছুতোয় শাড়ির আঁচল খুলে শরীর ঢাকার ভান করে নিজের দেহকে উন্মুক্ত করে দিচ্ছিল।

রাজা ছিল নারী লোভী। নবাগত রাজিয়ার গায়ে পড়া অঙ্গভঙ্গি তার মধ্যে প্রচণ্ড কামনা সৃষ্টি করল এবং সে রাজিয়াকে একান্তে পাওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়লো। যেহেতু রাজিয়া নিজেই বিশেষ এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে রাজাকে একান্তে পাওয়ার পাঁয়তারা করছিল, ফলে তাদের শরীরী কথাবার্তায় পৌছাতে বেশী সময়ের দরকার হলো না। রাজিয়াকে একান্তে পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল বুড়ো রাজ্যপাল।

রাজিয়াও কালবিলম্ব না করে রাজার একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে বললো– মহারাজ! অনুমতি দিলে আজ রাতেই আমি আপনার কাছে একান্তে মিলিত হতে আগ্রহী। তবে আমি চাই আমার এই আসা সবার অগোচরে থাকুক এবং কারো দৃষ্টিতে না পড়ুক।

রাজাও তাতে সায় দিলেন। তিনি এও বললেন, আমাদের একান্ত গোপন অভিসারের কথা তোমার স্বামী কমান্ডার যুলকারনাইন জানতে পারলে আমাদের উভয়কেই খুন করে ফেলবে। তিনি রাজিয়াকে রাতের বেলায় আসার জন্যে একটি গোপন পথ দেখিয়ে দিলেন এবং একটি গোপন কক্ষ দেখিয়ে বললেন, আমি রাতের বেলায় এই কক্ষে একাকি থাকবো।

সেই রাতেই রাজিয়া সুরক্ষিত পথে রাজ্যপালের গোপন কক্ষে এসে হাজির হলো। রাজ্যপাল রাজিয়াকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বললো– তুমি তো শরাব পান করবে না, কারণ হঠাৎ পান করলে এর রেশ অনেক্ষণ থাকবে। তোমাকে যেহেতু তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে হবে এজন্য শরাব পান না করাই ভালো হবে।

রাজিয়া তাকে বললো, হ্যা, ঠিকই বলেছেন। আপনি নিজে নিজেই শুরাহীতে ঢেলে পান করুন। আমি শরাবের গন্ধও সহ্য করতে পারি না। আমার মাথা চক্কর দেবে।

রাজ্যপাল ছিলেন দাঁড়ানো অবস্থায়। দাঁড়ানো থেকে নীচের দিকে ঝুকে তিনি শুরাহীতে মদ ঢালতে লাগলেন। এদিকে রাজিয়া তখনো তুলা ভেজানো পানীয়ের উত্তেজনায় উত্তেজিত। রাজাকে মদের গ্লাসের প্রতি মগ্ন থাকতে দেখে সে শাড়ীর ভাঁজ থেকে খঞ্জরটি বের করে দু'হাত উপরে তোলে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে রাজ্যপালের পিঠে খঞ্জর ঢুকিয়ে দিল।

খঞ্জরের আঘাতে রাজ্যপাল যেই সোজা হয়ে দাঁড়ালো অমনি রাজিয়া খঞ্জর টেনে বের করে সোজা রাজার বুকে আমূল খঞ্জরটি বিদ্ধ করল। রাজার মুখে আর কোন ধরনের শব্দ উচ্চারিত হলো না। ধপাস করে রাজ্যপাল মরা বকরির মতো মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

বুকে বিদ্ধ খঞ্জরটি টেনে বের করে রাজার দিকে তাকাল রাজিয়া। খঞ্জর বিদ্ধ রাজার দেহটি কয়েক বার খেচুনী দিয়ে অসাড় ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ল।

রাজিয়ার অনুভবই হচ্ছিল না, সে কতো বড় একজন ব্যক্তিকে অবলীলায় খুন করে ফেলেছে। রাজ্যপাল তখন শুধু একজন হিন্দু রাজা নন, তিনি গযনী সুলতানের বিশ্বস্ত বন্ধু। সুলতান মাহমূদের সাথে চুক্তি করার ফলে মূলতঃ রাজ্যপাল মুসলমানদের সহযোগী হয়েছে। তাই রাজ্যপালকে হত্যা করার পরিণতি কি ভয়াবহ হতে পারে এর বিন্দু বিসর্গও কোন চিন্তা ভাবনা রাজিয়ার মনে ছিল না। বরং রাজিয়া রাজ্যপালের নিথর দেহ দেখে পরম স্বস্তি বোধ করলো।

হত্যা করার পর খুব ধীর স্থির ভাবে যে শুরাহীতে রাজ্যপাল শরাব পান করতে শরাব ঢেলে ছিল, রাজিয়া আস্তে করে শরাবের গ্লাসটি তার ঠোঁটে ছোয়াল এবং এক নিঃশ্বাসে সবটুকু শরাব গলাধঃকরণ করলো। অতঃপর খুব শান্তভাবেই রাজার কক্ষটির দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিয়ে কক্ষ ছেড়ে পথে নামলো এবং লোক চক্ষুর অন্তরালেই নিজের ঘরে পৌছে গেল।

রাজিয়ার ঘরে কোন পরিবর্তন ছিল না। যথারীতি নির্বিঘ্নে ঘুমাচ্ছিল যুলকারনাইন। রাজিয়ার হাতে রক্ত মাখা খঞ্জর। এবার তার স্বামী যুলকারনাইনকে হত্যার পালা।

গভীর ঘুমে যুলকারনাইন। খোলা জানালা দিয়ে চতুর্দশী চাঁদের আলো এসে যুলকারনাইনের ঘুমন্ত চেহারা ও খোলা বুকের উপর পড়ছে। সোজা চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছে যুলকারনাইন। নিঃশ্চিন্তে। এখন বুকের উপর একবার খঞ্জর বিদ্ধ করলেই নির্ঘাত মৃত্যু।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় ধীরে ধীরে স্বামীর দিকে এগিয়ে গেল রাজিয়া। রক্তমাখা খঞ্জর তার হাতে। কাছে গিয়ে দু'হাত উপরে তুলে গভীরভাবে ওর ঘুম পরখ করতে লাগল রাজিয়া। নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলায় উঠানামা করছে বুক। এক পলক যুলকারনাইনের চেহারার দিকে তাকাল রাজিয়া।

হঠাৎ যুলকারনাইনের ঠোঁটে দেখা দিল মুচকি হাসি। হয়তো ঘুমের মধ্যে কোন স্বপ্ন দেখে হাসছে সে। অসম্ভব মায়াবী চেহারা। মনকাড়া ওর হাসি। রাজিয়ার দেখা এই জগতের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্পাপ যুবক। হিন্দু মুসলিম সকলের কাছে প্রিয় যুলকারনাইন। উচু নীচু ধনী গরীব সবার কাছে পরম শ্রদ্বেয় কমান্ডার যুলকারনাইন। এই দূরদেশের চরম শত্রুদের কাছেও যুলকারনাইন একটি পরিচিত মুখ আদরনীয় নাম।

যুলকারনাইনের স্বপ্নময় মিষ্টি হাসি রাজিয়ার মধ্যে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। নেশার ঘোর কেটে গেল তার। আসলে শরাব পানের কারণে সন্ন্যাসীর দেয়া ঔষধের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকতা ফিরে এসে ছিলো রাজিয়ার মধ্যে। একটু আগে যে রাজিয়া অবলীলায় মহারাজা রাজ্যপালকে খুন করে এলো, স্বামীকে খুন করতে উদ্যত সেই খুনী রাজিয়ার দেহ হঠাৎ কেঁপে উঠলো– উত্তোলিত হাত থেকে রক্তমাখা খঞ্জরটি পড়ে গেল যুলকারনাইনের পেটের উপরে। আর রাজিয়া হাউমাউ করে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল যুলকারনাইনের বুকের উপরে।

ধড়ফড় করে জেগে উঠলো যুলকারনাইন। ঘটনার আকস্মিকতায় সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে বাতি জ্বালালো। তার বিছানায় রক্তমাখা খঞ্জর দেখে অবাক হয়ে গেল। রাজিয়া তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। যুলকারনাইন আকস্মিক এই অবস্থার কোন কূলকিনারা বুঝে উঠতে না পেরে রাজিয়াকে টেনে তুলে জিজ্ঞেস করলো, এসব কি? এই রক্তমাখা খঞ্জর কোত্থেকে এসেছে? তুমি এভাবে কাঁদছো কেন?

রাজিয়া কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো–'না, আমি তোমাকে হত্যা করতে পারবো না। আমি আমার কলিজায় খঞ্জর চালাতে পারবো না। একথা বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো রাজিয়া।

তখনো যুলকারনাইন ঘটনার মাথামুণ্ডু কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারল না। তবে এতটুকু আন্দাজ করতে পারলো, নিশ্চয় কোন চক্রান্তের শিকার হয়েছে রাজিয়া। যা সে সহজে বলতে পারছে না। একজন কমান্ডার হিসেবে সে যে

হিন্দুদের টার্গেট সে সম্পর্কে সতর্ক ছিল যুলকারনাইন। তাই ঠাণ্ডা মাথায় সে রাজিয়াকে জিজ্ঞেস করলো–

কি হয়েছে রাজিয়া? আমাকে সব খুলে বলো, তোমার কোন ভয় নেই। তুমি কোন অপরাধ করে থাকলেও আমি কিছুই বলবো না। পরিষ্কার করে আমাকে সব বলো।

যুলকারনাইনের আশ্বাস ও উপর্যুপরী অনুরোধে রাজিয়া বললো– আমি কতক্ষণ আগে নিজ হাতে মহারাজা রাজ্যপালকে খুন করে এসেছি। কথা ছিল এরপর তোমাকে হত্যা করবো।

কি বলছো এসব? তোমার মাথা ঠিক আছে? তোমার মতো একটি মেয়ে মহারাজাকে খুন করতে পারে? আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আসল কথা আড়াল না করে আমার কাছে প্রকৃত ঘটনা খুলে বলো।

রাজিয়া জানালো, আমি দু'জন হিন্দু মেয়ের সাথে নদীতে গোসল করতে যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে সন্ন্যাসীরূপী এক বয়স্ক সাধুকে দেখতে পাই। তারপর রাজিয়া জানালো, সন্ন্যাসী তাকে দেখে কি ভবিষ্যদ্বাণী করলো এবং ইসলাম গ্রহণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলে তাকে কি করতে হবে। রাজিয়া এও জানালো, হিন্দু মেয়েরা তাকে কি ভাবে রাজ্যপালকে হত্যার জন্যে উদ্বুদ্ধ করলো এবং হত্যাকাণ্ডে যাওয়ার আগে সন্ন্যাসীর দেয়া তুলা ভেজানো পানি পানের কথাও যুলকারনাইনকে জানালো।

রাজিয়া বললো– আমাকে ক্ষমা করে দাও যুলকারনাইন, এই খঞ্জর দিয়ে আমাকে তুমি খুন করে ফেলো। আমি তোমার প্রেমে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম বটে। কিন্তু তোমার ধর্মকে আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি। ধর্ম নয়, আমার হৃদয়ে শুধু তোমার প্রতিই ভালোবাসা ছিল। আমি তোমার শেখানো ইবাদত বন্দেগীর কোনটাই নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারিনি। তুমি আমাকে হিন্দু মেয়েদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলে কিন্তু আমি হিন্দু মেয়েদের সাথে মেলামেশা করে ইসলাম প্রচারের বিপরীতে হিন্দুত্বকেই আরো বেশি আত্মস্থ করেছি। রাজিয়া বললো, সেই শৈশবকাল থেকেই আমাকে বুঝানো হয়েছে, মুসলমানরা পাপী, অপবিত্র, ঘৃণার পাত্র। আমিও মুসলমানদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়েই বড় হয়েছি। কিন্তু তোমার সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে তোমাকে আমি ঘৃণা করতে পারিনি। তবে অন্য মুসলমানদের প্রতি আমার কোনই শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়নি।

হঠাৎ দ্রুত পায়ে উঠে রক্তাক্ত খঞ্জরটি যুলকারনাইনের প্রতি বাড়িয়ে দিয়ে রাজিয়া বললো– এই খঞ্জর দিয়ে তুমি আমাকে খুন করে ফেলো। আমি আর বাঁচতে চাই না। আমি যে পাপ করেছি মৃত্যুই এর উপযুক্ত শাস্তি।

যুলকারনাইন রাজিয়ার হাত থেকে খঞ্জর ছিনিয়ে নিয়ে বললো, তোমাকে মরলে চলবে না, বেঁচে থাকতে হবে। অচিরেই তোমার হৃদয়ও বলবে, মুসলমানরা সত্যিকারে অপবিত্র নয়, পবিত্র। ইসলাম কোন মিথ্যা ধর্ম নয় বরং হিন্দুত্ববাদই মিথ্যা। অনেক কথা বলে অনেক কষ্টে যুলকারনাইন রাজিয়াকে শান্ত করলো।

রাত পোহালে যুলকারনাইন রাজ্যপাল নিহত হওয়ার খবর দিয়ে কন্নৌজের গভর্ণর আব্দুল কাদের সেলজুকীর কাছে দ্রুত পাঠালো এবং রাজিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী দুই হিন্দু মহিলাকে গ্রেফতার করে আনলো। মহিলা দু'জনকে হুমকি ধমকি ও ভয়-ভীতি দেখানোর পর তারা গোবিন্দের কারসাজির কথা প্রকাশ করে দিল। তাৎক্ষণিক গোবিন্দকে পাকড়াও করা হলো।

কিন্তু চক্রান্তের ব্যাপারে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে এর সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করলো এবং বললো— এই দুই মহিলার সাথে কখনো আমার কোন কথা হয়নি। গোবিন্দকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেও যখন যুলকারনাইন তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি বের করতে পারলো না, তখন সে দুটি ঘোড়া আনতে বললো। সহকর্মীরা দু'টি ঘোড়া নিয়ে এলে যুলকারনাইন গোবিন্দের দু'পায়ের গোড়ালীতে রশি বেধে দু'টি ঘোড়ার সাথে বেধে দিল এবং দু'জন অশ্বারোহীকে বললো, দু'টি ঘোড়াকে দু'দিকে তাড়া দাও। ঘোড়া দু'টি দু'দিকে চলা শুরু করলেই গোবিন্দের দু'পা ছিড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। সাথে সাথে সে চিৎকার দিয়ে বললো, আমিই রাজাকে হত্যা করেছি। এরপর ঘোড়াকে থামিয়ে গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কেন এ কাজ করেছো?

গোবিন্দ জানালো, কালাঞ্জর ও গোয়ালিয়রের মহারাজা তাকে বড় অংকের পুরস্কার দানের লোভ দেখায়। সে আরো জানায়, কালাঞ্জর ও গোয়ালিয়রের দুই রাজা মিলে কি পরিকল্পনা করেছে। গোবিন্দ এও জানায়, সে এতো দিন দু'মুখী গোয়েন্দাগিরি করে উভয় পক্ষের কাছ থেকেই সুবিধা লাভ করেছে।

খবর পেয়েই সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকী ঝড়ের বেগে রাড়ীতে পৌছলেন। তিনি এসে ঘটনার আদি অন্ত সব শুনে গোবিন্দকে ছেড়ে দিয়ে

বললেন, তুমি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করো। ছাড়া পেয়ে গোবিন্দ পালানোর জন্য দৌড়াতে লাগল। আবদুল কাদের সেলজুকী তার এক সহকর্মীর কাছ থেকে একটি তীর ও ধনুক নিয়ে দ্রুত তীরটি গোবিন্দকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তীরটি গিয়ে গোবিন্দের পিঠে বিদ্ধ হলো এবং গোবিন্দ আর্ত চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। সেনাপতি সেলজুকী সৈন্যদের বললেন, ওর মরদেহটিকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে শহরের বাইরে ফেলে এসো।

একজন পরাজিত বশ্যতা স্বীকার করে নেয়া রাজার খুন হয়ে যাওয়াটা সুলতান মাহমূদের জন্যে এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যে, দ্রুত তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করতে হবে। আসলে পরাজিত রাজা রাজ্যপালের মৃত্যুর চেয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের হিন্দু রাজাদের চক্রান্তের বিষয়টি ছিল গযনী সুলতান ও গযনী বাহিনীর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে মহারাজা রাজ্যপালের খুনের ব্যাপারটি এবং গোবিন্দের দ্বিমুখী গোয়েন্দাগিরি ও কালাঞ্জর এবং গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজাদের চক্রান্তের খবর দিয়ে একজন দ্রুতগামী দূতকে তখনই সেনাপতি সেলজুকী গযনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়ে দিলেন।

সুলতান মাহমূদ দূতের মুখে এই সংবাদ শুনে সাথে সাথেই সৈন্যদেরকে হিন্দুস্তানে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন।

তিন দিন পর এক ঐতিহাসি লড়াইয়ের জন্যে গযনী বাহিনী হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হলো। আর এদিকে গোয়ালিয়র, কালাঞ্জর ও লাহোরের হিন্দু সৈন্যরা চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল। হিন্দু রাজারা জানতো, রাজ্যপালের খুনের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেলে এবং তিন রাজার মিলিত যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর প্রকাশ হয়ে গেলে সুলতান মাহমূদ ঝড়ের বেগে হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হবেন। আর এটিই হবে তাদের সাথে গযনী বাহিনীর চূড়ান্ত লড়াই।

বিস্ময়কর ঘটনা

নয়শ' সত্তর সালের ঘটনা। সুলতান মাহমূদের শায়খ ও মুর্শিদ শায়খ আবুল হাসান কিরখানী একদিন গযনী সুলতানের উদ্দেশ্যে বললেন—

যে যুগের মুসলমানরা হিন্দু ও ইহুদীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সেই যুগটি হবে মুসলমানদের পতনের যুগ। সেটি হবে ইসলামের কালো যুগ। সে যুগেই আল্লাহর এই যমীন মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হবে।

তোমার শাসিত এলাকায় অমুসলিমরা দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের খেয়াল খুশী মতো শাসনের নামে দুঃশাসন চালাবে। গযনী কান্দাহার কাবুল গার দিজ বিধর্মীদের পায়ের চাপে পিষ্ট হবে। যাদের কাছে ন্যূনতম কোন নীতি নৈতিকতা ও মানবতাবোধ নেই, যারা মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর নির্মম তাদেরকে মুসলমানদের একটি অংশ শুভাকাঙ্ক্ষী ভাবতে শুরু করবে। মাহমূদ! সেদিন তোমার কবর অমুসলিমদের কিছুই করতে পারবে না। বরং তোমার কবরের উপরেও চলবে রক্তের হোলি খেলা। তখন আমাদের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব হবে না। তাই যদি কিছু করতে হয় তবে এখনই করতে হবে।

সুলতান মাহমূদ তার জীবনের সিংহভাগ বাতিলের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে কাটিয়েছেন। অবশেষে এক সময় তার হৃদরোগ দেখা দিল। তিনি চিকিৎসককে কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন, তার এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারটি যেন তার কাছ থেকে কেউ জানতে না পারে। সুলতানকে তার আধ্যাত্মিক গুরু বলেছিলেন, যেহেতু মৃত্যুর পর আমাদের আর করণীয় কিছু থাকবে না, তাই ভবিষ্যত করণীয় কাজটি এখনই করতে হবে। এজন্য সুলতান তার বর্তমানকে ভবিষ্যত রচনার কাজে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তিনি তার আরাম বিসর্জন দিয়ে বিশ্রাম শরীর দেহ মনকে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত বিনির্মাণের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে সেই মরণজয়ী বীরযোদ্ধা ও তার আধ্যাত্মিক গুরুর কবরের চারপাশে আস্তানা গেড়েছে বিদেশী হানাদার বাহিনী। এই হানাদার বাহিনী নিরীহ মুসলমানদের জীবন ও ইজ্জত নিয়ে হায়েনার মতো হিংস্র উন্মত্ততায় মেতে উঠেছে। যাদের কোন নীতি নৈতিকতা নেই, নেই কোন মানবিক বিচারবোধ। অথচ এই দখলকার বাহিনীকেই কথিত মুসলমানরা তাদের ত্রাণকর্তা মেনে নিয়েছে।

কেন? কেন এমনটা হলো? স্বাধীনতা পাগল দীন ও ইসলামের প্রশ্নে আপসহীন এই জাতির আজ কি হলো? কোথায় হারিয়ে গেছে বিশ্বখ্যাত স্বাধীনচেতা মুসলমানদের পরাজয় পরাভব না মানার অমিত তেজ ও সাহস? কেন একদল আফগান সোনালী অতীতকে ভুলে বিলাসিতা ও পার্থিব স্বার্থের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলো? কেন হাজার হাজার প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা আজ ভূলুণ্ঠিত?

আসলে স্বাধীনতার প্রদীপ জাতির রক্ত পুড়িয়ে আলো বিকিরণ করে। সেই রক্ত আজ বিক্রি হয়ে গেছে। তাদের ঈমানী চেতনা আজ মরে গেছে। শহীদানের রক্ত শুষ্ক মাটি শুষে নিয়েছে, আর নিজেদের অদূরদর্শিতা স্বার্থান্ধতা এবং দলবাজীর মূল্য আজ বিশ্বের মুসলিম উম্মাহকে কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করতে হচ্ছে। ইতিহাসের প্রতি আমরা মোটেও সুবিচার করিনি। কল্পিত ইতিহাস সুলতান মাহমূদের প্রতিও চরম অবিচার করেছে। মুসলিম বিদ্বেষী ইসলামের শত্রুদের চরম বিজয় হয়েছে। যারা ছিল পৃথিবীর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ তাদেকেই তারা খুনী, সন্ত্রাসী লুটেরা হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তারা মূর্তি সংহারীকেই মূর্তি পূজারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইসলাম বিদ্বেষীরা ইতিহাসের মুখে ছাই দিয়ে চরম মিথ্যাকে সত্য বলে এবং সত্যকে মিথ্যা বলে প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষাকে মুসলমানরা ভুলে গিয়েছে। আর মুসলিম বিদ্বেষী ইসলামের শত্রুরা এ বিষয়টিও মনে রেখেছে, কোন জনগোষ্ঠীকে তার অবস্থান থেকে নিচে নামাতে হবে এবং তাদের সুউচ্চ মর্যাদার আসন থেকে ভূতলে নিক্ষেপ করতে হবে। ইসলামের শত্রুরা সাফল্যের সাথে কঠোর পরিশ্রমী এবং আড়ম্বরহীন জীবন যাপনকারীদেরকে বিলাসী জীবনে অভ্যস্থ করেছে এবং জাগতিক জীবনকে ভোগবাদ ও বস্তুবাদের আধার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের প্রকৃত ইতিহাস থেকেও বিমুখ রাখার মিশনে দারুণ সাফল্য অর্জন করেছে। অজস্র প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে যে ইতিহাস ইসলামের বীর সৈনিকেরা নির্মাণ করেছিলো, সেই ইতিহাসকে মদের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে। সুন্দর ও স্বচ্ছ আবেগকে পাশবিকতার মোড়কে ঢেকে দিয়েছে। ফলে মুসলমানরা ভুলে গেছে কি ছিল তাদের স্বরূপ এবং কি ছিল তাদের কর্তব্য। তাই মুসলমানরা তাদের আসল গন্তব্য ভুলে গিয়ে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে চলতে শুরু করেছে। ফলে যে মাটি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সঙ্গীরা জয় করেছিল, যে মাটিতে গযনীর বীর সেনানীদের গন্ধ মিশে গিয়েছিল, বীর সেনানীদের রক্ত ও

দেহের সেই গন্ধই তখনকার মুসলমানদেরকে কুফর ও বেঈমান শক্তির বিরুদ্ধে পাহাড়ের মতো দৃঢ়তায় মোকাবেলা করতে সাহস ও শক্তি যোগাতো।

সে জাতিই তার লব্ধ সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, যে জাতি তার শহীদানের রক্তে লেখা ইতিহাস ভুলে না গিয়ে শহীদানের গড়া ইতিহাস মিটে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। সে জাতিই তার ইতিহাসকে রক্ত ও আবেগ দিয়ে জীবন্ত রাখে, পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যকে মুছে যেতে দেয় না। বরং পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যকে উত্তরসূরীদের জন্য আরো স্থায়ী ও সমৃদ্ধ করে তোলে।

সুলতান মাহমূদ বাতিল ও ইসলাম বিদ্বেষীদের জন্যে ছিলেন এক জীবন্ত আতংক। সকল ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, সুলতান মাহমূদ ছিলেন সর্বকালের সেরা যোদ্ধা। তার সময়ে বর্তমান পাকিস্তানের মুলতান অঞ্চল কেরামতী নামের একটি ভ্রান্ত ও শিরক মিশ্রিত অনৈসলামিক গোষ্ঠীর আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। কেরামতীরা ওই অঞ্চলে বিরাট সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তারা সুলতান মাহমূদের জন্যে মারাত্মক বাধা হয়ে দাড়ায়। এই বাতিল জনগোষ্ঠীর শিকড় উপড়ে ফেলার জন্যে সুলতান মাহমূদকে একজন সাধারণ যোদ্ধার মতোই জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কেরামতী বিরোধী লড়াইয়ে সুলতান মাহমূদ এমন কঠিন যুদ্ধ করেছিলেন যে, তার ডান হাত জমাটবাঁধা রক্তের কারণে তরবারীর বাটে আটকে গিয়েছিল। রক্তের পর রক্ত লাগতে লাগতে তা জমাট বেঁধে যায়। সুলতানের মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তরবারীর বাট থেকে আলাদা করতে দীর্ঘ সময় গরম পানি ঢালতে হয়েছিল। দীর্ঘ সময় গরম পানি ঢালার পর জমাট বাধা রক্ত ধুইয়ে গেলে তরবারীর বাটে আটকে যাওয়া সুলতানের হাত আলাদা করা সম্ভব হয়।

আজো ইসলামের নামে কুফরী শক্তি মুসলিম বিশ্বকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। বিভ্রান্ত মুসলমানরা ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের ক্রীড়নক হয়ে সত্যিকার মুসলমানদের বিনাস সাধনে লিপ্ত। সুলতান মাহমূদের কবর আজ খ্রিস্টান, ইহুদী শক্তির ট্যাংক বোমারু বিমানের ছোড়া হাজারো বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত।

দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয়, তৎকালীন ভারতে অসংখ্যবার অভিযান পরিচালনাকারী বীর মুজাহিদ সুলতান মাহমূদের অভিযানকে মাত্র সতেরোটি অভিযানে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাঁর বিশাল কৃতিত্বকে মুছে ফেলা হয়েছে। বস্তুত একজন খাঁটি সৈনিকের কৃতিত্বকে খাটো করে দেখানোর জন্যেই ইতিহাসের নামে এসব গল্প ফাঁদা হয়েছে। যেগুলোর সাথে বাস্তবতার কোন মিল

নেই। আমাদের কর্তব্য, এই ক্ষণজন্মা বীর যোদ্ধার প্রতিটি পদক্ষেপকে বর্তমান প্রজন্মের সামনে সঠিক ভাবে তোলে ধরা। তাহলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম বুঝতে পারবে, কতোটা বৈরী পরিবেশ ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ এই মর্দে মুজাহিদ ইসলামের জন্য কি বিশাল অবদান রেখে গেছেন। যা কেয়ামত পর্যন্ত যে কোন মুসলমানের জন্যে অনুপ্রেরণার উৎস।

১০২০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৪১২ হিজরী সনের বসন্তকালের শুরুর দিকে গযনী থেকে সুলতান মাহমূদের বাহিনী বন্যার মতো ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। গযনীর সেনা বাহিনীর গতি ক্ষিপ্র ছিল বটে। কিন্তু তাদের জনবল এতোটা ছিল না, যে পরিমাণ জনশক্তি নিয়ে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে কালাঞ্জর গোয়ালিয়র ও লাহোরের সম্মিলিত বাহিনী একত্রিত হয়েছিল। দৃশ্যত এই তিন রাজ্যের সেনা সংখ্যা ছিল গযনী বাহিনীর চেয়ে তিনগুণ বেশী।

সকল ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত, তিন রাজার সেনাদের মধ্যে এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছিল পদাতিক সৈন্য, ছত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং ছয়শ চল্লিশটি ছিল জঙ্গি হাতি। সেই সময়কার ঐতিহাসিক ফারখী লিখেছেন, কালার, গোয়ালিয়র ও লাহোরের সম্মিলিত সৈন্যদের মধ্যে এক লাখ বত্রিশ হাজার ছিল পদাতিক সৈন্য, ছয়ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং নয়শ জঙ্গি হাতি।

উল্লেখিত সংখ্যার যে কোন একটিকে সঠিক মনে করলেও একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, গযনী থেকে এবার সুলতান মাহমূদ যে সৈন্য নিয়ে ভারতের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন তাদের সংখ্যা উল্লেখিত সংখ্যার চেয়ে অর্ধেকেরও কম ছিল।

সৈন্য সংখ্যা কম ছাড়াও সুলতান মাহমূদের জন্যে সবচেয়ে বেশী অসুবিধা ছিলো, এবার তিনি এমন এক জায়গায় মোকাবেলার জন্যে রওয়ানা হয়েছিলেন, যে জায়গাটি ছিল চতুর্দিক থেকে হিন্দুবেষ্টিত। এখানকার পরিবেশ, মাটি মানুষ সবই ছিল তার প্রতিকূলে।

কন্নৌজের রাজা রাজ্যপালের নিহত হওয়া এবং তিন রাজার ষড়যন্ত্রের কথা শুনে সুলতান মাহমূদ তার সেনাদের অভিযানের নির্দেশ দিয়ে দেন। অবশ্য গযনী সেনাদের জন্যে হিন্দুস্তানের একজন পরাজিত রাজার মৃত্যু তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। কিন্তু রাজা রাজ্যপাল গযনী সুলতানের অনুগত এবং মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ থাকার কারণে ব্যাপারটির রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। তার চক্রান্তমূলক হত্যার ব্যাপারটি ছিল সুলতান মাহমূদের জন্যে একটি পরিষ্কার বার্তা। যে বার্তা চোখে আঙুল দিয়ে বলে দিচ্ছিল, হিন্দুরা এবার সুলতান মাহমূদকে চ্যালেঞ্জ করার

জন্যে শক্তি সঞ্চয় করেছে। কন্নৌজে নিয়োজিত আব্দুল কাদের সেলজুকী তার পাঠানো সংবাদে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন যে, হিন্দুস্তানের হিন্দু রাজা মহারাজারা একত্রিত হয়ে গযনীর বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

শায়খ আবুল হাসান কিরখানী ছাড়াও আবু সাঈদ আব্দুল মালেক নামের আরেকজন বিদগ্ধ আলেমেরও ভক্ত ছিলেন সুলতান মাহমূদ। তিনি গযনী থেকে অনেক দূরে বসবাস করতেন। সুলতান মাহমূদ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্যে কয়েকবার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তাঁর কাছে গেছেন।

এবার সুলতান যখন হিন্দুস্তানে যাত্রা করলেন, যাত্রার দ্বিতীয় দিন অগ্রবর্তী বাহিনী থেকে এক কমান্ডার উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকিয়ে সুলতানের কাছে এসে জানালো— আবু সাঈদ আব্দুল মালেক নামের একজন আলেম ও বুযুর্গ আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যে পথিমধ্যে অপেক্ষা করছেন। এ খবর পেয়ে সুলতান তখনই ঘোড়ায় চড়ে আবু সাঈদের কাছে পৌছলেন এবং ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর কপালে চুমু দিয়ে মোসাফাহা করলেন।

গতকাল আমি জানতে পেরেছি আপনি হিন্দুস্তান যাচ্ছেন— বললেন আবু সাঈদ আব্দুল মালেক। দু'আ করছি আল্লাহ্ এ সফরে আপনাকে সাফল্য দান করুন। এখন আপনাকে আমি কিছু বলবো না। শুধু এতটুকু বলতে চাই, আপনি ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছেন। আপনার এই অভিযান আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য উজ্জ্বল অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই যুদ্ধকে আপনি ব্যক্তিগত যুদ্ধে পরিণত করবেন না। মনে রাখবেন, রাজত্ব ও বাদশাহী এককভাবে আল্লাহ্ তাআলার। ক্ষমতা ও রাজত্বের নেশা মন থেকে বের করে দিন।

ক্ষমতা ও রাজত্বের নেশা এমন ভয়ংকর যে, এই নেশা যদি কাউকে পেয়ে বসে তাহলে সে দীন ধর্ম সবই ভুলে যায়। ক্ষমতালোভী শাসকরা একথাও ভুলে যায় মুহূর্তের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটতে পারে। তাদের কানে মজলুম আর্তের আর্তনাদ পৌছে না। তাদের চোখ অন্ধ হয়ে যায়। প্রজাদের দুর্ভোগ দুর্দশা তাদের চোখে পড়ে না। ক্ষমতা পিপাসু শাসকেরা তাই দেখে এবং তাই শুনে যা তাদের তোষামোদকারী দরবারী মোসাহেবরা দেখায় এবং শোনায়। মোসাহেব ও তোষামোদকারীরা তাই শোনায় যার মধ্যে তাদের স্বার্থ জড়িত থাকে। সুলতান মাহমূদ মাথা নত করে আবু সাঈদ আব্দুল মালেকের কথা শুনছিলেন।

আবু সাঈদ আরো বললেন, আমি বেশী সময় আপনাকে আটকে রাখবো না সুলতান! আপনি কখনো ভুলে যাবেন না, দুনিয়ার সকল বেঈমানদের দৃষ্টি

আপনার উপর। কুফরী শক্তি আপনার মৃত্যুর জন্যে প্রহর গুনছে। আপনার মুসলমান প্রতিবেশীরাও আপনার মৃত্যু কামনা করে। এজন্য আপনার এমন প্রতিজ্ঞা করা উচিত, আপনি মরে গিয়েও যাতে অমর থাকেন। আপনি আপনার কাজ কর্মে অনুকরণীয় আদর্শ রচনা করে মানুষের হৃদয়ে জীবিত থাকবেন। আপনার এমন কাজ করতে হবে যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম আপনার আদর্শিক পথে চলে আপনাকে জীবন্ত রাখে। আপনি যদি হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকদের মাথা গুড়িয়ে দিতে না পারেন, তবে এরা যতো দিন পর্যন্ত হিন্দুস্তানে একজন মুসলমান জীবিত থাকবে ততো দিন পর্যন্ত মুসলিম নির্যাতন অব্যাহত রাখবে।

দুআ করুন হযরত! আল্লাহ্ তাআলা যেন আপনাদের প্রত্যাশা পূরণে আমাকে সফলকাম করেন— বললেন সুলতান মাহমূদ। এবার আমি সফল হলে হিন্দুস্তানে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবো। সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক সেনাবাহিনীকেও রেখে আসবো।

আল বিদা মাহমূদ! দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুলতানকে বিদায় জানিয়ে বললেন আবু সাঈদ। আপনার সাফল্যের জন্যে আমরা কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করছি। দুআ করি আল্লাহ যেনো আপনার সঙ্গে থাকেন এবং আপনাকে সাহায্য করেন।

সুলতান মাহমূদ আবু সাঈদের হাতে চুমু খেয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলেন।

সুলতান মাহমূদ জানেন, তার অগ্র-পশ্চাৎ ডানে বামে চতুর্দিকে শত্রু। তার সামনে দৃশ্যমান হিন্দু শত্রু আর পেছনে অদৃশ্য মুসলিম শত্রু। কিন্তু তার জানা ছিল না এবার প্রাণঘাতি শত্রু তার সফর সঙ্গী হয়ে তার কাফেলায় মিশে গেছে এবং তার সাথেই যাচ্ছে।

সুলতান মাহমূদ কয়েকজন সেলজুকীকে তার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার কারণে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে ছিলেন। কারণ বংশানুক্রমে সেলজুকীরা ছিল লড়াকু। সেলজুকীরা ছিল বুখারার পাহাড়ী এলাকার অধিবাসী। সেলজুকীরা তুর্কি ও সামানীদের লড়াইয়ে সামানীদের পক্ষাবলম্বন করেছিল। অন্যভাবে বলা চলে, সামানীরা সেলজুকীদের উস্কানিতেই লড়াই করেছিল। এর পর থেকে সেলজুকীরা একটি সামরিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়।

সেলজুকী সরদার লুকমান সেলজুকীর ছেলে ইসরাঈল সেলজুকী বুখারা শাসকদের কাছে যথেষ্ট মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিল। বুখারার শাসক আলাফতোগীনের খুবই প্রিয় পাত্রে পরিণত হয় ইসরাঈল সেলজুকী। তাদের

মধ্যে গড়ে উঠে গভীর হৃদ্যতা। সুলতান মাহমূদ যখন এই কুচক্রীদের দমন করার জন্যে বুখারা আক্রমণ করেন তখন এরা উভয়েই পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

অপর দিকে পূর্ব তুর্কিস্তানের এলিকখান ছিল একটি শক্তিশালী রাজ্যের শাসক। সে সব সময় কাউকে না কাউকে সাথে নিয়ে সুলতান মাহমূদের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকতো। কিন্তু যতো বার এলিকখান সুলতান মাহমূদের মুখোমুখী হয়েছে ততোবারই মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হয়েছে।

সর্বশেষ পরাজয়ের পর এলিকখান যখন তার পরিবার পরিজন নিয়ে পাহাড়ী এলাকায় আত্মগোপন করেছিল তখন ইসরাঈল সেলজুকী এলিকখানের সাথে সাক্ষাত করতে গেল। সর্বশেষ লড়াইয়ে ইসরাঈল সেলজুকীর নেতৃত্বাধীন সেলজুকী উপজাতিরাও এলিকখানের সহযোগী ছিল না।

এলিকখান সবুজ ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত পাহাড়ী এলাকায় তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিল। ইসরাঈল সেলজুকী তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে পৌছে গেল। এলিকখানের তাঁবুতে সুন্দরী নারীও ছিল। নর্তকী ও গায়িকাও ছিল তার সাথে। রাজ প্রাসাদের বিলাসবহুল সব ধরনের আসবাব পত্র ছিল এলিকখানের তাঁবুতে। ইসরাঈল সেলজুকী যখন সেখানে উপস্থিত হলো, তখন এলিকখান তার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। এলিকখানের তাঁবুটি ছিল ছোটখাটো একটা রাজ প্রাসাদের মতো।

এলিকখান পূর্ব থেকেই ইসরাঈল সেলজুকীকে চিনতেন। ইসরাঈল সেলজুকী একজন আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী তাগড়া যুবক। অত্যন্ত মোহনীয় দেহ সৌন্দর্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ববান তরুণ। ইসরাঈল সেলজুকী ছিল তার গোত্রের সর্দার। তখন সেলজুকী গোত্র ছিল একটি আলোচিত সামরিক শক্তি।

এখন আমার কাছে কেন এসেছো ইসরাঈল? ইসরাঈল সেলজুকীকে জিজ্ঞেস করলেন এলিকখান।

রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা নেতাদের অবস্থা নিজ চোখে দেখতে এসেছি। তারা কেমন থাকে– কিছুটা তীর্যক ভাষায় জবাব দিলো ইসরাঈল।

আপনার হয়তো এজন্য আমার প্রতি ক্ষোভ আছে, আমি আপনার কোন উপকার করিনি, তাই না? আমিও কিন্তু একথা বলতে পারি, আপনিও আমার কাছে কোন ধরনের সহযোগিত চাননি। আপনি কি নিজেকে এতোটাই শক্তিশালী ভেবে বসেছিলেন যে, আমার সহযোগিতা ছাড়াই আপনি গযনীর মাহমূদকে পরাজিত করতে পারবেন?

আমার বলার প্রয়োজন হবে কেন? তোমার তো নিজ উদ্যোগেই আমার সহযোগিতায় এগিয়ে আসা উচিত ছিল— বললেন এলিকখান।

আসলে ব্যাপারটিতো আপনি এখন যে ভাবে বলছেন তেমন ছিল না। আপনি হয়তো তখন চেয়েছিলেন আমার সহযোগিতা ছাড়াই আপনি সুলতান মাহমূদকে পরাজিত করে গযনী ও বুখারার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাবেন। অথচ সামানীরা আমার সহযোগিতা ছাড়া কখনো তুর্কিদের পরাজিত করতে পারেনি। সেলজুকীরা যখন সামানীদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে তখন সামানীদের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে গেছে। সেই যে তুর্কিরা সেলজুকীদের হাতে মার খেয়েছিল আজ পর্যন্ত সেলজুকীদের নাম শুনলে তুর্কিদের ভয়ে শরীর কাঁপে।

তুমি কি আমাকে পরাজয়ের জন্য তিরস্কার করতে এসেছো? তুমি কি আমাকে দেখতে এসেছো আমি এই পরাজয়ের পর কতোটা দুর্বল হয়ে পড়েছি? বললেন এলিকখান।

না, না, এলিকখান! এতটুকু পরাজয়ে আপনি এতোটা হীনমন্যতার শিকার হবেন না যে, দোস্ত-দুশমনের ভেদাভেদ গুলিয়ে যাবে। মনে রাখবেন, আমাদের শত্রু অভিন্ন। গযনীর মাহমূদ উভয়ের শত্রু। আপনি একাকি ওকে পরাজিত করতে পারবেন না। ইচ্ছা করলে সেলজুকীরাই তাকে পরাজিত করতে পারে। আমি এখন আপনার সাথে এজন্য সাক্ষাত করতে এসেছি মাহমূদের বিরুদ্ধে আপনি আমাদের কতটুকু সহযোগিতা করতে পারেন। আপনি কি আমাদের সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারবেন?

আপনি সহযোগিতা না করলেও আমি মাহমূদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। আলাফতোগীন আছে আমার সঙ্গে।

মাথা ঠিক করে কথা বলো ইসরাঈল– কিছুটা তাচ্ছিল্যমাখা কণ্ঠে বললেন এলিকখান। এ পর্যন্ত তোমাদের ইতিহাস হলো অন্যদের তোমরা সহযোগিতা করেছো, এবং সহযোগী হিসেবেই লড়াই করেছো। মূল শক্তি হিসেবে লড়াই করোনি। তোমরা মাহমূদের সৈন্যদের সাথে কখনো মুখোমুখি লড়াই করোনি। মাহমূদ জঙ্গি চালে তার চেয়ে তিনগুণ বেশী শক্তিশালী বাহিনীকেও পরাজিত করতে সক্ষম। তার সৈন্যরা কঠিন সংকটেও কখনো বেসামাল হয় না। দীর্ঘ প্রশিক্ষিত ঘোড়ার মতোই আমৃত্যু লড়াই করে। ওরা সামান্য ইঙ্গিতেই বিদ্যুতের গতিতে জায়গা বদল করে কিন্তু আমাদের সৈন্যদের এই গুণ নেই।

এলিকখান! আমি বুঝতে পারছি এবারের পরাজয়ের ক্ষত আপনার রগরেশায় ঢুকে পড়েছে। আতংক ভর করেছে আপনার মনে। মনে হচ্ছে আপনার

কাছে সহযোগিতা প্রত্যাশা করাই উচিত হবে না। যদি খান সর্দারের মনেই এমন আতংক বাসা বেঁধে থাকে তবে খানদের সৈন্যরা তো ভয়ে কম্পমান।

জেনে রাখুন এলিকখান! আমি মাহমূদের বিরুদ্ধে লড়াই করবোই। ওকে আমি আর বাড়তে দেবো না। হিন্দুস্তানের ধন-দৌলত ওকে বিরাট শক্তিশালী করে দিচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে সমরকন্দ বুখারা বলখ তুর্কিস্তান খাওয়ারিজম সবই এক সময় তার দৌলতের গোলামী করতে শুরু করবে। আর অপরাধীর মতো দুর্গম পাহাড়ে আমাদেরকে লুকিয়ে থাকতে হবে।

আমি তো শুনেছি, তোমার সেলজুকী গোত্রের কিছু লোক মাহমূদের সেনা বাহিনীতেও নাকি ঢুকেছে? বললেন এলিকখান।

হ্যা, কয়েকজন সেলজুকীকে ধনসম্পদের লোভ দেখিয়ে কিনতে সক্ষম হয়েছে মাহমূদ। এখন তো তার বাহিনীতে একজন সেনাপতিও সেলজুকী। আব্দুল কাদের নামের এই সেলজুকী শুধু সেনাপতি নয়, হিন্দুস্তানের শাসকও বটে।

তুমি স্বগোত্রের এই লোকগুলোকে নিজ গোত্রে ফিরিয়ে আনতে পারবে না?

আরে, একথা না বলে বলুন যে, তুমি এই সেলজুকীদের হাতে মাহমূদকে হত্যা করতে পারো না? আরে খান! লড়াই শুধু রণাঙ্গনেই হয় না, দেয়ালের আড়ালের লড়াই আরো বেশী শক্ত। আমি মাহমূদকে তার সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকীর হাতেই মারার আয়োজন করেছি। কিন্তু এর আগে একবার আমি তার সাথে ময়দানের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে চাই। যদি পরাজিত হই তাহলে মাহমূদকে হত্যা করার জন্যে সেলজুকী সৈন্যদের ব্যবহার করবো— বললো ইসরাঈল সেলজুকী।

শরাবের পেয়ালা একের পর এক গলদকরণ করছে দুই সর্দার। এলিকখানের সুন্দরী রক্ষিতা দু'জন শরাবের পেয়ালা ভরে দিচ্ছে। এলিকখানের ডানে বামে আরো তিন চারজন রূপসী বসা। ইসরাঈল সেলজুকী এই সুন্দরীদের মতো এতোটা রূপ জৌলুসের অধিকারী না হলেও সুঠাম শক্তিশালী টববগে যৌবনের অধিকারী একজন আকর্ষণীয় যুবক। শরাবের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সে বললো— আমি স্বপ্নে জাগরণে সব সময় নিজেকে গযনীর শাহী কুরসীতে আসীন দেখতে পাই।

ঠিক আছে, দেখা যাবে গযনীর তখতে কে বসে? তুমি ক'দিন আমার এখানে আতিথ্য গ্রহণ করো। মেহমান হিসেবে কয়েক দিন তার এখানে থাকার জন্যে ইসরাঈলকে আমন্ত্রণ জানালেন এলিকখান।

চাঁদনী রাতে রকমারী বুনো ফুলের মনোমুগ্ধকর গন্ধে আনমনে পায়চারী করছিল ইসরাঈল। হাটতে হাটতে সে তার জন্যে নির্ধারিত তাঁবু থেকে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল। এক সময় ইসরাঈল অনুভব করলো, সে একাকী নয়, তার পেছনে কেউ না কেউ আছে।

অতি সন্তর্পণে সে তার খঞ্জরের উপর হাত রেখে আঁড় চোখে এপাশ ওপাশ দেখতে চেষ্টা করলো। সে অনুভব করলো, একটি ছায়ামূর্তি গাছগাছালির ভেতর থেকে এগিয়ে আসছে। তার মনে হলো, ছায়া মূর্তিটি কোন পুরুষের নয়। ইসরাঈল নিঃশংক গলায় জিজ্ঞেস করলো, কে তুমি?

আমি মারয়াম! এগিয়ে এসে বললো এক নারী মূর্তি।

ভয় পাওয়ার কিছু নেই! আমি এলিকখানের ভাতিজী মারয়াম। ইসরাঈল গভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে বললো— আমার তো মনে হয় গতকাল এলিকখানের পাশে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে তুমিও ছিলে। তো এখানে কেন এসেছো?

এটা কি জিজ্ঞেস করার কোন বিষয় হলো? বললো মারয়াম। ভুল বোঝার আগেই আমি আপনার ভুল ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে বলছি— আপনার সুঠাম দেহ আর সর্দারীর মোহে আমি আপনার কাছে আসিনি। আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি সূলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে আপনার সংকল্পে মুগ্ধ হয়ে আপনাকে মোবারকবাদ জানাতে এবং উৎসাহিত করতে। দেখুন, আমি একজন কুমারী মেয়ে। তা ছাড়া আমি খানদের আভিজাত্যের অংশ। কিন্তু খানদের আভিজাত্য মান-মর্যাদা সবই এখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চাচা এলিকখান এবারের পরাজয়ের পর মনোবল হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু আমার আত্মমর্যাদাবোধ চাচার এই মনোবল হারানোকে মেনে নিতে পারছে না।

আচ্ছা? গযনীর মাহমূদ কি কোন জিন-ভূত না দৈত্য দানব? যে ব্যক্তি এই মাহমূদকে পরাজিত করে এমন পাহাড়ে পাহাড়ে লুকিয়ে বেড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারবে তার জন্যে আমার সব কিছু কুরবান করে দিতে প্রস্তুত আমি। আমি দেখেছি, আপনার মধ্যে সেই সংকল্প আছে। এজন্য আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে।

আচ্ছা, তাই নাকি? মাহমূদের সাথে শাহজাদীর দুশমনি কেন?

কেন নয়? ইসরাঈল সেলজুকীর সাথে মাহমূদের কি নিয়ে দুশমনী? আপনার সাথে যে কারণে মাহমূদের শত্রুতা, আমার সাথেও এ কারণেই মাহমূদের শত্রুতা।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। এসো এসো, আমরা এক জায়গায় বসে কথা বলি। আসলে শত্রু শত্রুই। কেন শত্রুতা, কেন দুশমনি, এসব বিষয় শত্রুকে পরাজিত করার পরই কেবল আলোচিত হতে পারে।

মারয়াম! তুমি অল্প বয়সী কুমারী তরুণী বটে কিন্তু তোমার চিন্তা ভাবনা আনাড়ী নয়, তুমি তো বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতো কথা বলছো। এতো বিদ্যা বুদ্ধি তুমি কোথায় পেলে?

আরে, প্রয়োজনেই মানুষ বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। আমিও প্রয়োজনের তাকিদেই এমনটা হয়ে উঠেছি।

এরপর তারা দু'জন একটি বড় গাছের নীচে বসে কথা বলতে শুরু করলো। দীর্ঘক্ষণ নানা বিষয়ে কথা বলার পর পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল। এক পর্যায়ে ইসরাঈল মারয়ামকে বললো—

এলিকখানের সাথে কি তোমার ব্যাপারে কথা বলবো?

তোমার মন চাইলে বলো, আমার কোন সমস্যা নেই। তিনি সম্মত না হলেও আমি তোমার কাছে চলে আসবো। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। আমি আমার ভবিষ্যত তোমার সাথেই বেঁধে ফেলেছি ইসরাঈল! বহুদিন ধরে আমি তোমার মতো দৃঢ়চেতা একজন বীর পুরুষের খোঁজ করছিলাম। আমার স্বপ্নগুলো যার মাধ্যমে বাস্তব রূপ দেয়া সম্ভব। সুলতান মাহমূদকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্যে তুমি আমাকে যে ভাবে ইচ্ছা কাজে লাগাতে পারো, আমাকে সব সময় প্রস্তুত পাবে।

ইসরাঈল এলিকখানের সান্নিধ্যে তিন রাত থাকলো। তিন রাতেই মারয়াম অতি সংগোপনে ইসরাঈলের সাথে সাক্ষাত করলো। শেষ রাতে তারই এক সমবয়সী তরুণী আম্বরীকে মারয়াম ইসরাঈলের সাথে সাক্ষাতের সময় সঙ্গে নিয়ে এলো। মারয়াম যখন ইসরাঈলের সাথে কথা বলতে গেলো, তখন আম্বরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরের দিন ইসরাঈল সেলজুকী চলে গেল।

ইসরাঈল চলে যাওয়ার পর আম্বরী মারয়ামকে বললো— তোমার পছন্দ ঠিকই আছে মারয়াম! ইসরাঈলই তোমার জন্যে যোগ্য ব্যক্তি। এমন পুরুষই তোমার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু একটা কথা মারয়াম! ইসরাঈলকে বিয়ে করে তুমি সুলতান মাহমূদের সাথে শত্রুত তৈরী করছো। অথচ চাচা এলিকখান বলেছেন, তিনি প্রয়োজনে মাহমূদের খান্দানে মেয়ে বিয়ে দিয়ে হলেও তার সাথে মৈত্রী গড়ে তুলবেন। তুমি কি একথা শোননি?

আরে, রাখো এসব কথা। এসব কথাই তো প্রমাণ করে তিনি জীবনের জন্যে হার মেনে নিয়েছেন। এগুলো তার পরাজয়ের পরিণতি। চাচা সুলতান মাহমূদকে এতোটাই ভয় পাচ্ছেন যে, নিজ খান্দানের মেয়ে দিয়ে হলেও তার সঙ্গে আপস করতে চান। কিন্তু ইসরাঈল সেলজুকী আপসহীন। সে কোন অবস্থাতেই মাহমূদের সাথে মৈত্রী করবে না। বললো মারয়াম—

মৈত্রী হয়তো করার সুযোগই পাবে না, পরাজিত হয়ে দৌড়ে পালাবে। কিছুটা তীর্যক কণ্ঠে মারয়ামের উদ্দেশে বললো আম্বরী। দেখবে ইসরাঈলেরও সেই একই পরিণতি হবে যা এলিকখানের হয়েছে। যে পরিণতি কাদের খানের হয়েছে, খাওয়ারিজম শাহীর হয়েছে, কারামতীদের হয়েছে। তোমার সেলজুকী বাহাদুরেরও একই পরিণতি বরণ করতে হবে মারয়াম!

আরে দেখে নিয়ো, ইসরাঈল সবার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে। কিছুটা গর্বিত কণ্ঠে বললো মারয়াম। আম্বরী! তুমি এমন ভাবে কথা বলছো, যাতে গযনী শাসকদের গোলামী ও পরাজয়ের গন্ধ আসে।

আরে শাহজাদী! তুমি আমার কথায় গযনী শাসকদের গোলামী আবিষ্কার করছো কেন, এটা ইসলামের গোলামী বলো। দেখো, তোমরা এই পার্থিব দুনিয়ার কথা বলো, আর আমি সেই দুনিয়ার কথা বলি, মৃত্যুর পর যে দুনিয়াতে আমাদের সবাইকে যেতে হবে। দেখো, মুসলিম শাসকরা পরস্পর লড়াই করে কি পেয়েছে? আসলে তো সেই সম্ভাবনাময় শক্তিকেই বিনষ্ট করছে যে শক্তি ইসলামে শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যয় করার কথা ছিল। খান আর সেলজুকীরা মিলিত হয়ে যদি সুলতান মাহমূদকে পরাজিতও করে তবুও প্রকৃত জয় খান আর সেলজুকীদের হবে না, শক্তিশালী হবে ইসলামের বিরোধী শক্তি।

হেসে ফেললো মারয়াম, তার হাসিতে বিদ্রূপ। সে বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললো— তোমার মুখে সব সময় ইসলাম ইসলাম। ইসলামের কথা বলতে বলতে তুমি মারা যাবে আম্বরী! তুমি বিশ্বাস করো, একদিন না একদিন আমি গযনী সিংহাসনের রাণী হবো। আর তুমি হবে কোন বুড়ো সেনাপতির বিবি। অবশ্য আমি সেটা হতে দেবো না। তোমাকে আমি তোমার মতোই সুন্দর সুপুরুষ কোন যুবকের সাথে বিয়ে দেবো। সে হবে এমন যুবক যার থাকবে অঢেল সম্পদ আর ক্ষমতা।

আর ইসরাঈল সেলজুকী হবে গযনীর বাদশা। তাই না? তীর্যক কণ্ঠে বললো আম্বরী।

হ্যাঁ আম্বরী! সে তো এখনো বাদশা। তবুও তার সেই সিংহাসন চাই যে সিংহাসনে সুলতান মাহমূদ বসে।

তুমি জেগে জেগে দিবা স্বপ্ন দেখছো মারয়াম!

তুমি হয়তো ঠিকই বলছো আম্বরী! আসলেও আমি স্বপ্নময় ঘোরের মধ্যে আছি। ইসরাঈলকে আমার স্বপ্নগুলোর বাস্তব রূপকার মনে হচ্ছে। জানো, সেই ছোট্ট বেলা থেকেই আমি রানী হওয়ার স্বপ্ন দেখি। রাণী আমাকে হতেই হবে। মাথার উপর রাণীর মুকুট রাখার জন্যে আমি যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি।

* * *

তিন দিন এলিকখানের আতিথ্য গ্রহণ করার পর ফিরে যাওয়ার সময় মারয়ামকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল ইসরাঈল সেলজুকী।

ইসরাঈলের কথা শুনে এলিক খান বললো— ঠিক আছে ইসরাঈল! মারয়াম তোমাকে পছন্দ করেছে এ খবর আমার অজানা নয়! মারয়ামের বাবাও তোমার কাছে তার মেয়েকে তোলে দেয়ার ব্যাপারে আমাকে অনুমিত দিয়েছে। কিন্তু ইসরাঈল! তোমাকে এই অঙ্গীকার করতে হবে, সুলতান মাহমূদকে পরাজিত করে আমার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তুমি সব ধরনের ঝুঁকি নিতে এবং ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে।

বয়সের কারণে আর বন্ধুরা আমার সাথে বেঈমানী করার কারণে আমার পক্ষে মাহমূদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব হয়নি। এক পর্যায়ে তো আমি একথাও চিন্তা করেছিলাম, মাহমূদের সাথে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক করে বাকী জীবনটা নির্বিবাদে আরামে কাটানোর ব্যবস্থা করবো। কিন্তু শেষ জীবনে তুমি আমার কাছে আশার আলো হয়ে এসেছো। ইচ্ছা করলে তুমি আমার শেষ জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারো। আমাকে নতুন জীবন দান করতে পারো।

মারয়াম আমার খুব প্রিয়। ছোট্ট বেলা থেকেই সে বলে আসছে সে হবে রাজরাণী। আশা করি তুমি তার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে পারবে।

আপনার প্রত্যাশা আর মারয়ামের রাণী হওয়ার স্বপ্ন আমি পূর্ণ করবো— বললো ইসরাঈল সেলজুকী। এখন পর্যন্ত আমি কখনো মাহমূদের মুখোমুখি হইনি। প্রথমবার তার মুখোমুখি হয়ে যদি সুবিধা করতে না পারি তবে পিছিয়ে আসবো। দ্বিতীয় বারেও যদি আমি তাকে পরাজিত করতে না পারি তাহলে অন্য কৌশল অবলম্বন করবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! আপনার জীবদ্দশাই মাহমূদের পতন ঘটবে। আমার হাতেই তার পতন ঘটবে।

ইসরাঈল সেলজুকী দুঃসাহসী চাতুর্যপূর্ণ কিছু কথাবার্তা বলে এলিকখানের মন থেকে পরাজয়ের আতংক দূর করে দিল এবং মারয়ামকে তখনই বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলো।

* * *

এদিকে নিজ কবিলায় ফিরে আসার আগেই সেলজুকী গোত্রের লোকেরা খবর পেয়ে গেল গোত্র সর্দার ইসরাঈল সেলজুকী নতুন বউ নিয়ে আসছে। আর এই বউ কোন সাধারণ কবিলার মেয়ে নয়, অভিজাত খান শাসক গোষ্ঠী এলিকখানের আপন ভাতিজী।

এলিকখান যদিও পরাজিত ও বিপথগামী এক সরদার ছিল, কিন্তু সেই সময় সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটাও বিরাট সম্মানের বিষয় ছিল। কারণ, সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া সাধারণ ব্যাপার ছিল না। কোন বীরপুরুষের পক্ষেই এমন দুঃসাহসিক উদ্যোগ নেয়া সম্ভব ছিল। এ জন্য তদঞ্চলে এলিকখানকেও একজন সাহসী যোদ্ধা হিসেবে সম্মানের চোখে দেখা হতো।

এদিকে পাহাড়ী এলাকায় সেলজুকীরা গোত্রপতির বিয়ের খবর শুনে গোত্রের সকল লোক একত্রিত হলো। সারি সারি ছাগল, বকরী, উট জবাই হলো। জবাইকৃত পশুর রক্তে নদী বয়ে গেল। রাতভর চললো আমোদ ফূর্তি ও খানাপিনা।

পানাহার ও আমোদ ফূর্তির পর মারয়ামকে সাথে নিয়ে ইসরাঈল একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে গোত্রের লোকদের বললো— হে সেলজুকী সম্প্রদায়ের লোকেরা! শোন, আজ আমি তোমাদের সামনে এমন এক মহান শাহজাদীকে হাজির করেছি, যে সুলতান মাহমূদের রাজ প্রাসাদের প্রতিটি ইট খোলে ফেলার অঙ্গীকার করেছে। শাহজাদী মারয়ামকে তোমরা যেমন রূপের অধিকারী দেখছো, সে ততোটাই গুণ ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারীনী। সেলজুকী সিংহরা! গযনীর প্রাসাদ থেকে প্রতিটি ইট খোলে ফেলার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে থাক?

একথা শোনে সেলজুকী গোত্রের লোকেরা শ্লোগানের শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললো।

ইসরাঈল সেলজুকীদের উসকে দেয়ার জন্যে বললো— হিন্দুস্তানের লুণ্ঠনকারী আজও সেলজুকী সিংহদের রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে। আজ তোমরা প্রতিজ্ঞা করো, মাহমূদকে চির নিদ্রায় না পাঠিয়ে তোমরা আর বিছানায় পিঠ লাগাবে না। এখন আমাদের গন্তব্য হবে গযনী।

হে সেলজুকী সিংহরা! ভুলে যেয়ো না তোমাদের কোন ভূখণ্ড নেই। দুনিয়াতে এমন জায়গা নেই, যেটিকে সেলজুকীরা নিজের দেশ বলতে পারে। আমরা জংলী জীব জন্তুর মতো পাহাড়ে জঙ্গলে যাযাবরের মতো বসবাস করছি। অথচ অস্ত্র ও জনবলের দিক থেকে আমরা মোটেও দুর্বল নই। আমরা একটি শক্তি! আমাদের একটা জনগোষ্ঠী আছে। আমাদের আছে প্রচুর সংখ্যক সাহসী যোদ্ধা। আমাদের শক্তিকে অন্যেরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে। ইতোমধ্যে আমাদের জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে। কয়েকজন সেলজুকী গযনীর সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

সুলতান মাহমূদ তাদেরকে হিন্দুস্তানের লুট করা সম্পদের লোভ দেখিয়ে কিনে নিয়েছে। মাহমূদ ইসলামের নামে সবাইকে ধোঁকা দিচ্ছে। অথচ ইসলামের প্রকৃত প্রহরী আমরা। তবে আমরা আগে সেলজুকী, তারপর মুসলমান। মাহমূদ ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন। সে নিজেকে মূর্তি সংহারী বলে প্রচার করে। অথচ বাস্তবে সে নিজেকেই জীবন্ত মূর্তিতে পরিণত করেছে। মাহমূদ আমাদের সবাইকে তার পায়ে সিজদা দিতে বাধ্য করতে চায়। আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করতে রাজি নই। সেলজুকী সিংহরা! আজ তোমরা তোমাদের তরবারীকে তীক্ষ্ণ করে তোলো। প্রস্তুত হয়ে যাও, আমাদের পরবর্তী উৎসব হবে বিজয় উৎসব।

গোত্রপতি ইসরাঈলের ভাষণের পর সেদিন থেকেই পাহাড়ে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ প্রস্তুতি। নিক্ষেপযোগ্য বর্শা তৈরী হতে থাকল। অনেকে তীর ধনুক বানাতে লেগে গেল। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেলজুকীদের একত্রিত করা শুরু হলো। এক মাসের মধ্যে তৈরী হয়ে গেল একটা বিরাট বাহিনী।

ইসরাঈল সেলজুকী এলিকখানের সেনাবাহিনী থেকেও কিছুসংখ্যক সৈন্য তার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করলো। এলিকখানের সৈন্যদের সাথে তার ছেলে আহমদ তোগাখান কমাণ্ডার হিসেবে যোগদান করলো।

গযনী বাহিনীতে আরবাব খান সেলজুকী নামের এক ব্যক্তি একটি সেনা ইউনিটের কমান্ডার ছিল। একদিন তার বাবা তার সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। আরবাব খানের বাবা শুধু ছেলের সাথে সাক্ষাত করতে আসেননি, তিনি সাক্ষাতের পাশাপাশি একথাও জানাতে এলেন সেলজুকীরা সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেই সাথে সেলজুকী নেতারা বলছে, যে সব সেলজুকী গযনী বাহিনীতে রয়েছে তাদের উচিত, গযনী বাহিনী ত্যাগ করে ইসরাঈল সেলজুকীর নেতৃত্বে মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এরা যদি তা না করে তাহলে গোত্রের সাথে বেঈমানীর জন্যে কাফের হয়ে মারা যাবে।

আরবাব খান তার বাবার কাছ থেকে ইসরাঈল সেলজুকীর যুদ্ধ প্রস্তুতির বিস্তারিত শোনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আরবাব খান তার উর্ধ্বতন সেনাপতির কাছে গিয়ে জানাল— সেলজুকী গোত্রপতি ইসরাঈল সেলজুকী গযনী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ খবর এখনই সুলতানকে জানানো উচিত মাননীয় সেনপতি!

কিছুক্ষণ পর আরবাব খান ও তার পিতাকে সুলতানের সামনে হাজির করা হলো।

আমি তোমার ছেলের নৈতিকতাকে শ্রদ্ধা জানাই। কারণ সে তার বাবাকে আসামী করে আমার সামনে হাজির করেছে। আমি বুঝতে পারছি না তাকে কি পুরস্কার দিব? অবশ্য প্রকৃত পুরস্কার তাকে আখেরাতে আল্লাহ তাআলা দিবেন। আরবাব খানের পিতার উদ্দেশ্যে বললেন সুলতান মাহমদু।

সেলজুকী বৃদ্ধ ভয় ও আতংকে কাঁপতে লাগলো। সে আশংকা করছিল কঠিনতম কোন শাস্তি তাকে দেয়া হবে।

যাকে কেউ সত্য পথের সন্ধান দেয়নি, সে যদি বিপথগামী হয়, তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না। আজ তোমার ছেলে তোমাকে সত্য পথ দেখিয়েছে। এখন তুমি আমাকে বলো, ইসরাঈল সেলজুকী কি ধরনের যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছে? আরবাব খানের বাবার উদ্দেশ্যে বললেন সুলতান। তিনি আরো বললেন, তুমি যদি সেলজুকীদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও তাদের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে কোন কথাই না বল তবুও আমরা তোমাকে জেলখানায় বন্দি করবো না। কারণ, তুমি আমাদের সম্মানিত মেহমান। আমরা তোমাকে সম্মানের সাথে মেহমানদারী করবো। আমরা তোমাকে সসম্মানে বিদায় দেবো। যাতে তুমি বুঝতে পারো, কারা সত্যের অনুসারী। কারা ইসলামের সঠিক আদর্শের অনুগত। আর কারা ইসলামের নামে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তুমি কি সত্য গোপন করে আল্লাহর বিরুদ্ধে যাবে?

সুলতানের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো আরবাব খান। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো— গোস্তাখী মাফ করবেন সুলতান! আমার বাবা যদি সত্য কথা না বলে, তাহলে আপনার সামনেই তার মাথা কেটে আপনার পায়ে সোপর্দ করবো।

থামো আরবাব খান! তুমি আমার সাথে কোন গোস্তাখী করোনি। গোস্তাখী করেছো তোমার বাবার সাথে। বেচারা তো ইসলামের একটি দিক দেখেছে, তাকে ইসলামের প্রকৃতরূপ দেখার সুযোগ দাও। উচ্চ কণ্ঠে বললেন সুলতান।

বৃদ্ধ সুলতানের কথায় এতোটাই মুগ্ধ হলো যে, সামনে অগ্রসর হয়ে হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে পড়লো এবং কোমর থেকে তরবারী খোলে সুলতানের পায়ের কাছে রেখে বললো— সেলজুকী গোত্রপতি ইসরাঈল খান এলিক খানের ভাতিজীকে সম্প্রতি বিয়ে করে নিয়ে এসেছে এবং এলিকখানের কিছু সৈন্য সাথে নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল সেলজুকী উপজাতিদের একত্রিত করে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সুলতান মাহমূদ আরবাব খানের বাবার সাথে দীর্ঘ সময় কথা বলে প্রয়োজনীয় সব তথ্য জেনে নিলেন এবং তার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলেন– এই মুরুব্বীর জন্য শাহী মেহমান খানায় যাবতীয় আপ্যায়ন ও মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা হোক।

বৃদ্ধকে মেহমানখানায় পাঠিয়ে দিয়ে সুলতান আরবাব খানকে কিছু পুরস্কার দিয়ে বললেন— তুমি নিজেকে ইসরাঈলের বিশ্বস্ত লোক ঘোষণা দিয়ে ওখানে কিছু দিন থাকবে। সব কিছু জানা ও দেখা হয়ে গেলে সুযোগ মতো চলে আসবে।

এই ঘটনার পনেরো দিন পর আরবাব খান সেলজুকীদের খবর নিয়ে সুলতানের কাছে ফিরে এলো। সে এসেই সুলতানকে ইসরাঈল সেলজুকীর যাবতীয় প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দিল।

সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীতে দু'জন ছিলেন সেলজুকী সেনাপতি। এদের একজন আরবাব খানের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে প্রশংসা করলেন। আরবাব খান ছাড়াও আরো দু'জন সেলজুকী ছিলেন গযনী বাহিনীর কমান্ডার। একজন সেনাপতি তাদের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করলেন। সুলতান এই দু'জন সেলজুকী কমান্ডারকে ডেকে বললেন, তোমরা দু'জন ইসরাঈলের কাছে চলে যাও। তাকে কৌশলে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এদিকে নিয়ে এসো।

দুই কমান্ডার সেলজুকীদের কাছে গিয়ে কি ভূমিকা রাখবে এবং কখন কি উদ্যোগ নেবে এ ব্যাপারে তাদের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দিয়ে ইসরাঈলের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে সুলতান সেনাপতিদের ডেকে নির্দেশ দিলেন, যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে সেনাদেরকে বুখারার পাহাড়ী অঞ্চলে রওয়ানার জন্য তৈরী করুন।

* * *

১০১৭ সালের ঘটনা। সেলজুকী বাহিনীর যোদ্ধারা তিরমুজ নামক স্থান দিয়ে ককেসাস নদী পার হলো।

সেলজুকীরা ছিল প্রকৃত অর্থেই লড়াকু জাতি। ফলে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তারা বন্যার পানির মতোই ধেয়ে আসছিল। সেলজুকীরা ছিল উপজাতি।

তাদের নিজস্ব কোন সরকার ব্যবস্থা ছিল না এবং ছিল না প্রথাদুরস্ত প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী। ফলে সেলজুকীরা যে পথে অগ্রসর হচ্ছিল সকল জনপদ তারা লুণ্ঠন করে এবং লোকদের মাঠের ফসল তাদের ঘোড়া উট দিয়ে মাড়িয়ে আসছিল।

তিরমুজ থেকে ষাট মাইল এগুলে আহাঙ্গরা পাহাড়ী এলাকা। সেলজুকী বাহিনী সুলতান মাহমূদের পাঠানো দু'জন প্রশিক্ষিত কমান্ডারের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছিল। আহাঙ্গরা পাহাড়ী এলাকায় এসে সেলজুকী বাহিনী একটি জায়গায় তাঁবু ফেললো। সুলতানের দুই কমান্ডার ইসরাঈল সেলজুকীকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিল, যে এলাকায় সুলতানের সেনাবাহিনী নেই, তারা সেই এলাকা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সেলজুকীরা দীর্ঘ ক্লান্তিকর সফরের পর অসংখ্য তাঁবু ফেলে আহারাদি সেরে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে সবাই ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেল।

মাঝ রাতে তাঁবুগুলোর মাঝখান থেকে একটি মশাল উপরের দিকে উঠে ডানে বামে দোলে উঠলো। এটা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত সংকেত। এই সংকেতের পর চতুর্দিক থেকে তাঁবু এলাকায় এমন হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল যেন পাহাড়ের চূড়া ভেঙ্গে তাঁবুতে শায়িত মানুষগুলোর উপর আঁছড়ে পড়ছে। সুলতান মাহমূদের দুই সেলজুকী সেনাপতি সেলজুকীদের পণ্যসামগ্রীতে আগুন ধরিয়ে দিল এবং আগুনের আলোয় গযনী বাহিনী ঘুমন্ত সেলজুকীদের উপর চড়াও হলো।

সেলজুকীদের তুলনায় সুলতান মাহমূদের পাঠানো সৈন্য সংখ্যা ছিলো খুবই নগন্য। কিন্তু ঘুমন্ত সৈন্যদের পিষে মারার জন্য মাত্র দুটি অশ্বারোহী ইউনিটই যথেষ্ট ছিলো। আসলে সেই ঘুমন্ত তাঁবুপল্লীতে যা ঘটেছিল তা কোন লড়াই ছিল না, ছিল সেলজুকীদের গণ হত্যা। সেলজুকীরা কোন প্রতিরোধ বা আত্মরক্ষার সুযোগ পেলো না, গযনী বাহিনী সেলজুকীদের কচুকাটা করতে লাগল।

সুলতানের পাঠানো দুই সেলজুকী সেনাপতি ইসরাঈল সেলজুকী ও আহমদ তোগা খানকে জীবন্ত পাকড়াও করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওরা ছিল সাধারণ সেলজুকীদের চেয়ে অনেক সতর্ক। তাঁবুতে আক্রমণ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তারা দু'জন জীবন নিয়ে পালাতে সক্ষম হলো। সকাল বেলায় জ্বলন্ত তাঁবু ও অগণিত লাশের স্তুপের মাঝে ইসরাঈল সেলজুকী ও আহমদ তোগা খানের মরদেহ খুঁজে পাওয়া গেল না।

কয়েক দিন পরে ঘটনা। ইসরাঈল সেলজুকী মারয়ামকে বিয়ের পর যেখানে দাঁড়িয়ে তার গোত্রের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলো— তোমরা সবাই তোমাদের তীর ধনুক ঠিক ঠাক করে নাও, তরবারীকে শান দিয়ে নাও, আমাদের আগামী উৎসব হবে বিজয় উৎসব। পালিয়ে এসে ঠিক সেই টিলার পাদদেশে একটি

তাঁবুতে ভগ্ন হৃদয়ে হতাশ ইসরাঈল বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করছিল। আর মারয়াম নিজ হাতে ইসরাঈলকে শরাব পান করাচ্ছিল। আর ইসরাঈলের পাশে বসা ছিল একজন পণ্ডিতধরনের লোক।

জীবনের প্রথম পরাজয়ই শেষ যুদ্ধ নয় ইসরাইল! তুমি এভাবে ভেঙে পড়ো না। কারণ, তোমার অজ্ঞাতসারে অতর্কিত আক্রমণে তুমি পরাজয় বরণ করেছো। আবার নিজেকে শানিত করে প্রস্তুতি নিয়ে মোকাবেলা করো, শেষ বিজয় তোমারই হবে।

ইসরাঈল নীরব। যেনো কোন কথাই তার কানে প্রবেশ করছে না। এ অবস্থা দেখে পণ্ডিত লোকটিকে মারয়াম বাইরে চলে যেতে ইঙ্গিত করলে সে তাঁবুর বাইরে চলে গেলো। এবার ইসরাঈলকে একান্তে পেয়ে তাকে চাঙা করার জন্যে নিজের রূপ যৌবনের যাদুকরী কৌশল প্রয়োগ করতে লাগলো মারয়াম। খুব মায়াবী কণ্ঠে ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দিলো, একটু খানি পরাজয়ে তুমি এতোটা ভেঙ্গে পড়েছো? অথচ আমার সাথে প্রথম পরিচয়ের দিনই তুমি বলেছিলে, প্রথম মোকাবেলায় পরাজিত হলেও পরবর্তী মোকাবেলায় তুমি ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে মাহমূদকে শেষ ঠিকানায় পৌছে দেবে।

মারয়ামের উদ্দীপনামূলক কথাবার্তা ও দৈহিক উষ্ণতায় ইসরাঈল যেনো প্রাণ ফিরে পেলো। সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করলো এবং মারয়ামকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে নতুনভাবে প্রস্তুত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করলো।

কয়েক দিন পর যখন পরাজয়ের অবসাদ ও গ্লানি কাটিয়ে ইসরাঈল আবার সেলজুকীদের একত্রিত করে পুনরায় যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো, তখন খবর এলো— এলিকখান মারা গেছে। মৃত্যুর আগে সে বলে গেছে, ইসরাঈলকে বলবে, সে আমাকে আমার জীবদ্দশায় মাহমূদকে পরাজিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তার পরাজয়ের বর্ণনা শুনে আমি এতোটাই শোকাহত হয়েছি যে, এই বয়সে এতোটা কষ্ট আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হলো না। আমি আমার ছেলে আহমদ তোগা খানকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। ইসরাঈলকে বলো, সে যেনো আমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। নয়তো আমার বিদেহী আত্মা প্রেতাত্মা হয়ে তাকে শান্তিতে ঘুমাতে দেবে না।

ইসরাঈল যেনো তোগা খানের সাথে সৌহার্দ্য বজায় রাখে এবং আলাফতোগীনের সাথেও মৈত্রী বজায় রাখে। কারণ, তোমাদের কারো একার পক্ষে মাহমূদকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। আমি আলাফতোগীনকে শীঘ্রই

তার কাছে পাঠাচ্ছি। ইসরাঈল ও আলাফতোগীন দু'জন এক সাথে বসে যেন ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ করে।

বস্তুত আলাফতোগীনের হাতেই এলিকখান এই লিখিত পয়গাম দিয়েছিল। সে পয়গামে আরো জানালো, আলাফতোগীনের সাথে তোমার কাছে আমি দু'জন যুবতীকে পাঠালাম। মারয়াম এদেরকে ভালো ভাবেই জানে। মৃত্যুর আগে আমি তোমাকে একটা গোপন কৌশল বলে দিতে চাই—

আমার সাথে সাক্ষাতে তুমি বলেছিলে, প্রথম আক্রমণে মাহমূদকে পরাজিত না করতে পারলে তুমি অন্য পন্থা অবলম্বন করবে। অন্য পন্থা হিসেবে এই দু'টি মেয়েকে তুমি ব্যবহার করতে পারো। এরা খুবই চতুর ও সতর্ক মেয়ে। সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীতে কয়েকজন সেলজুকী কমান্ডার রয়েছে। এদেরকে এই মেয়ে দুটি দিয়ে তুমি ফাঁদে আটকাতে পারো। মেয়ে দুটিকে গযনী পাঠিয়ে দেবে। এরা সেখানে গিয়ে সেলজুকী কমান্ডারদের বিয়ে করবে। কিন্তু পর্দার অন্তরালে এরা মাহমূদের সেনাবাহিনীতে কর্মরত অন্যান্য সেলজুকীদেরকে তাদের ফাঁদে ফাঁসাতে থাকবে।

এদেরকে বুখারার বাইরের একজন উস্তাদ প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সে ইহুদী। ইহুদীর কথা শুনে মনে করো না, ইহুদী হয়তো আমাদের ক্ষতি করবে। আসলে আমাদের ক্ষতি করবে না, তার লক্ষ্য বস্তু মাহমূদ। সে আমার সাথে ওয়াদা করেছে মাহমূদের সেনাবাহিনীতে কর্মরত সেলজুকীদের খরীদ করতে যতো টাকার প্রয়োজন হয় সে নগদ অর্থ সহায়তা দেবে। এ ব্যাপারে অর্থ খরচের ব্যাপারে তুমি মোটেও চিন্তা করো না। আহমদ তোগা খানও তোমাকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা করবে।

ইসরাঈল যখন তার তাঁবুতে আগত দুই তরুণীকে দেখলো, তখন তার কাছে মনে হলো, রূপ সৌন্দর্যের দিক থেকে এরা মারয়ামের কাছে কিছুই নয়। তবে সুন্দরী।

দুই তরুণী যখন ইসরাঈলের সাথে কথা বলতে শুরু করলো এবং তাদের যাদুকরী অঙ্গভঙ্গি দেখাতে শুরু করলো, তখন মারয়ামের রূপসৌন্দর্য ইসরাঈলের কাছে পানসে হয়ে গেলো। তার হৃদয় থেকে ধীরে ধীরে মারয়ামের প্রেম ফিঁকে হতে শুরু করলো। সেখানে ঝড় তুললো এই দুই তরুণী।

কারণ তরুণী দুজন ছিল পুরুষের মনে কামনা জাগানোর ব্যাপারে পারদর্শী। কিভাবে কথা বলে, অঙ্গ-ভঙ্গি, চাহনী ও হাসি দিয়ে দৃষ্টি ও শরীর প্রদর্শন করে পুরুষের মনে আগুন ধরিয়ে দেয়া যায়, এ ব্যাপারে এরা ছিল দারুণ পারঙ্গম।

দুই তরুণীর সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পর ইসরাঈল গা ঝাড়া দিয়ে বিছানা ছেড়ে ওঠে পড়লো। তার মন থেকে পরাজয়ের গ্লানি দূর হয়ে গেল এবং সে ফিরে পেলো নতুন শক্তি, নতুন উদ্যম। দুই তরুণী ইসরাঈলের মধ্যে জাগিয়ে দিলো জীবনী শক্তি।

ডুবন্ত মানুষ খড়খুঁটোকে আঁকড়ে ধরেও বাঁচতে চেষ্টা করে। আর সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিতরা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য গোপন চক্রান্ত শুরু করে। ইতিহাস সাক্ষীঃ বহু খ্যাতিমান বীর পুরুষ যাদেরকে সম্মুখ যুদ্ধে কেউ পরাজিত করতে পারেনি তাদেরকে নারীর ফাঁদে ফেলে অনায়াসে নিঃশেষ করা হয়েছে। বহু ক্ষমতাধর রাজা বাদশাকে নাকানী চুবানী খাইয়েছে নারী। আবার বহু নারী নিজেকে জলাঞ্জলী দিয়ে অধপতনের অতল থেকে উদ্ধার করেছে পতনন্মুখ রাজা বাদশাকে।

সম্মুখ যুদ্ধে বারবার পরাস্ত হওয়ার পর বৃদ্ধ বয়সে কুচক্রী এলিকখান সুলতান মাহমূদকে পরাস্ত করার জন্য ইহুদীদের শরনাপন্ন হয়। ইহুদীরা এলিকখানের পাঠানো দুই তরুণীকে দীর্ঘ দিন প্রশিক্ষণ-দেয়, কিভাবে নারী দেহ প্রদর্শন করে এবং নারীত্বের ছলাকলা দেখিয়ে পুরুষকে ফাঁদে ফেলতে হয়। কিভাবে নারীর ইজ্জত বিকিয়ে দিয়ে কাংখিত পুরুষকে ঘায়েল করতে হয়।

ইহুদীদের হাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দুই মুসলিম তরুণী হতাশাগ্রস্থ সেলজুকী গোত্রপতি ইসরাঈলকে উজ্জীবিত করে পুনরায় সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে তৈরী করতে এসেছে এবং সেলজুকী মেয়ের পরিচয়ে গযনী বাহিনীর সেলজুকী কমান্ডারদের বিয়ের নামে বিভ্রান্ত করে গযনী বাহিনীর সৈন্যদের দিয়েই সুলতানকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

এদিকে আরেক এলিকখানী মেয়ে মারয়াম রাণী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। অথচ এই খান মেয়েদেরই একজন আম্বরী। মারয়ামের মতোই যুবতী সে। একই আলো বাতাস ও পরিবেশে বড় হয়েছে মারয়াম এবং আম্বরী। তাদের পরিবার ও পরিবেশে সুলতান মাহমূদের নাম অত্যন্ত ঘৃণাভরে উচ্চারিত হতো। ছোট বড় সকল এলিকখানী সুলতান মাহমূদকে ধ্বংসের জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকতো। সেই পরিবার ও পরিবেশে বেড়ে উঠেও আম্বরী ছিল ব্যতিক্রম। সমবয়সীরা যখন সুলতান মাহমূদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতো, তখন সেটির মধ্যেও সে খোঁজে পেতো শ্রদ্ধার উপাদান।

আম্বরীর এই ব্যতিক্রমী বিশ্বাস সম্পর্কে ধারণা ছিল মারয়ামের।

আম্বরী একদিন মারয়ামকে দৃঢ়ভাবে বলে ছিলো, তোমাদের এই ঘৃণা বিদ্বেষ আসলে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে না, ইসলামের বিরোধিতায় পর্যবসিত হচ্ছে। সুলতান মাহমূদের বিরোধিতা করে তোমরা বাস্তবে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করছো।

দু'জন খান তরুণীকে যখন বাইরের এক লোক একটি বদ্ধ কক্ষে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘ সময় কাটাতো এটি তখন আম্বরীর নজর এড়াতো না। তার চোখের সামনেই প্রতিদিন একটি গোপন কক্ষে ভিনদেশী এক পুরুষের সাথে সময় কাটাতো তারই বয়সী দুই খান তরুণী।

একদিন আম্বরী তরুণীদের জিজ্ঞেস করলো— তোমরা এই ঘরে দীর্ঘ সময় ধরে কি করো? ওই অপরিচিত লোকটি কে? ওরা আম্বরীকে জানালো, তিনি আমাদের গৃহ শিক্ষক। আমরা সেখানে তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করি।

একথা শুনে আম্বরীর খুব আফসোস হলো। সে মনে মনে বললো, দুরের মেয়েদের জন্য বাইরে থেকে শিক্ষক এনে শিক্ষা দেয়া হয়; কিন্তু ঘরের মেয়ে হওয়ার পরও তাকে উস্তাদের কাছে বসতে দেয়া হয় না। অবশ্য আফসোস হলেও পরবর্তীতে আম্বরীর কারণ উদঘাটনে মোটেও কষ্ট হয়নি। এলিকখানের বংশের সবাই আম্বরীকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মনে করতো। কারণ সব সময় তার মুখে থাকতো, ইসলাম দীন পরকাল জান্নাত জাহান্নাম, পাপ পুণ্য ইত্যাকার কথাবার্তা। শাহী খান্দানের অন্যান্য তরুণীদের মতো আম্বরী বিলাস ব্যাসনও আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকতো না। ফলে সবাই তাকে বলতো, ওর মধ্যে আবেগ উচ্ছাস নেই। রাগ অনুরাগহীন নিরামিষ ধরনের একজন নারী আম্বরী।

অথচ আম্বরী ছিলো খান পরিবারে যে কোন তরুণীর চেয়ে অনেক বেশী প্রখর অনুভূতির অধিকারী। কিন্তু তার আবেগ উচ্ছাস ছিল নিয়ন্ত্রিত। অশ্বারোহণও তীরন্দাজী ছাড়া আর কোন কাজ ও খেলাধুলায় সে মনোযোগী ছিলো না। সেই যুগে শাহী খানদানের সব মেয়েরাই অশ্বারোহণ ও তীরন্দাজীতে পারদর্শী হতো। এটাই ছিল সাধারণ রীতি। কিন্ত এ কাজে আম্বরীর পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ। সে পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে ঘোড়া দৌড়াতে এবং ধাবমান ঘোড়ার উপর থেকে নির্ভুল লক্ষ্যবস্তুতে তীর নিক্ষেপে অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। আম্বরীর তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না। এ ব্যাপারে তার কোন জুড়ি ছিল না। প্রায় দিনই সে একাকী ঘোড়া হাঁকিয়ে বাড়ি থেকে বহু দূরে চলে যেতো।

* * *

সেলজুকীরা মারাত্মক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল। জনবল হারানোর পাশাপাশি তাদের বিপুল সংখ্যক উট, ঘোড়া ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু সুলতান মাহমূদ এই বিজয়ে মোটেও নিরুদ্বিগ্ন হতে পারেননি। কারণ তিনি জানতেন, সেলজুকী একটি বিশাল জনগোষ্ঠী। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এদের লোক সংখ্যা বিপুল। তাছাড়া এলিকখানের রাজশক্তি এবং আলাফতোগীন এদের সহযোগী। কাজেই যে কোন সময় এরা একত্রিত হয়ে সীমান্ত এলাকায় আঘাত হানতে পারে। ফলে এদের উপর দৃষ্টি রাখা জরুরি। সুলতান মাহমূদ সীমান্তরক্ষীদের নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সীমান্ত চৌকিগুলোর টহল ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হোক এবং যতদূর সম্ভব টহল সেনাদের সীমান্তের বাইরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে সতর্ক রাখা হোক।

সুলতানের এই নির্দেশের পর সীমান্ত চৌকিগুলোর শক্তি বাড়ানো হলো। টহল জোরদার করা হলো এবং সীমান্তের বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত গযনী সৈন্যদের টহলের নির্দেশ দেয়া হলো।

উমর ইয়াজদানী ছিল গযনী বাহিনীর একজন কমান্ডার। তিনটি সীমান্ত চৌকির দায়িত্ব ছিল তার উপর। উকেসাস ইয়াজদানীর কর্মক্ষেত্র। উকেসাস নদীর একেবারে তীরবর্তী একটি চৌকিতে থাকতো উমর ইয়াজদানী। উমর ইয়াজদানীর অধীনস্ত সেনাদের জন্যে সবসময় নদীর তীরে বাধা থাকতো একাধিক নৌকা। নৌকা করেও তারা ওপারের অবস্থা পর্যবেক্ষণে বের হতো। কমান্ডার হিসেবে ইয়াজদানী প্রায়ই একাকী 'টহল দলের' অবস্থা দেখার জন্যে বেরিয়ে পড়তো। যাচাই করতো টহল সেনারা ঠিকমতো কর্তব্য পালন করছে কি না।

একদিন টহল সেনাদের পর্যবেক্ষণে বের হয়ে উমর ইয়াজদানী দূর থেকে লক্ষ করলো, তার টহলদল ঠিক মতোই টহল দিচ্ছে। অশ্বারোহী টহলদল অবিরাম ঘোড়া হাঁকিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। উমর দেখলো, তার দৃষ্টিসীমার বাইরে ওরা গহীন অরণ্যে চলে গেছে। এটাই ছিল স্বাভাবিক। উমর তার অধীনস্থদের কাজে আশ্বস্ত হয়ে উল্টো দিকে ঘোড়া হাঁকাল।

উমর ছিল কমান্ডার। তার কাছে তীর ধনুক রাখার দরকার ছিল না। কিন্তু উমর এসবের ধার ধারে না। ঘর থেকে বের হলে তীর ধনুক, তরবারী তার সাথে থাকবেই। এগুলোকে একজন সৈনিকের সার্বক্ষণিক পোষাক মনে করে উমর। অফিসার ও সিপাহীর ভিন্নতায় বিশ্বাসী নয় উমর ইয়াজদানী।

সীমান্তের এই এলাকাটি ছিল শিকারে জন্যে উপযুক্ত জায়গা। এখানে দল বেঁধে হরিণ, খরগোশ, বনগরু বিচরণ করতো। উমর ইয়াজদানী হরিণ শিকারেও ছিল পটু। প্রায়ই একাকিই শিকার করে নিয়ে আসতো হরিণ খরগোশ ইত্যাদি।

সে দিন টহল সেনাদের গতিবিধি দেখে উল্টো দিকে রওয়ানা হতেই সামান্য দূরে তার চোখ পড়লো কয়েকটি হরিণের উপর। হরিণকে শিকার করতে হলে পেছন দিয়ে কিছুটা পথ ঘুরে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করতে হয়। কিন্তু হরিণগুলো হঠাৎ সেখান থেকে আরো দুরে সরে যেতে লাগল। উমর ইয়াজদানীর মনোযোগ নিবদ্ধ ছিলো হরিণের প্রতি। তার খেয়াল ছিলো না হরিণ তাড়া করে সে সীমানা থেকে কতোটুকু দূরে চলে এসেছে।

এক পর্যায়ে তার চোখে পড়লো পাহাড়ী এলাকা। হঠাৎ হরিণগুলো কান খাড়া করে উর্ধশ্বাসে দৌড়াতে লাগল। মনে হচ্ছে ওরা কোন শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উমর ইয়াজদানীর কানে ভেসে এলো ছুটন্ত অশ্বখুড়ের আওয়াজ। ধীরে ধীরে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ আরো কাছে এগিয়ে এলো। উমর ইয়াজদানী ঘোড়া থামাল। চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সে দেখতে পেলো, একটি ধাবমান অশ্বারোহী ডানে বামে তীর চালাচ্ছে আর তার ঘোড়াটি একে বেঁকে দৌড়াচ্ছে।

হঠাৎ ঘোড়াটি একদিকে ঘুরে গেলে উমর দেখলো, অশ্বরোহী একজন নারী এবং তাকে তাড়া করছে চারটি চিতা বাঘ। মহিলা তার ঘোড়াকে ডানে বামে ঘুরিয়ে চিতাগুলোর উপর তীর চালাচ্ছিল, কিন্তু কোন তীরই চিতাকে আঘাত করতে পারছিল না।

সেই অঞ্চলের চিতাবাঘের হিংস্রতা ছিল প্রবাদতুল্য। অন্যান্য বাঘের চেয়ে ওখানকার বাঘ ছিলো অনেক বেশী শক্তিশালী ও হিংস্র। বাঘের ভয়ে ঘোড়া উর্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছিল। কিন্তু দৌড়াতে দৌড়াতে ঘোড়াটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এ দিকে একটি মেয়ের পক্ষে চারটি চিতাবাঘের মোকাবেলা করা ছিল অসম্ভব। দৃশ্যত চিতাবাঘের আক্রমণ থেকে মেয়েটির বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না। পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করে কাল বিলম্ব না করে ধনুকে তীর ভরে উমর ইয়াজদানী তার ঘোড়া চিতার পেছনে ছুটালো। ততোক্ষণে চিতা ও আক্রান্ত মেয়েটি অনেক দূর চলে গেছে। আর দুটি চিতা মেয়েটির দু'পাশ থেকে ঘোড়াকে আক্রমণ উদ্যত অবস্থায়।

উমর তার ঘোড়াকে ইশারা করতেই সেনাবাহিনীর তাজাদম প্রশিক্ষিত ঘোড়া বাতাসের আগে ছুটতে লাগল। ততোক্ষণে একটি চিতা মেয়েটির ঘোড়ার

গায়ে দু'একটি থাবা মেরে দিয়েছে। এমন নাজুক অবস্থায় তীর চালালে তীর লক্ষভ্রষ্ট হয়ে মেয়েটি আহত হতে পারে, এই আশংকায় তীর না চালিয়ে উমর ইয়াজদানী বিদ্যুৎবেগে মেয়ের ঘোড়াকে আক্রমণকারী একটি চিতার উপরে তার ঘোড়াটি তুলে দিলো। ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে বাঘটি পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘোড়াকে ঘুরিয়ে ধাবমান ঘোড়া থেকে একটি চিতাকে লক্ষ করে তীর ছূড়ল। চিতা একটি আর্ত চিৎকার দিয়ে শিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উল্টো দিকে দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু বেশী দূর যেতে পারলো না, পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল।

অপর দুই চিতা সঙ্গী দু'জনের অবস্থা দেখে শিকার ত্যাগ করে জীবন নিয়ে পালালো। চিতার তাড়া না থাকলেও চিতার ভয়ে ভড়কে যাওয়া মেয়েটির ঘোড়া বেলাগাম হয়ে পড়েছিল। সে তখনো জীবনপণ দৌড়াচ্ছে, থামার নাম নেই। উমর ইয়াজদানী লাগামহীন হয়ে যাওয়া ঘোড়াটিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে তার ঘোড়াকে সেই ঘোড়ার পাশে চালিয়ে দিল। এবার সে দেখতে পেলো আরোহী বয়স্ক মহিলা নয়, একজন দারুন সুন্দরী তরুণী। চেহারা ছবি দেখে মনে হয় কোন শাহী খান্দানের মেয়ে।

উমর ইয়াজদানী তরুণীর ঘোড়াকে অতিক্রম করে থাবা দিয়ে ঘোড়ার লাগামটি হাতিয়ে নিয়ে ঘোড়াটিকে থামাতে চেষ্টা করল। বহু কষ্টে সে আতংকগ্রস্ত ঘোড়াটিকে থামাল। তবে আরোহী তরুণীকে মোটেও শংকিত মনে হলো না। হাপাচ্ছিল তরুণী। এভাবে জীবন বাঁচানোর জন্য উমর ইয়াজদানী ক্লান্ত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা জানালো তরুণীকে। তরুণীর কণ্ঠ শোনে উমর ইয়াজদানী বললো— আচ্ছা! আপনি এলিকখানী?

হ্যাঁ, আপনি?

গযনবী। আমি গযনী বাহিনীর একজন কমান্ডার। একটি হরিণকে তাড়া করে অনেক দূরে এসে পড়েছিলাম। কিন্তু আপনার ঘোড়াকে চিতা বাঘে তাড়া করতে দেখে আমি এ পর্যন্ত এসে গেলাম।

আপনি কি জানেন? আপনার সীমান্ত থেকে আপনি অন্য রাজ্যের কতখানি ভেতরে চলে এসেছেন? মুচকি হেসে বললো তরুণী। আপনি এখন আমাদের সীমান্তের পাঁচ মাইল ভেতরে। আপনি আর আমি কিন্তু পরস্পর শত্রু।

হ্যাঁ শত্রু বটে, কিন্তু প্রধান শত্রু এলিকখান মারা গেছে। জীবিত অবস্থায়ই আমরা তার শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছিলাম। আপনি খানদের কোন অংশের মেয়ে?

আমি শাহী খান্দানের মেয়ে। এলিকখান আমার চাচা ছিলেন। আমার নাম আম্বরী।

আচ্ছা, আপনি তাহলে শাহজাদী।

হ্যাঁ, শাহী বংশের মেয়ে বলেই আমরা একে অন্যের শত্রু।

একজন অপরিচিত তরুণীকে কোন কড়া কথা বল্‌তে আমার ইচ্ছে করছে না। তবে না বলেও পারছি না। শাহজাদী আম্বরী! আপনার বয়স তেমন হয়নি। এই বয়সে কে শত্রু কে বন্ধু, কার রাজনৈতিক কর্মকান্ড ঠিক, কারটি বেঠিক তা নির্ণয় করার মতো জ্ঞান আপনার হয়নি। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, সুলতান মাহমূদের প্রতি আপনাদের যে হিংসা ও শত্রুতা তা মন থেকে দূর করে দিন। ভবিষ্যত প্রজন্মকে একথা শিক্ষা দিন যে, দু'জন মুসলমান একে অন্যের শত্রু হতে পারে না।

আমাকে আপনি শত্রু পক্ষের লোক মনে করবেন না কমান্ডার। আপনার এই উপদেশেরও আমার প্রয়োজন নেই। আপনি কি জানেন? সুলতান মাহমূদকে শত্রু জ্ঞান করি না বলে আমার খান্দানের লোকেরা আমাকে পাগল মনে করে। সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং ন্যায়পরায়ণ সত্যপন্থি সুলতান মাহমূদকে শ্রদ্ধা করি বলেই হয়তো আজ বাঘের আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য এক শত্রু সেনা কমান্ডারকে আল্লাহ তাআলা সীমান্তের পাঁচ মাইল ভেতরে পাঠিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। হ্যায় আল্লাহ! আপনি না এলে এতোক্ষণে চিতাবাঘ আমাকে চিড়ে খেয়ে ফেলতো।

আমি আপনার শত্রুপক্ষের লোক। শত্রুপক্ষের লোক হওয়ার পরও আপনাদের সীমানায় অবৈধভাবে প্রবেশ করেছি। এখন আমার ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কি হবে? আমি কি আপনার বন্দি?

না, না। আপনি বন্দি হবেন কেন? আপনি আমার কাছে সম্মানিত অতিথি। বললো আম্বরী। আপনার যদি তাড়া থাকে তবে এখন চলে যেতে পারেন। আমাকে এক্ষুণি বাড়ি ফিরতে হবে। কারণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি অনেক্ষণ হয়েছে। বাড়ির লোকজন হয়তো আমাকে খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়েছে।

আম্বরী ও ইয়াজদানী একে অন্যের দিকে তাকাল। তাদের মধ্যে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় হলো। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে উভয়েই মুচকি হাসলো। এরপর ঘোড়ার দিক ঘুরিয়ে ক্ষীণ আওয়াজে ইয়াজদানী বললো— খোদা হাফেয, শাহজাদী! ইয়াজদানীর ঘোড়া চলতে শুরু করেছিল। ঠিক সেই সময়ে ডেকে উঠলো আম্বরী।

দাঁড়ান! আগামীকাল কি আপনি এখানে আসতে পারবেন? আমি আগামী কাল এখানে আসবো।

আমাকে পাকড়াও করতে কতোজন লোক আসবে? জানতে চাইলো ইয়াজদানী।

একথা শুনে আম্বরীর মুখ থেকে হাসি উবে গেল। মলীন হয়ে গেল তার চেহারা।

আমার প্রতি এমন সন্দেহ করতে পারলেন আপনি? উদাস কণ্ঠে বললো আম্বরী। অবশ্য আমার পক্ষে আপনাকে নিশ্চয়তা দেয়ার কোন উপায় নেই। আমি আপনাকে ধোঁকা দেবো না একথা কিভাবে বুঝাবো? তবে একথা জেনে রাখুন, আপনি চাইলে আমি আপনার চৌকিতেও হানা দিতে পারি।

দুঃখিত, আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি একথা বলিনি। যাক, আমি কথা দিলাম, আগামীকাল আপনার জন্যে এখানে আসবো।

ইয়াজদানী আর কালক্ষেপণ না করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ইয়াজদানীর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলো আম্বরী।

ঝুকি নিলো ইয়াজদানী। পরদিন জীবনের ঝুকি নিয়ে আম্বরীকে যেখানে পেয়েছিল সেখানে এলো। আম্বরী আগে এসেই দাঁড়িয়ে ছিল। কুশল বিনিময়ের পর নিজ নিজ শখ, রুচি, প্রত্যাশা ও স্বপ্নের কথাই অগ্রাধিকার পেলো। দীর্ঘ আলোচনায় তারা একে অন্যের আদর্শিক জীবনাদর্শে এতোটাই মুগ্ধ হলো যে, দুজনে মিলে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। এভাবে সীমান্ত পেরিয়ে শত্রু রাজ্যের ভেতরে গিয়ে আম্বরীর সাথে নিয়মিত দেখা সাক্ষাত করতে লাগলো ইয়াজদানী।

সপ্তম দিনের সাক্ষাতে ইয়াজদানী লক্ষ করলো, আম্বরীর মধ্যে আগের মতো এতোটা উৎফুল্ল ভাব নেই। তার চেহারা মলিন এবং বিব্রত। কিছুক্ষণ নীরব থেকে এক পর্যায়ে আম্বরী নিজে থেকেই বললো—

তোমার প্রতি ভালোবাসার টান আমাকে আজো এখানে নিয়ে এসেছে। অথচ এখন আমাদের উভয়ের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ। গতকাল আমাকে রাজমহলের এক সেবিকা বলেছে, প্রতি দিন দীর্ঘ সময়ের জন্যে বাড়ির বাইরে থাকার ব্যাপারটি আমার প্রতি রাজমহলের সবার মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। তাই আজ থেকে আমার পেছনে গুপ্তচর লাগিয়ে দেয়া হতে পারে। এমন হলে কিন্তু আমাদের কারোরই প্রাণ বাঁচবে না। অবশ্য নিজের জীবনের ভ্রুক্ষেপ করি না আমি। কিন্তু তোমাকে নিয়েই আমার চিন্তা। একটু সতর্ক থেকো।

কেউ যদি আমাদের দেখে ফেলে তবে আমি আর রাজমহলে ফিরে যাবো না। যদি পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে, তোমার সাথেই চলে যাবো। তুমি কি আমাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত?

প্রতি দিন জীবনের ঝুকি নিয়ে শত্রু রাজ্যের ভেতরে এসে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করি কি ঠাট্টা করতে? কি মনে করো তুমি? দৃঢ় কণ্ঠে বললো ইয়াজদানী।

এ ব্যাপারে আর বেশী চিন্তা ভাবনার সুযোগ পেলোনা ওরা। উভয়ের কানে ভেসে এলো অশ্বখুড়ের আওয়াজ।

হয়তো আমাকে অনুসন্ধানকারী লোকেরা এসে গেছে— বললো আম্বরী।

ওই যে দেখো— দূরে ধাবমান তিনজন অশ্বারোহীর দিকে ইঙ্গিত করে আম্বরীর উদ্দেশে বললো ইয়াজদানী। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল এরা এলিকখানের রাজকীয় বাহিনীর সৈন্য। তিন অশ্বারোহীকে এদিকে আসতে দেখে দ্রুত উভয়েই নিজ নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হলো। ততোক্ষণে অনুসন্ধানী দল তাদের দেখে ফেলেছে এবং পাকড়াও করতে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াজদানীকে দ্রুত ঘোড়া হাঁকানোর জন্যে তাড়া দিল আম্বরী। ধাবমান ঘোড়া থেকে তিনটি তীর ছুটে এসে দু'টি আম্বরীর ঘোড়াকে আঘাত করলো। ঘোড়াটি হঠাৎ হ্রেষারব করে লাফিয়ে উঠলো।

পিছন ফিরে ইয়াজদানী দেখলো, আম্বরীর ধরা পড়া নিশ্চিত। সে জীবনের ঝুকি নিয়ে তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আম্বরীর ঘোড়ার পাশে নিয়ে এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে আম্বরীকে বললো তার ঘোড়ার উপর চলে আসতে। দক্ষ অশ্বারোহীর মতো আম্বরী ধাবমান অবস্থায়ই লাফ দিয়ে ইয়াজদানীর সামনে তার ঘোড়ায় চড়ে বসলো এবং নিজের ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিল। ততোক্ষণে পিছু ধাওয়াকারীদের দূরত্ব কমে গেছে।

ইয়াজদানী একহাতে আম্বরীকে ধরে অপর হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়াকে এমন তীব্র গতিতে একে বেঁকে চালাতে লাগলো যে, পিছু ধাওয়াকারীদের সাথে তার দূরত্ব মুহূর্তের মধ্যে অনেকটা বেড়ে গেল। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর একটি পাহাড়ের টিলা এসে গেল। ইয়াজদানী দ্রুত তার ঘোড়াটিকে পাহাড়ের ওপারে নিয়ে গেল। সেই সাথে সীমান্তও পেরিয় এলো ইয়াজদানী।

ইয়াজদানী আম্বরীকে নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে নিজের ভূখণ্ডে চলে আসার পর আর পিছু ধাওয়া করলো না খান সেনারা। তারা নিজ গন্তব্যে ফিরে গেল। ভাগ্যক্রমে গযনী সুলতানের এক শুভাকাঙ্খী গযনী বাহিনীর এক কমান্ডারের জীবন সঙ্গীনী হয়ে ইসলামের সেবা করার সুযোগ পেয়ে গেল। যা ছিল তার আশৈশব লালিত স্বপ্ন।

* * *

উমর ইয়াজদানী আর আম্বরীর বিয়ের ব্যাপারটি ছিল বছর খানিক পূর্বের ঘটনা। এই ঘটনার এক বছর পর সুলতান মাহমূদ পুনর্বার হিন্দুস্তান অভিযানে বের হলেন। এবার তাঁর ইচ্ছা হিন্দুস্তানের কুচক্রী হিন্দু রাজাদের কোমর ভেঙে দিয়ে হিন্দুস্তানে পরিপূর্ণ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য তিনি সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিক থেকে অফিসার পর্যন্ত সবাইকে অনুমতি দিয়েছিলেন তারা ইচ্ছা করলে এই অভিযানে তাদের স্ত্রী সন্তানদের সাথে নিয়ে যেতে পারে। তিনি হিন্দুস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করে সেখানে স্থায়ীভাবে কিছু সৈন্য রাখার জন্যে এই অনুমতি দিয়েছিলেন।

এবার তার প্রধান টার্গেট ছিল লাহোর। অবশ্য অন্যান্য হিন্দু রাজাদেরও শক্তি নিঃশেষ করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু লাহোরের ক্ষমতাসীন নতুন রাজা তরলোচনপাল বেশী বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। খবর এসেছে, রাজা তরলোচনপাল তার সেনাবাহিনী কন্নৌজ ও মথুরার মধ্যবর্তী কোন অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে গেছে এবং সে অঞ্চলে অবস্থান নিয়ে সে অন্য হিন্দু রাজাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার শক্তি সঞ্চয় করছে।

সুলতানের অনুমতি পেয়ে অনেক সৈনিক, কমান্ডার ও সেনাপতি তাদের স্ত্রী সন্তানদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলো। তখন ইয়াজদানী ছিল কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে। সীমান্তের চৌকি থেকে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। উমর ইয়াজদানীকে হিন্দুস্তান রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুনে তার স্ত্রী আম্বরীও সাথে যাওয়ার জন্যে বায়না ধরলো। ইয়াজদানী কিছুতেই আম্বরীকে সাথে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিল না। কিন্তু আম্বরীর সবিনয় অনুরোধ ও উপর্যুপরী তাগাদা আর জেদের কাছে হার মেনে আম্বরীকে সাথে নিতে রাজি হলো ইয়াজদানী

আম্বরীর এই সফরে যাওয়ার বায়না ধরার মধ্যে যতোটা না স্বামীর সঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিলো তার চেয়ে বেশী ছিল জিহাদে অংশ গ্রহণের আবেগ। আম্বরী প্রায়ই ইয়াজদানীকে বলতো— আল্লাহর প্রতি আমার খুব অভিমান হয়, আমাকে কেন নারী করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে? নয়তো আমি তোমাদের মতো তরবারী হাতে নিয়ে বেঈমান দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে ধন্য হতে পারতাম। নারী হয়েও আমার আত্মা সব সময় জিহাদের ময়দানে ঘুরে বেড়ায়।

ওই কাফেরদেকেই তুমি শুধু দুশমন মনে করছো? এদের চেয়ে আরো ভয়ংকর দুশমন নিজ ধর্মের লেবাসধারীরা। কারণ কাফেরদেরকে সবাই চিনে। জানে যে এরা দুশমন। কিন্তু মুসলমান বেঈমানদের অনেকেই চিনে না। এরা মুসলিম পরিচয়ে দৃশ্যত সুহৃদ হয়ে পাশে থাকে, কিন্তু সুযোগ মতো পিঠে খঞ্জর বসিয়ে দিয়ে বলে— আমি আঘাত করিনি। আমি তো তোমার ভাই! এ

ব্যাপারটি তুমি ভালোই জানো। কারণ, খান্দানী ভাবেই তুমি ঈমান বিক্রেতা গোষ্ঠীর মেয়ে। কিন্তু আমি ভেবে অবাক হই, এমন খান্দানের হয়েও তুমি বেঈমানদের বিরুদ্ধে এতোটা ক্ষোভ কিভাবে পোষণ করো? বললো ইয়াজদানী।

শোন! আমার মা ছিলেন খাঁটি ঈমানদার গোষ্ঠীর মেয়ে। আমার বাবা ছিলেন খান রাজবংশের ছেলে। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমার মাকে জোর করে বিয়ে করেছিলেন। আমার মা জীবনেও খানদের কর্মকাণ্ড সমর্থন করতে পারেননি। আমার জন্মের পর আমি যখন কিছুটা বুঝতে শিখেছি, তখনই আমার মা আমাকে বলতেন, মুসলমানদের লেবাসধারী এই এলিকখান গোষ্ঠী ইসলামের ভয়ংকর শত্রু। শৈশব থেকে মা আমাকে সুলতান মাহমূদের নানা গল্প শোনাতেন। সেই শৈশব থেকেই আমি সুলতান মাহমূদকে আমার আদর্শ বলে মনে করি এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি।

আমি ছিলাম আমার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। আমার মা প্রায়ই বলতেন, আল্লাহ যদি আমাকে একটি পুত্র দেন তবে তার হাতে আমি এসব ইসলাম দুশমনদের খতম করাবো। দুর্ভাগ্য যে, আমার কোন ভাই হয়নি। মায়ের সেই ইচ্ছা আমি পূরণ করতে না পারলে আমার বেঁচে থেকে কি লাভ? আমি স্ত্রী হিসেবে তোমার সঙ্গী হতে চাচ্ছি না। একজন নারী সৈনিক হিসেবে তোমার সাথে যেতে চাই। তুমি আমাকে নিতে না চাইলে আমি ঘোড়া চালাতে জানি, তীর নিক্ষেপে দক্ষ একথা তুমি জানো। তোমার নেয়ার অপেক্ষা না করে আমি নিজেই সেনাদের পিছু পিছু চলে যাবো। আমাকে একটা কিছু করতেই হবে ইয়াজদানী! আমাকে সেটা করতে দাও। নারী পুরুষের শক্তি। সে শক্তি নষ্ট করে ঘরে আবদ্ধ না রেখে একে সক্রিয় রাখো। হয়তো বা সময়ে কাজে লাগতে পারে।

অবশেষে আম্বরীও হিন্দুস্তানী কাফেলার সঙ্গী হলো। কাফেলার বিস্তৃতি ছিল দুই মাইলের চেয়ে দীর্ঘ। রসদপত্রবাহী ঘোড়ার গাড়ীর দীর্ঘ সারির আগে সৈন্যরা, আর এর পিছনে পালকীতে মহিলারা।

দুর্ভাগ্য বশতঃ একই কাফেলার সহযাত্রী ছিল প্রাণঘাতি কতিপয় শত্রু। এই অজ্ঞাত পরিচয় শত্রু ছিল গযনী বাহিনীর কতিপয় সেলজুকী সদস্য। এরা দীর্ঘ দিন ধরে গযনী বাহিনীতে কর্মরত। কখনো তাদের কোন কাজে সন্দেহ করার মতো কিছু ঘটেনি। তাদের বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু এবারের সফরের কিছু দিন আগে এদের বিশ্বস্ততায় চির ধরে। ভেতরে ভেতরে এরা সাংঘাতিক বেঈমান হয়ে ওঠে। কিন্তু এই ব্যাপারটি ধরা পড়ার মতো কোন কর্মকান্ড কারো চোখে পড়েনি।

প্রায় বছর খানিক আগে রজব ভাই নামের এক সেলজুকী কমাণ্ডার একজন সেলজুকী মেয়েকে বিয়ে করে। তার মতো আরেক সৈনিকও একই সময় আরেক সেলজুকী মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। এই দুজনের বিয়ের পর ধীরে ধীরে সেলজুকী সৈন্যরা একটি জায়গায় বসবাসের স্থান করে নেয়।

কেউ জানতো না, এই দুই সেলজুকী সৈনিকের কাছে স্ত্রী পরিচয়ে দুই তরুণীকে পুরস্কার স্বরূপ পাঠানো হয়েছে। এরা পছন্দ করে তাদেরকে বিয়ে করে নিয়ে আসেনি।

একবার কমান্ডার রজব ভাই ও তার এক স্বগোত্রীয় সঙ্গী এক সাথে তাদের পরিবার পরিজনের সাথে ছুটি কাটাতে বুখারার পাহাড়ী এলাকায় গেল। ছুটিতে যাওয়ার পর সেলজুকী গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এবং একজন দরবেশ লেবাসধারী ব্যক্তি তাদের সাথে সাক্ষাত করতে এলো। সাক্ষাতে নানা কথাবার্তার পর দরবেশ কমান্ডার রজব ভাই ও তার সঙ্গীর সামনে গোত্রপ্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সেলজুকীদের বিরুদ্ধে গযনী বাহিনীর লড়াই ও সেলজুকীদের নির্মমভাবে হত্যা করার বিষয়টি এমন জ্বালাময়ী ও হৃদয়বিদারক ভাষায় বর্ণনা করলো যে, স্বগোত্রীয় ভাইদের করুন মৃত্যুতে তাদের চোখে পানি এসে গেল এবং হত্যাকারী গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের রক্ত টগবগিয়ে উঠলো। কমান্ডার রজব ক্ষোভে দুঃখে বললো, সে আর গযনী বাহিনীতে ফিরে যাবে না।

না, না। তোমার এমনটি করা উচিত হবে না। এটা হবে কাপুরুষতা— বললো দরবেশ ব্যক্তি। তোমাকে সেলজুকী ভাইদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই তোমার গযনী বাহিনীতে থাকা উচিত।

এবার গিয়ে মাহমূদকে আমরা খুন করে ফেলবো— উত্তেজিত কণ্ঠে বললো কমান্ডার রজব ভাই।

তাতে তেমন কোন লাভ হবে না— বললো একজন নেতৃস্থানীয় লোক। তোমাদের কি করতে হবে সেটি আমরা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। তোমাদের গযনী বাহিনীতে যতো সেলজুকী আছে, অতি গোপনে সবাইকে তোমাদের দলে ভেড়াবে। তারা যখন নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠবে ও তোমাদের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে উঠবে তখন তোমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদেরকে জানাবে।

তোমরা প্রশিক্ষিত যোদ্ধা। যুদ্ধের ব্যাপারে তোমরাই অভিজ্ঞ। হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ময়দানে সুলতান মাহমূদকে ধোকা দিতে হবে, তার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে হবে। সুলতান মাহমদু থাকলো কি মরলো তাতে কিছু যায় আসে না।

মাহমূদ আগামী কিছু দিনের মধ্যেই হিন্দুস্তানে অভিযান চালাবে। সেই অভিযানে নিশ্চয়ই তোমরা থাকবে। তোমরা তখন হিন্দু বাহিনীর সাথে মিলে গযনী বাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণ করে নিঃশেষ করে দিতে পার।

কিন্তু হিন্দুস্তানে গিয়ে আমরা হিন্দুদের সাথে কি ভাবে যোগাযোগ করবো? আমরা তো কেউ হিন্দুস্তানের ভাষা জানি না! উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো রজব ভাই।

সেই ব্যবস্থা তোমাদের নাগালের মধ্যেই আছে— বললো দরবেশরূপী ব্যক্তি। গযনীতেও এই কাজের বহু লোক রয়েছে। এরা হলো সেই সব হিন্দু, যাদেরকে প্রতিটি যুদ্ধের পর গযনী বাহিনী পাকড়াও করে গযনী নিয়ে এসেছে। এদের বাছাই করে মাহমূদ দুটি সেনা ইউনিট গঠন করেছে। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক হিন্দু সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছে। গ্রেফতারকৃত হিন্দুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে গযনীর বিত্তশালীরা দাস হিসাবে কিনে নিয়ে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছে।

আমরা তোমাদেরকে এমন কয়েকজন হিন্দুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো, যারা তোমাদের ব্যক্তিগত কর্মচারী কিংবা কোচওয়ান হিসেবে সেনাবাহিনীর সাথেই থাকবে। এরা মুসলিম পরিচয় ধারণ করবে। কিন্তু বাস্তবে তারা নিষ্ঠাবান হিন্দু। এরাই হিন্দুস্তানে সব প্রয়োজনে তোমাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। এরা হিন্দু সেনাদের সাথে তোমাদের যোগাযোগ করিয়ে দেবে।

আমরা তাদেরকে এই পরিমাণ ধন-সম্পদ দেবো, যা তারা জীবনে পাবে তো দূরের কথা কল্পনাও করতে পারে না। তাদের সবচেয়ে বেশী প্রাপ্তি হব, তারা গোলামীর জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের জন্ম ভূমিতে ফিরে যেতে পারবে। যুদ্ধের ময়দানে তোমরা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যে, গোটা গযনী বাহিনী হিন্দুদের সহজ আক্রমণের শিকার হয়ে যায়।

তোমরা মাহমূদের যুদ্ধ কৌশল জানো— বললো আরেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। মাহমূদের আক্রমণ কৌশল অনেক জায়গা নিয়ে হয়ে থাকে। সম্মুখভাগে সে খুবই সামান্য সৈন্য রাখে। অধিকাংশ সৈন্যকে ডানে বামে ছড়িয়ে দিয়ে শত্রুপক্ষকে ডানে বামে এবং পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে। মাহমূদ শত্রুপক্ষকে এগিয়ে আসতে বাধ্য করে। তার গেরিলা যোদ্ধারা রাতের বেলায়ও শত্রুপক্ষকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না।

এবার মাহমূদের যুদ্ধ কৌশলের প্রতি তোমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। তার পরিকল্পনার কথা আগেই হিন্দুদের জানিয়ে দেবে। মাহমূদ যদি কোথাও ফাঁদ তৈরী করে তবে তা যথা সময়ে তোমরা হিন্দু বাহিনীকে জানিয়ে দেবে। তোমরা

তো আগেই জানতে পারবে, এবার যে সেনাপতি তার সাথে যাচ্ছে, সে কতটুকু ঝানু ও অভিজ্ঞ।

তোমরা হয়তো জানো, আবু আব্দুল্লাহ্ আলতাঈ সুলতান মাহমূদের ডান হাত। ইতিহাসে আলতাঈর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভবিষ্যতে মানুষ যখন মাহমূদের নাম উচ্চারণ করবে পাশাপাশি সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ আলতাঈর নামও স্মরণ করবে। যুদ্ধের ময়দানে যদি সুযোগ পাও, তাহলে আলতাঈকে খুন করে ফেলবে। হত্যার ক্ষেত্রে দূর থেকে তীর ব্যবহার করবে, তবে কিছুতেই যাতে ধরা না পড়ো। ধরা পড়লে কিন্তু আমাদের সব পরিকল্পনা ধুলিস্যাত হয়ে যাবে।

এজন্যই আমরা সুলতান মাহমূদের হত্যার ব্যাপারে কোন কথা বলি না— বললো দরবেশরূপী ব্যক্তি। কারণ, তাকে আমরা গযনী থেকে হাজারো মাইল দূরে হিন্দুস্তানের ভেতরে হিন্দুদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে চাই। আমরা চাই, গযনী বাহিনীর শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাক এবং বেঁচে থাকা গযনীর সকল সৈন্য হিন্দুদের হাতে বন্দি হোক আর চরম পরাজয়ের গ্লানী নিয়ে মাহমূদ হিন্দুদের হাতে গ্রেফতার হয়ে লাঞ্চনার শিকার হোক। তোমরা কি জানো, এমনটি ঘটাতে পারলে এরপর গযনীর রাজত্বের অধিকারী হবে সেলজুকীরা? তোমরা কি অনুভব করতে পারো না, সেলজুকী একটি বিরাট শক্তি? দেখবে, বুখারা থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত গোটা অঞ্চল সেলজুকী রাজত্বের আওতায় চলে আসবে। গভীর আবেগ ও উচ্ছাসে বললো দরবেশ।

সেলজুকী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তোমরাই হবে সেনাপতি ও ডেপুটি সেনাপতি— বললো আরেকজন। আমরা এমন দু'জন মেয়েকে তোমাদের স্ত্রী হিসেবে দিচ্ছি, এ ধরনের মেয়ে সাধারণত রাজা বাদশাদের ঘরে শোভা পায়। তা ছাড়া তোমাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে বিপুল ধন-সম্পদ।

প্রথমত কমান্ডার রজব ভাই ও তার সঙ্গীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ উস্কে দেয়া হলো। এরপর গযনী সেনাদের হাতে সেলজুকীদের নিহত হওয়ার ঘটনাটিকে চরম নৃশংস কাহিনী বানিয়ে তাদেরকে গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হলো। সেই সাথে তাদের সামনে হাজির করা হলো দু'জন অপরূপ সুন্দরী যুবতী।

উপজাতি সেলজুকী বংশের কোন যুবকের পক্ষে এমন শিক্ষিত ও অভিজাত মেয়েকে বিয়ে করার বিষয়টি কল্পনা করার সাধ্যও ছিলো না। সুন্দরী দুই যুবতীকে দেখে রজব ও তার সঙ্গীর চোখ ছানাবরা। তাদের সামনে এমন

অর্থসম্পদ রাখা হলো যে এতো বিপুল সোনা দানা একত্রিত করার কথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। সেই সাথে বিশাল সালতানাতে সেলজুকীদের সেনাপতি ও ডেপুটি সেনাপতি হওয়ার বিষয়টি কমাণ্ডার হিসেবে তাদের কাছে এতোটাই লোভনীয় ছিল যে, বিষয়টি তারা কেবল স্বপ্নে ভাবতে পারতো, কিন্তু কোন দিন বাস্তবে রূপলাভ করার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেলজুকী সালতানাত হলে এমন অধরা স্বপ্নই তাদের হাতের মুঠোয় ধরা দেবে এই ভাবনায় তারা উৎসাহী হয়ে উঠলো।

এর পরের ঘটনা খুবই দ্রুত ঘটতে শুরু করলো। ছুটি সংক্ষিপ্ত করে সুন্দরী স্ত্রী সাথে নিয়ে কমান্ডার রজব ভাই ও তার সঙ্গী কমান্ডার ফরীদ সেলজুকী গযনী সেনাবাহিনীতে ফিরে এলো। অল্পদিনের মধ্যেই তারা কর্মরত সেলজুকীদেরকে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে সুকৌশলে ক্ষেপিয়ে তুলতে সক্ষম হলো। আসলে সেলজুকীদেরকে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার পেছনে কমান্ডার রজব ও ফরীদের চেয়ে তাদের স্ত্রী পরিচয়দানকারী ইহুদীদের হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুই সুন্দরীর ভূমিকাই ছিলো বেশী।

রজব ও ফরীদের স্ত্রী বাছাই করে করে এককে জন সেলজুকী সৈনিককে তাদের খালি ঘরে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসতো এবং তাদের রূপ সৌন্দর্যের ঝলক দেখিয়ে, নগদ সোনা দানা, ক্ষমতা ও জায়গা জমির লোভ দেখিয়ে সহজেই তাদের ফাঁদে আটকাতে সক্ষম হতো। দুই সুন্দরী সেলজুকী সৈন্যদের ডেকে সেলজুকীদের উপর গযনী বাহিনীর জুলুম, অত্যাচার, গযনী বাহিনীর হাতে সেলজুকীদের নিহত হওয়ার ব্যাপারটি আবেগ, মমতা ও কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে উপস্থাপন করে প্রতিটি সেলজুকী সৈনিকের মনে জাতীয়তাবোধ উস্কে দিতে সক্ষম হয়। ফলে সেলজুকী সৈনিকদের ইসলামী চেতনা বিলীন হয়ে সেখানে জন্ম নেয় প্রতিশোধ প্রতিহিংসা স্বজাতি হত্যা, বঞ্চনার প্রতিশোধ স্পৃহা আর স্বাধীন সেলজুকী সালতানাত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রতিটি সেলজুকীর রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়।

শিক্ষণীয় ব্যাপার হলো, কোন নারী যদি কোন পুরুষের মধ্যকার পৌরুষ ও হিংস্রাতাকে উস্কে দিতে চায় তা সহজেই পারে। কেননা, একজন পুরুষের পৌরুষ, সাহস ও শক্তিকে যখন কোন নারী প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় তখন পুরুষ মাত্রই সেটিকে অপমানজনক মনে করে এবং প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে। সেলজুকীদের ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটলো। খুব সহজেই ইহুদীদের ক্রীড়নক দুই সুন্দরী তরুণী তাদের রূপ সৌন্দর্য ও বাক চাতুর্যের ফাঁদে ফেলে সেলজুকীদের গযনী বাহিনীর জন্যে আত্মঘাতি যোদ্ধায় পরিণত করলো।

১০২০ খ্রিস্টাব্দের গ্রীস্ম মৌসুমে সুলতান মাহমূদ যখন পুনর্বার হিন্দুস্তান অভিযানে রওয়ানা হলেন, তার সেনাবাহিনী পরিচয়েই তার কাফেলার অংশ হয়ে গেলো গযনী বাহিনীর চরম শত্রু সেলজুকী কুচক্রী। এদের সহযোগী হিসেবে আত্মপরিচয় গোপনকারী কয়েকজন হিন্দুও রওয়ানা হলো কোচওয়ান ও কমান্ডারদের একান্ত সেবকের বেশ ধারণ করে।

এসব হিন্দু ছিল গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী গোড়া হিন্দু পরিবারের লোক। এদেরকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া হলো, কখন তাদেরকে কি ভূমিকা পালন করতে হবে।

গযনীর সৈন্যরা যখন হিন্দুস্তানের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করল, তখন এই হিন্দুদের অবস্থা হলো অনেকটা পানি থেকে তুলে নেয়া মাছকে পানীতে পুনর্বার ছেড়ে দেয়ার মতো। হিন্দুস্তানের মাটি মানুষের গন্ধে এরা যেন প্রাণ ফিরে পেলো। তাদের দেমাগ তখন আরো বেশী সক্রিয় ও সতর্ক হয়ে গেলো এবং নিজেদেরকে তারা হিন্দুত্ববাদ রক্ষার অতন্ত্র প্রহরী ভাবতে শুরু করলো। যে কোন মূল্যে সেলজুকীদের দিয়ে সুলতান মাহমূদকে ধ্বংস করার বিষয়ে তারা হয়ে উঠলো ঘরের শত্রুবিভীষণ।

* * *

এদিকে হিন্দুস্তানের অবস্থা খুব দ্রুত গযনী সরকারের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছিল। রাড়ীতে মহারাজা রাজ্যপাল এক বিভ্রান্ত তরুণীর হাতে নির্মমভাবে খুন হয়। এই খুনের নেপথ্য শক্তি ছিল তিন হিন্দু রাজার চক্রান্ত। রাজ্যপালের ছেলে লক্ষণপাল ছিল অন্যান্য হিন্দু রাজাদের সহযোগী। কিন্তু রাড়ীর হিন্দু সৈন্যরা ছিল গযনী সরকারের নিয়োগকৃত কমান্ডারদের আজ্ঞাবহ। তাদের পূর্বানুমতি ছাড়া রাড়ীতে রাজ্যপালের এবং তার সেনাদের কোন কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। সর্বক্ষেত্রেই রাজ্যপালের প্রশাসনকে গযনীর কমান্ডারদের কাছে জবাবদেহি করতে হতো। ফলে লক্ষণপালের পক্ষে হাত পা নাড়ানো ছাড়া কার্যত কোন কিছু ঘটানোর সুযোগ ছিল না।

কিন্তু সবসময় মুসলিম আধিপত্য খর্ব করে নিজেদের হারানো গৌরব ও জৌলুস ফিরে পাওয়ার চিন্তায় বিভোর থাকতো লক্ষণপাল।

চক্রান্তমূলকভাবে মহারাজা রাজ্যপাল নিহিত হওয়ার পর চক্রান্ত উন্মোচন করতে রাড়ীতে নিয়োজিত গযনী বাহিনীর লোকেরা চক্রান্তে জড়িত সন্দেহভাজনদের ধরপাকড় শুরু করলে এই ধরপাকড় বিদ্রোহে রূপ নিলো। কিন্তু

ব্যাপক আকারের বিদ্রোহ দমনের মতো জনবল গযনী বাহিনীর হাতে ছিল না। কারণ, রাড়ীকে গযনীর নিয়ন্ত্রনণে রাখার জন্যে মাত্র কয়েকজন সেনা কমান্ডার এবং কর্মকর্তা ছিল।

রাজ্যপাল নিহতের পর ধরপাকড় শুরু হলে লক্ষণপাল তার পক্ষের সেনাদের অতি গোপনে প্রস্তুত করে ফেলে এবং রাতের বেলায় তার নিয়ন্ত্রিত সেনাদের দিয়ে গযনীর কর্মকর্তা ও সেনা কমান্ডারদের গ্রেফতার করে রাড়ীকে স্বাধীন ঘোষণা করে লক্ষণপাল নিজেকে স্বাধীন রাজা ঘোষণা করে। রাড়ীতে নিয়োজিত গযনীর সকল কমান্ডার কর্মকর্তা লক্ষণপালের সেনাদের হাতে গ্রেফতার হলেও কোনভাবে একজন সেনা কমান্ডার পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সে দ্রুত কন্নৌজের দিকে পালাতে থাকে। কিন্তু কন্নৌজের পথে পূর্ব থেকেই হিন্দু সৈন্যরা অবস্থান নিয়েছিল। ফলে এই কমান্ডারও ধরা পড়ে। কন্নৌজ ও রাড়ীর মধ্যখানে যে সৈন্যরা অবস্থান নিয়েছিলো এরা ছিল তিন রাজ্যের সম্মিলিত সৈন্য।

কালাঞ্জরের রাজা গোবিন্দ, গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন, লাহোরের রাজা তরলোচনপালের সৈন্যরা ছাড়াও কন্নৌজের পরাজিত সৈন্যরাও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। তা ছাড়া রাড়ীর কিছু সৈন্যও এদের সঙ্গে ছিল। মূলত একটি সম্মিলিত বাহিনী ও গণফৌজ তৈরী হয়েছিল গযনীর বিরুদ্ধে। তিন ক্ষমতাধর হিন্দু রাজার সৈন্যরা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা ছিল স্বেচ্ছা সেবক হিসাবে। এরা হিন্দুত্ববাদ রক্ষা ও ক্রমবর্ধমান গযনী সালতানাতের শক্তিকে নিঃশেষ করে দিতে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। কোন ঐতিহাসিক এদের প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখ করতে পারেননি। শুধু এতটুকু বলেছেন, স্বেচ্ছাসেবীদের সংখ্যা ছিল সম্মিলিত তিন বাহিনীর সংখ্যার চেয়েও বেশি।

যে জাতির দেবালয় গুড়িয়ে দিয়ে দেবদেবীদের মূর্তিগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে রাস্তায় মিশিয়ে দিয়েছে গযনী বাহিনী, যে জাতির সবচেয়ে পবিত্র স্থান মথুরার হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী মন্দির ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে মুসলমান সৈন্যরা, সেই জাতি স্বভাবতই মুসলমানদের ব্যাপারে নির্বিকার থাকার কথা নয়। নির্বিকার ছিল না তারা। মুসলমানদের হাতে পরাজিত হিন্দু রাজা মহারাজা এবং এলাকার ছোট বড় প্রতিটি হিন্দু ভেতরে ভেতরে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্যে তৈরী হচ্ছিল।

হিন্দু নারীরা তাদের সখের অলংকারাদি পুরোহিতদের হাতে সঁপে দিয়েছিল, যুদ্ধ তহবিলের ঘাটতি কমাতে। হিন্দু পুরোহিত ঠাকুরেরা সমাজে প্রচার চালাচ্ছিল মুসলমানদের পরাজিত করতে জীবন-সম্পদ উৎসর্গ না করলে হিন্দু জাতি দেবদেবীদের অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

পুরোহিত ঠাকুররা যা বলে তা আসলে কতটুকু বাস্তব? সাধারণ হিন্দুরা এ ব্যাপারে কখনো প্রশ্ন তুলেনি। হিন্দুরা এ ব্যাপারটিও যাচাই করে দেখার প্রয়োজনবোধ করেনি সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তান আক্রমণের প্রথম দিনেই একদল হিন্দুর সামনে কয়েকটি মূর্তিকে টুকরো টুকরো করে বলেছিলেন— এই দেখো তোমাদের দেবতার অবস্থা! সত্যিই যদি এদের কোন শক্তি থাকে তাহলে এদের বলো, আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে। আমরা যে এদের অপমান করছি এজন্য আমাদের শাস্তি দিতে।

* * *

১০০১ সালে, প্রায় বিশ বছর আগে সুলতান মাহমূদ প্রথম হিন্দুস্তানে মূর্তি ভেঙেছিলেন। এরপর তিনি একে একে মথুরা থানেশ্বর মহাবন কন্নৌজের হাজার বছরের প্রাচীন মন্দিরগুলো ধ্বংস করে এগুলোর টুকরো রাস্তায় ফেলে উপর দিয়ে সেনাবাহিনীর ঘোড়া চালিয়ে দেন। হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল এই মূর্তিরূপী দেবদেবীরাই ভারতের সুখ সমৃদ্ধির নিয়ামক।

এসব দেবদেবীদের মূর্তি না থাকলে কোন হিন্দুর অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু বিগত বিশ বছর ধরে একের পর এক মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করে, হরেকৃষ্ণ হরিদেব এবং দশহাত বিশিষ্ট সরস্বতীর ধ্বংসযজ্ঞের পরও এ পর্যন্ত কোন মুসলমানের কিছুই হলো না। দেবদেবীরা কোনই প্রতিকার কিংবা মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারলো না। এর পরও কুসংস্কার ও কল্পনাবিলাসী হিন্দু জাতিকে চরম ধোঁকাবাজ ঠাকুর ও পুরোহিতেরা অন্ধত্বের এমন গ্যাঁড়াকলে বেঁধে রাখলো যে, হিন্দুরা একটু জোরে বাতাস প্রবাহিত হলেও হাত জোড় করে ভজনা করতে শুরু করে। আর ভাবতে থাকে, এটাই বুঝি দেবদেবীদের ক্রোধ। এরা এমনই অন্ধ ছিল যে, এসব মূর্তির পূজা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে ঘরের সকল ধন-সম্পদ অকাতরে ঠাকুরদের হাতে তোলে দিয়েই ক্ষান্ত হতো না, নিজেদের কুমারী মেয়েদেরকে নরবলি দেয়ার জন্যে পুরোহিদের হাতে তোলে দিতো। আজ থেকে কয়েকশ বছর আগে গযনীর মুসলমানদের প্রতি তৎকালীন ভারতের হিন্দুদের যে ক্ষোভ, হিংসা ও শত্রুতার মনোভাব ছিলো হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের তেমন হিংসাত্মক মনোভাব ছিলো না।।

সুলতান মাহমূদের এবারের ভারত অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়লে সুলতান মাহমূদকে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্যে হিন্দুস্তানের সকল রাজা, মহারাজা এবং বিজিত এলাকার সকল হিন্দু প্রজা এক কাতারে শামিল হয়ে মুসলমানদের

পরাজিত করতে ধন-জন এবং জীবন উৎসর্গ করার ঘোষণা দিলো। যে সব পুরুষ অশ্বচালনা, তীরন্দাজী, তরবারী চালনা ও বল্লম চালাতে জানতো তারা সবাই সেনাবাহিনীতে যোগ দিলো। অবস্থা এমন হলো যে, যুবতী মেয়েরা পর্যন্ত মুসলমানদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে গেলো। মন্দিরের ঘণ্টা অনবরত বাজতে থাকলো এবং মন্দিরের শিংগা ভয়ংকর শব্দে চিৎকার করতে লাগলো।

দৃশ্যত গযনীর সৈন্যদের ব্যাপারে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু রাজপুতদের মধ্যে ততোটা আতংক ছিলো না।

রাজপুতেরা হিন্দুত্ববাদ ও হিন্দুদের ঐতিহ্য রক্ষার্থে এবং গযনী বাহিনীকে ঠেকাতে জীবন বিলিয়ে দেয়াটাকে অতি স্বাভাবিক ব্যাপার মনে করতো। রাজপুতনা হিন্দুদের মধ্যে তখন বিরাজ করছিলো জীবন দেয়ার উন্মাদনা। এই যুদ্ধ উন্মাদ স্বেচ্ছাসেবীরা গযনী বাহিনীর সামনে পাহাড়ের মতো প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালো।

তিন মহারাজার সম্মিলিত বাহিনীতে ছিল এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার পদাতিক সেনা, ছত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং ছয়শ বিয়াল্লিশটি জঙ্গি হাতি।

পেশোয়ার অতিক্রম করার পর থেকেই সুলতান মাহমূদের কাছে নিয়মিত খবর আসছিল হিন্দুদের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে। গোয়েন্দারা জানিয়ে দিয়েছিল গযনী বাহিনীর তুলনায় শত্রু বাহিনীর সংখ্যা তিনগুণেরও বেশী। আরো খবর আসছিল হিন্দু সেনারা কোথায় কোথায় অবস্থান নিয়েছে।

সুলতান মাহমূদ তার সেনাদল নিয়ে চন্নাব নদী পার হচ্ছিলেন। ঠিক এই সময় খবর এলো, রাড়ীতে লক্ষণপালের সেনারা মুসলমান কর্মকর্তা ও কমাণ্ডারদের বন্দি করে রেখেছে। কন্নৌজ দুর্গও অবরুদ্ধ হওয়ার আশংকা আছে।

ঠিক এর পর পরই খবর এলো, কন্নৌজ অবরোধের সম্ভাবনা নেই। কারণ, মহারাজা অর্জুনও মহারাজা গোবিন্দ বিপুল জনশক্তির বলে খোলা ময়দানেই গযনী বাহিনীর মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। এক গোয়েন্দাকে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, লাহোরের সৈন্যরা কোথায় আছে?

যমুনার তীরবর্তী কোন ঘন জঙ্গলে— জবাব দিল গোয়েন্দা। লাহোরের সৈন্যরা ঠিক কোথায় তাঁবু ফেলেছে তা জানা সম্ভব হয়নি সুলতান! তবে জানার চেষ্টা অব্যাহত আছে। লাহোরের সেনাদের বিষয়টিই বেশী ঝুকিপূর্ণ। কারণ, এরা কোন দিক থেকে কিভাবে হামলা করবে এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

ঠিকই বলেছো তুমি— গোয়েন্দাকে বললেন সুলতান। এদের বিষয়টি আমাকে খুব ভাবনায় ফেলেছে। আমি এদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই।

তৎকালীন কয়েকটি ইতিহাসগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিক স্মিত লিখেছেন— রাড়ীতে গযনীর কর্মকর্তারা বন্দি হয়েছে— এ খবর পাওয়ার পর পাঁচটি নদী পাড়ি দিয়ে দুই দিনের মধ্যে সুলতান মাহমূদ রাড়ী এলাকায় পৌঁছে গেলেন এবং কোন বিশ্রাম না নিয়েই রাড়ী আক্রমণ করলেন। আক্রমণের সাথে সাথে সুলতানের কাছে খবর এলো, মুসলিম সৈন্য ও কর্মকর্তাদেরকে হিন্দুরা হত্যা করেছে। একথা শুনে সুলতান রাড়ীকে সম্পূর্ণ মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তাই ঘটলো। রাড়ীতে যে হিন্দুবাহিনী ছিলো এদের পক্ষে প্রাথমিক আক্রমণ সামলানোও সম্ভব হলো না। রাড়ীকে এভাবে ধ্বংস করে দেয়া হলো যে, সেখানে সকল বাড়ি ঘর ভেঙে ফেলা হলো। মন্দিরগুলোকে সম্পূর্ণ ভেঙে চুড়ে ধ্বংসাবশেষও নদীতে নিক্ষেপ করা হলো।

আসল যুদ্ধ তখনো শুরু হয়নি। সুলতানের কাছে অনবরত রাজা গোবিন্দ ও রাজা অর্জুনের সেনাদের খবরাখবর আসছিল। সুলতান মাহমূদ ভাবছিলেন কিভাবে এদের মোকাবেলা করবেন। এক সাথে উভয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বেন, না দুই বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবেন।

সুলতান যখন এমন চিন্তায় বিভোর তখন প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ সুলতানের উদ্দেশ্যে বললেন— সম্মানিত সুলতান! লাহোরের সেনাদের অবস্থান জানা যায়নি। আশংকা কিন্তু এদের থেকেই বেশী। হতে পারে এরা পেছন থেকে আমাদের উপর হামলা করবে।

সুলতান মাহমূদও প্রধান সেনাপতির মধ্যে যখন এসব কথা হচ্ছিল, তখন হঠাৎ গযনী সেনাদের মধ্যে শোরগোল দেখা দিল। সুলতান মাহমূদ দ্রুত তাঁবু থেকে বেরিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে বললেন, দ্রুত গিয়ে শোরগোলের কারণ জেনে এসো।

নিরাপত্তারক্ষীরা ঘুরে এসে যে খবর দিলো তাতে বেশ অবাক হলেন সুলতান। নিরাপত্তারক্ষীরা জানালো, চার কমান্ডার ও চার সৈনিক চামড়ার থলের মধ্যে হাওয়া ভরে এগুলোতে ভর করে নদী পারাপারের জন্যে নদীতে ঝাপ দিয়েছে এবং নদী পেরিয়ে গেছে।

সুলতান ও প্রধান সেনাপতি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই আট সেনা হয়তো পালিয়ে গেছে এবং এরা গিয়ে শত্রু বাহিনীতে যোগ দিবে। এদেরকে পিছু ধাওয়ার ব্যাপারটি সহজ ছিলো না। তবুও কয়েকজন সাহসী যোদ্ধাকে নির্দেশ

দেয়া হলো, তারাও যেনো পানির থলের মধ্যে হাওয়া ভরে নদী পেরিয়ে ওদেরকে পাকড়াও করতে চেষ্টা করে। যদি সাহায্যের দরকার হয় তবে যেনো সংকেত দেয়। যাতে আরো সহযোগী পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায়।

একে তো শীতের মওসুম, তদুপরী রাতের অন্ধকার। সেই সাথে বরফ শীতল ঠাণ্ডা পানি। রাতের অন্ধকারে ঠাণ্ডা পানিতে সাঁতার কাটা সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সবকিছুকে উপেক্ষা করে বারো তেরোজন সৈনিক স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে পানির থলিতে হাওয়া ভরে ততোক্ষণে নদীতে নেমে পড়েছে। শীত মওসুম হওয়ার কারণে নদীতে পানি কম ছিল এবং শ্রোতের তীব্রতাও বেশী ছিল না। দশ বারোজনের কাফেলা যখন নদীতে নেমে গেলো, তখন নদীর তীরে আবারো শোরগোল শোনা গেল। সেই সাথে নদীর ওপারে দেখা গেল আগুনের কুণ্ডলী। দেখে মনে হলো কোন বসতীতে আগুন লেগেছে।

অবস্থা দেখে প্রধান সেনাপতি নদীর তীরবর্তী লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, যারা প্রথমে নদী পার হয়েছে এরা কারা? তাকে তাদের নাম পরিচয় জানানো হলো। শুনে প্রধান সেনাপতি বললেন— মুহতারাম সুলতান! যারা প্রথমে নদী পার হয়েছে এরা পালিয়ে যাওয়ার লোক নয়। এদেরকে আমি ভালোভাবেই জানি, খুবই আবেগপ্রবণ। নিশ্চয়ই এরা শত্রুপক্ষের কোন তাঁবুতে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়েছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি দু'টি ইউনিট নিয়ে ওপাড়ে চলে যাই।

কিন্তু যাওয়ার আগে তো জানা দরকার ওখানে কারা আছে এবং কি অবস্থায় আছে? বললেন সুলতান। সেনা ইউনিট তুমি প্রস্তুত রাখতে পারো, যে কোন সময় কাজে লাগতে পারে।

এদিকে নদীর ওপাড়ের শোরগোল ক্রমশ বাড়তে থাকলো। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থলটি ছিল প্রায় তিন মাইল দূরে। সেখানকার শোরগোলের আওয়াজ কিছুটা এখানেও শোনা যাচ্ছিল। কারণ, রাতের পরিবেশ ছিল অনেকটাই শান্ত।

এভাবে কিছুটা সময় কাটার পর এক অশ্বারোহীকে নদীর পানি চিড়ে এ পাড়ের দিকে অগ্রসর হতে দেখা গেলো। লোকটি যখন এপাড়ে উঠে এলো তখন দেখা গেলো গযনী বাহিনীর যে চারজন নদী পেরিয়ে গিয়েছিল সে তাদেরই একজন। লোকটি ঘোড়ার পিঠের উপর বসে নদী পার হলো। লোকটি নদীর মাঝখানে থাকতেই চিৎকার করে বলছিল, সুলতান কোথায়? প্রধান সেনাপতি কোথায়? সবাই হামলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও। আগত এই সৈনিকের চিৎকারে ছিল চরম উত্তেজনা।

তীরে দাঁড়ানো লোকেরা সেই সৈনিককে থামিয়ে দিল। সুলতান ও প্রধান সেনাপতি আগে থেকেই নদীর তীরে ছিলেন। সৈনিককে যখন সুলতানের সামনে হাজির করা হলো, তখন জানা গেল, সে গযনী বাহিনীর একজন কমান্ডার। সে সুলতানকে যা জানলো, তা কিছুতেই সুলতানের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না।

আগন্তুক কমান্ডার জানালো— গযনী বাহিনীর এক গোয়েন্দা সন্ধ্যার পর এসে তাকে খবর দেয়, নদীর ওপাড় থেকে মাইল তিনেক দূরে লাহোরের সৈন্যরা তাঁবু ফেলেছে এবং তারা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। একথা শুনে সে তার সঙ্গী আরো তিন কমাণ্ডারকে সাথে নিয়ে ওপাড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তাদের এই পরিকল্পনার কথা শোনে আবেগপ্রবণ আরো কিছু সৈনিকও তাদের সহগামী হলো। সবাই মিলে পানির থলের মধ্যে বাতাস ভরে নদী পেরিয়ে শত্রুবাহিনীর তাঁবুতে চলে গেল। সংবাদবাহী গোয়েন্দাকে তারা গাইড হিসেবে সাথেই নিয়ে গেল। তারা সবাই শত্রুবাহিনীর তাঁবুতে গিয়ে ঝটিকা আক্রমণ চালালো।

আবেগ ও উত্তেজনায় কাঁপতে থাকা এই কমান্ডার অতি সংক্ষেপে তাদের অভিযানের কথা জানিয়ে সুলতানকে বললো, বেশী কিছু চিন্তা করার দরকার নেই সুলতান! আপনি সৈন্যদের নিয়ে চলুন, শত্রুকে পরাজিত করার এটাই মোক্ষম সময়।

একথা শুনে আগে থেকেই দু'টি সেনা ইউনিটকে নিয়ে প্রস্তুত থাকা প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈকে অভিযান চালানোর নির্দেশ দিলেন সুলতান। কমান্ডারের নির্দেশে আলতাঈর সহযাত্রী সৈন্যদের সংখ্যা বাড়ানো হলো। সহযোগী হলো আরো দু'টি অশ্বারোহী ইউনিট।

সবাইকে নিয়ে নদী পার হলেন প্রধান সেনাপতি। আগত কমান্ডার তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আলতাঈ যখন চারটি ইউনিট নিয়ে তাঁবু পল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন, তখন অধিকাংশ তাঁবুতে আগুন জ্বলছে। গোটা শিবির জুড়ে চলছে দৌড় ঝাপ আর চেচামেচি। আগুন দেখে আতংকিত হয়ে ঘোড়াগুলো এদিক সেদিক দৌড়াচ্ছে।

অবস্থা দেখে প্রধান সেনাপতি আলতাঈ তার অশ্বারোহী ইউনিটকে গোটা তাঁবু ঘিরে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। শত্রুবাহিনীর অবস্থা তখন খুবই বেসামাল। তাদের আত্মরক্ষার জন্যে পালানো ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। লাহোরের সৈন্যরা যে যার মতো করে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোন উট ঘোড়াই তাদের নাগালের মধ্যে ছিল না। ফলে দৌড়ে পালাতে গিয়ে

লাহোরের সৈন্যরা গযনী সেনাদের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হতে লাগল। যারা প্রতিরোধের চেষ্টা করলো তারা কাটা পড়ল, আর যাদের সামনে পালানো ও প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থাই ছিল না, তারা কোন কিছুর আড়ালে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগল।

লাহোরের সৈন্যরা যেহেতু পলায়নপর ছিল এজন্য দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করছিল। আর এদের ধাওয়া করছিল গযনীর সৈন্যরা। কিন্তু রাতের অন্ধকারে একেকজন সৈন্যের পিছু ধাওয়া করে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না বলে আলতাঈ সবাইকে সতর্ক করে দিলেন। সংবাদবাহী সৈন্যদের বললেন, সবাইকে বলে দাও, তারা যেন কারো পিছু ধাওয়া না করে। তাঁবুর আশপাশে থেকে লড়াই করে। এভাবেই কেটে গেল রাত।

সকাল বেলায় সূর্য উঠার পর দেখা গেল তাঁবু এলাকার ভয়াবহ দৃশ্য। জায়গায় জায়গায় অর্ধদগ্ধ সৈনিক, নিহতদের স্তূপ আর আহতদের কাতরানোর করুণ অবস্থা। অনেক হিন্দু সৈনিক ভয় ও আতংকে হত বিহবল হয়ে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে আং মরার মতো পড়েছিল। পালানোর সাহস পাচ্ছিল না। ভোরের আলোয় এরা মুসলিম সৈন্যদের হাতে ধরা পড়লো। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সেনাপতি আলতাঈ নিশ্চিত জানতে পারলেন, এরাই হলো সেই লাহোরের সেনাবাহিনী। রাতের বেলায় মহারাজা তরলোচনপালও এদের সাথেই ছিল। কিন্তু মুসলমানদের আক্রমণ টের পেয়ে সেনাপতি ও তরলোচনপাল পালিয়ে যায়।

আগের দিন বিকেলেই লাহোরের এই সেনারা এখানে এসেছিল। এদের নিয়েই বেশী চিন্তিত ছিলেন সুলতান। অবশ্য ধৃত কোন হিন্দু সৈনিক তাদের এখানে নিয়ে আসার কোন কারণ বলতে পারেনি। তবে সৈনিকরা কিছু বলতে না পারলেও গযনী বাহিনীর এতো কাছাকাছি অবস্থান নেয়া থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল, সুলতান মাহমূদ যদি কারো সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেন তাহলে তরলোচনপাল পেছন দিক থেকে গযনী বাহিনীকে আক্রমণ করতো।

রাজা তরলোচনপাল ও তার উর্ধ্বতন সেনাকর্মকর্তাদের কাউকে তাঁবুতে পাওয়া যায়নি। লাহোর বাহিনীর কর্মকর্তারা শুধু পালিয়ে যায়নি, ছেড়ে গেছে সকল সেনা আসবাবপত্র, ঘোড়ার গাড়ি। সবই আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সৈন্যরা হয় কাটা পড়েছে নয়তো ধরা পড়েছে কিংবা আহত হয়েছে। ফলে লাহোর বাহিনীর পক্ষ থেকে আর কোনপ্রকার আক্রমণের আশংকা রইলো না।

এক ইংরেজ ঐতিহাসিক তৎকালের মুসলিম ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, তরলোচনপাল রামগঙ্গা নামের একটি খরস্রোতা নদীর ওপাড়ে অবস্থান নিয়ে ছিলো।

এটি ছিল সুলতানের আট সৈনিকের একটি যুগান্তকারী বীরত্বপূর্ণ ঘটনা। মাত্র আটজন যোদ্ধা প্রায় বিশ হাজার সৈন্যের শিবিরে অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলো। যা ছিল বিশাল এক তাঁবুপল্লী। সুলতান মাহমূদ এই আট যোদ্ধাকে পরদিনই বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করলেন। কারণ, এই আটজনের ঝটিকা আক্রমনের পেছনে কোন উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তার নির্দেশনা ছিলো না। তারা স্বউদ্যোগেই এমনটি করেছিল। ঝটিকা আক্রমনের বিস্তারিত বর্ণনা সেই সময়কার ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে এভাবে লেখা হয়েছে—

কমান্ডাররা বললো, সুলতান প্রায়ই লাহোরের সৈন্যদের ব্যাপারটি আলোচনা করতেন। লাহোর বাহিনীকে তিনি খুবই ঝুকিপূর্ণ মনে করছিলেন। তা ছাড়া রাড়ীতে হিন্দুরা গযনীর সেনা কমান্ডার ও কর্মকর্তাদের হত্যা করেছে। এ নিয়ে সুলতান খুবই বিচলিত ছিলেন। রাজা তরলোচনপালের প্রতি সুলতান ছিলেন খুবই রাগান্বিত। মৈত্রী চুক্তি থাকার পরও সে অন্য হিন্দু রাজাদের গযনীর বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছে এবং পেছন দিক থেকে গযনী বাহিনীর উপর আক্রমণ করার জন্যে তার সেনাদেরকে লুকিয়ে রেখেছে।

ঘটনাক্রমে সেই দিন সন্ধ্যায় গযনীর এক গোয়েন্দা নদী পার হয়ে এপাড়ে উঠছিল। সে সময় এক কমান্ডার নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ছিল। কমান্ডার ছিল গোয়েন্দার পরিচিত। ফলে বন্ধুকে পেয়ে সে আনন্দ চিত্তেই বলে দিল— বহু প্রত্যাশিত একটি কাজ আমি করে এসেছি। দীর্ঘ দিন অনুসন্ধানের পর আজ আমি লাহোরের সেনা শিবির দেখে এসেছি।

একথা শুনে কমান্ডার আবেগে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সে কথাটি তার তিন সহকর্মী কমান্ডারকে জানালো। তারাও মনের মধ্যে বিরাট উত্তেজনা অনুভব করলো এবং অভিযানের জন্যে তৈরী হয়ে গেল। বিষয়টি এদের পাশে থাকা চার সৈনিক শুনে তারাও সহযাত্রী হতে উৎসাহী হলো। ফলে তৈরী হয়ে গেল আটজনের কাফেলা। কোন উপায় না পেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে পানির থলের মধ্যে বাতাস ভরে তাতে ভর করে নদী পেরিয়ে গেল তারা। এরাই সংবাদ সংগ্রহকারী গোয়েন্দাকে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উজ্জীবিত করলো। ফলে সেই কমান্ডার ও সেনারা একাকার হয়ে সুলতানের কাছে খবর না পৌঁছিয়েই ঝটিকা অভিযানে বেরিয়ে পড়লো।

যে চারজন কমান্ডার অভিযানে গিয়েছিল এরা ছিল রাতের ঝটিকা আক্রমণে পারদর্শী। তরলোচনপালের শিবিরের নিরাপত্তা বলয়ের ভেতরে গিয়ে তারা প্রথমে দু'জন প্রহরীকে হত্যা করল। এরপর একটি তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিল। সাথে সাথে আগুন জ্বলে উঠলো। তারা দ্রুত কিছু কাপড়ের টুকরোতে আগুন ধরিয়ে সারিবদ্ধভাবে তৈরী তাঁবুগুলোর দিকে নিক্ষেপ করতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে এক সঙ্গে অনেকগুলো তাঁবুতে জ্বলে উঠলো আগুন। অপর দিকে দু'জন সেনা অতি সংগোপনে অনেকগুলো ঘোড়ার রশি খুলে দিল। কয়েকটি ঘোড়াকে খঞ্জর দিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করল। বন্ধনমুক্ত ও আহত ঘোড়াগুলো আতংকিত হয়ে দিগবিদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করলো এবং তীব্র হ্রেষারব করে অপর ঘোড়াগুলোর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে দিল।

গযনীর ঝটিকা আক্রমণকারীরা যখন আক্রমণ করেছিলো তখন লাহোরের সেনারা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল। অগ্নি সংযোগের ব্যাপারটি দুর্ঘটনা না শত্রু বাহিনীর আক্রমণ তা বুঝতে তাদের অনেক সময় লেগে গেল। ততোক্ষণে গোটা শিবিরেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। লাহোর বাহিনীর তাঁবু ছিল খুব ঘন। একটির সাথে একটি লাগানো। দুপাশে পাহাড় আর মাঝখানে একটি সংকীর্ণ সমতল জায়গায় গাদা গাদি করে কয়েক হাজার তাঁবু খাটিয়ে ছিল তারা। ফলে দ্রুত একটির আগুন আরেকটিতে ছড়িয়ে পড়ল। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময় তীব্র বাতাস বয়ে যাওয়ায় আগুন আরো ছড়িয়ে পড়েছিল।

সাফল্যের সাথে লাহোর শিবিরে অগ্নিসংযোগ করে গযনী বাহিনীর মরণজয়ী যোদ্ধারা পাশের পাহাড়ের উপড়ে উঠে গেল এবং দৌড় ঝাপরত হিন্দু সেনাদের উপর এলোপাথাড়ী তীর ছুড়তে লাগলো। তীর ধনুক তারা নিজেদের সাথে নিয়ে গিয়েছিল।

এই সময় একজন কমান্ডারের মাথায় এলো, আমরা যদি আমাদের সেনাবাহিনীকে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে এই অবস্থায় এদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব। একথা সে তার সাথীদের জানিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নেমে এলোপাথাড়ী ঘুরতে থাকা যে ঘোড়াগুলো দূরে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অগ্নিকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছিল এমন একটি ঘোড়াকে ধরে সেটির পিঠে চড়ে নদীর তীরের দিকে ঘোড়া ছুটাল। এই কমান্ডারই নদী পেরিয়ে এসে প্রধান সেনাপতি ও সুলতানকে খবর দেয়। সুলতান প্রধান সেনাপতিকে চারটি অশ্বারোহী ইউনিটকে নিয়ে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন।

* * *

কালাঞ্জরের রাজা গোবিন্দ তার সেনাদের নিয়ে কালাঞ্জর ছেড়ে আসার খবর সুলতান মাহমূদের কাছে পৌছে যায়। সুলতান এ খবর পেয়ে তার সেনাদেরকেও অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। সুলতান কন্নৌজ থেকে কালাঞ্জরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি খবর পেলেন গোবিন্দের সেনাবাহিনী যমুনা নদী পেরিয়ে এসেছে। সুলতান মাহমূদের সৈন্যরা পথিমধ্যে মাত্র দু'টি বিরতি দিয়ে এলাহাবাদ নামক স্থানের কাছাকাছি পৌছে গেলেন। তাদের অবস্থান থেকে এলাহাবাদ খুব বেশি দূরে ছিল না। এদিকে রাজা গোবিন্দের সেনাদের অবস্থান মাত্র তিন চার মাইল দূরে ছিল।

এই সময় সুলতান মাহমূদের সেনাদের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা সেই চক্রান্তকারীরা তাদের চক্রান্তের চাল দিতে শুরু করল। চক্রান্তের মূল হোতা ছিল দুই সেলজুকী কমান্ডারের আত্মপরিচয় গোপনকারী স্ত্রী। এরা এই অভিযানে আসার শুরু থেকেই অন্যান্য মহিলাদের থেকে দূরে দূরে থাকতো। কেউ তাদের ব্যাপারে যাতে টের না পায় তাই এ ব্যবস্থা করেছিল তারা। এলাহাবাদ এলাকায় এসে যাত্রা বিরতি করলে এরা সক্রিয় হয়ে উঠে।

এক রাতে আম্বরী পায়চারী করতে করতে তার তাঁবু থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছিল। হঠাৎ তার কানে মানুষের ফিসফিসানির আওয়াজ ভেসে এলো। কেন জানি আম্বরীর মনের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধলো। সে ব্যাপারটি বোঝার জন্য পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে সেই ফিসফিসানির দিকে অগ্রসর হলো। কিছুটা অগ্রসর হলে সে শুনতে পেলো একজন মহিলার অনুচ্চ আওয়াজ। খুবই সতর্কভাবে কথা বলছে। কি বলছে তা পরিষ্কার শুনতে পেল আম্বরী। চাদনী রাত। বাইরে কিছুটা আলো আধারী অবস্থা। আম্বরী শুনতে পেল—

আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না। লাহোরের সৈন্যরা তো ধোঁকায় পড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে— বলছিল এক মহিলা। তোমরা বলছো, মহারাজা গোবিন্দের সৈন্যরা আসছে। তাই যদি সত্যি হয় তবে কোচওয়ান দু'জনকে পাঠিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা কর। যোগাযোগ হয়ে গেলে পরবর্তী কাজ লড়াই শুরু হলে করা যাবে।

আমি কিন্তু সকলকেই সতর্ক করে দিয়েছি। আমাদের কি করতে হবে তাও বলে দিয়েছি— বললো এক পুরুষ।

তুমি কাজের লোক। এজন্যই তো আমি তোমাকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি। আমি তো তোমারই। ও তো শুধু নামের স্বামী আসল স্বামী তুমি। বললো সেই নারী।

এসময় কারো পায়ের শব্দ শোনে পুরুষটি একটু দূরে সরে গেল। আম্বরীও তার জায়গা থেকে কয়েক কদম পিছিয়ে এলো। কিন্তু নারীটিকে চেনার জন্য সে কোন দিকে যায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখল আম্বরী। যে দিকে মহিলাদের তাঁবু ছিল সেদিকেই মহিলাটি আসছিল। নিজেকে আড়াল করার জন্যে আম্বরী একটি ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল। মহিলা যখন কাছাকাছি এলো, তখন আম্বরী বসা থেকে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে মনে হয়, সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে এসেছিল। মহিলাকে দেখে আম্বরী হতবাক!

দোশীন! আমি ভুল করছি না তো? মহিলাকে চিনতে পেরে বললো আম্বরী।

আরে! আম্বরী না? কার সাথে যুদ্ধে এসেছো? ও! ওই লোকটার সাথে এসেছো মনে হয়, যার সাথে পালিয়ে এসেছিলে? বললো দোশীন।

তুমিও হয়তো পালিয়েই এসেছো? কোন খান মেয়েকে গযনী সৈনিকের সাথে দেখলে আসলে আশ্চর্যই লাগে— বললো আম্বরী।

আচ্ছা! তোমার স্বামী কে? দোশীনকে জিজ্ঞেস করলো আম্বরী।

কমান্ডার রজব ভাই? সে সেনাবাহিনীর কমান্ডার জান না?

এভাবে বলছো কেন? রজব সেলজুকী বলো না। আমি তাকে চিনি। তার সাথেই এসেছো তাহলে? বললো আম্বরী।

আমি অন্য কারো সাথে আসিনি। এসেছি স্বামীর সাথে— বললো দোশীন।

হেসে ফেললো আম্বরী। বললো, আমি চিনি রজবকে। তুমি যার সাথে কথা বলছিলে সে রজব ছিল না। আজ কোন কমান্ডারের এ সময়ে এখানে থাকা সম্ভব নয়। আমার স্বামীও কমান্ডার। আমি জানি তাদের কারো পক্ষে এই মুহূর্তে এদিকে আসা সম্ভব নয়।

দোশীন! যাই করো না কেন বুঝে শুনে করো। সেনাবাহিনীর সাথে থাকতে হলে নিয়ত ঠিক রাখতে চেষ্টা করো।

একথা শুনে দোশীন আম্বরীকে জড়িয়ে ধরে হেসে বললো— তুমি ঠিকই বলেছো আম্বরী। লোকটি আসলে রজব ছিল না। তার এক বন্ধু তার খবর নিয়ে এসেছিল। তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছো? আমি গযনী সালতানাতের অনুগত ও বিশ্বস্ত। যদি গযনী সালতানাতের অনুগতই না হতাম তাহলে এখানে আসতাম না। আমাকে নিজের মতোই মনে করো। আমি গযনী বাহিনীর নিরাপত্তা ও বিজয়ের জন্যে সব সময়ে দু'আ করি— একথা বলে আম্বরীকে একটি হাসি উপহার দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল দোশীন। আম্বরী সেখানেই দাঁড়িয়ে ব্যাপারটি নিয়ে গভীর চিন্তায় পড়ে গেল।

মহারাজা গোবিন্দের সেনাদের অবস্থা জানার জন্য সুলতান মাহমূদ নিজেই এগিয়ে গেলেন। প্রধান সেনাপতি আলতাঈও তার সঙ্গে ছিলেন। সুলতান ঘোড়া থেকে নেমে একটি উঁচু গাছে চড়লেন। মহারাজা গোবিন্দের সেনা বাহিনী দেখে তার চক্ষু ছানাবড়া। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গারদীজী, ইবনুল আসির ও কারখী লিখেছেন— সুলতান মাহমূদ যখন মহারাজা গোবিন্দের সেনাবাহিনী দেখলেন, তখন তার উদ্বেগ আড়াল করতে পারলেন না। যতদূর দৃষ্টি গেলো সবখানে ছড়িয়ে ছিল সেনা শিবির, হাতি, ঘোড়া। জায়গায় জায়গায় খন্দক খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। ঐতিহাসিক আবুল কাসেম ফারিশতাও একথা সমর্থন করেছেন।

ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সুলতান মাহমূদ গোবিন্দের বিপুল সেনা সমাবেশ দেখে প্রধান সেনাপতিকে বললেন, নিজের দেশ ছেড়ে এতদূর আসাটা উচিত হয়নি। আমাদের জন্য কোন সেনাসাহায্য বা রসদপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। পিছু হটারও কোন ব্যবস্থা নেই। শত্রু বাহিনী তো আমাদেরকে কন্নৌজের দুর্গ পর্যন্তও পৌছতে দেবে না। আমাদের দুর্গ বন্দি হয়েই লড়াই করা উচিত।

আমি এই প্রথম সুলতানের কণ্ঠে পিছু হটার কথা শুনলাম— বলে মন্তব্য করেছিলেন আলতাঈ। এরপর সুলতানের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, শত্রু বাহিনীর জনশক্তি বিপুল। কিন্তু আমাদের পিছু হটার চিন্তা ত্যাগ করা উচিত সুলতান!

তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু ঠিক এই পরিমাণ সৈন্য গোয়ালিয়রেরও রয়েছে। ওরাও যদি এখানে এসে পড়ে তাহলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে? একথা বলতে বলতে নীরব হয়ে গেলেন সুলতান। কিছুক্ষণ এভাবে থেকে মৃদু মাথা ঝাড়া দিয়ে বললেন, তওবা তওবা! আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন! আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন! হায়! আমি আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলাম। আল্লাহ মহান। তিনিই জয় পরাজয়ের মালিক।

বিপদের সময় সুলতান যা করতেন, গাছ থেকে নেমে এবারও তাই করলেন। কিবলামুখী হয়ে দু'রাকাত নামায পড়লেন। তার সাথে যারা ছিল তারাও নামায পড়লো। তারপর সুলতান শিবিরে ফিরে এলেন।

মহারাজা গোবিন্দের সৈন্যদের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার পদাতিক, ছয়ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, এবং ছয়শো চল্লিশটি জঙ্গি হাতি ছিল। সে ছিল তার রাজধানী থেকে মাত্র এক দিনের দুরত্বে। তার রাজ্যের ছোট বড় সকল ধরনের লোকই যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে শরীক ছিল। গোটা হিন্দু জাতি ছিল ঐক্যবদ্ধ। এদিকে সুলতান মাহমূদের আল্লাহর উপর ভরসা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

সুলতান মাহমূদ শিবিরে গিয়ে সকল কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডারসহ সেনাকর্মকর্তাদের একত্রিত করলেন। তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, কোন দিন রণাঙ্গনে তোমরা আমাকে হতাশ করনি। খুব কঠিন ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তোমরা শত্রুদের পরাজিত করেছো। দুই গুণ, তিন গুণ জনশক্তির অধিকারী শত্রু বাহিনীকেও তোমরা হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছো। কিন্তু আজ তোমাদের সামনে পাহাড় দাঁড়ানো। তোমাদের একজনকে আমি বারোজনের সাথে মোকাবেলা করার নির্দেশ দিতে পারি না। তোমাদেরকে বিশাল হাতির সাথে মোকাবেলা করতে বলতে পারি না।

আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তোমরা এখানে একটা পবিত্র আকাঙ্খা নিয়ে এসেছো। আমি তোমাদের শুধু একথা বলে দিতে চাই, শত্রু বাহিনী যতো প্রবলই হোক না কেন আমাদের পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার কোন জায়গা নেই। পরাজিত হলে আমাদের অধিকাংশই নিহত হবো। আর যারা বেঁচে থাকবে তারা হবে হিন্দুদের কয়েদী। হিন্দুরা গযনীর যে কোন বন্দির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিটি পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে। তাদের দেবদেবীদের অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেবে।

আমরা পরাজিত হলে আমাদের প্রাণ সম্পদের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইসলাম। হিন্দু রাজারা গযনী দখল করে নেবে। তোমরা জীবিত না থাকলে বিজয়ী না হলে গযনী দখল থেকে হিন্দুদের বাধা দেয়ার কেউ থাকবে না। তখন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি হিন্দুরা দখল করে নেবে। আমাদের মা বোন কন্যারা হিন্দুদের বাদী দাসীতে পরিণত হবে। যে গযনী এখন ইসলামী সালতানাতের রাজধানী, হিন্দুরা সেটিকে মূর্তি পূজার রাজধানীতে রূপান্তরিত করবে। এদিকে হিন্দু শত্রু আর ওদিকে ইহুদী ও খৃস্টান শত্রু। ইহুদী ও খৃষ্টশক্তি মিলে আমাদের ক্ষমতালোভী আমীর উমারাদের বিভ্রান্ত করে ভেতরে ভেতরে আমাদের শক্তিকে ফোকলা করে রেখেছে। ফলে আমাদের চতুর্দিকে মুসলিম শাসন থাকলেও তারাও আমাদের ও ইসলামের ঘোরতর শত্রু।

হিন্দুরা যদি একবার গযনী পৌছে যেতে পারে তাহলে সকল কাফের বেঈমান মিলে কা'বা পর্যন্ত পৌছে যাবে। আর এমনটি হলে আল্লাহর কাছে আমাদের সবাইকে অপরাধী সাব্যস্ত হতে হবে।

তাই বলছি বন্ধুরা! আজ তোমরা আল্লাহর নির্দেশে লড়াই করবে। আল্লাহর নাম নিয়ে লড়বে, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে লড়বে। আল্লাহর রহমতের প্রতি শতভাগ ভরসা রেখে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বাকী কাজ আল্লাহ করে দেবেন।

একথা বলার পর সুলতান সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে শুরু করলেন। কোন ইউনিট কোন দিকে থাকবে এবং কিভাবে কোন কৌশলে মোকাবেলা করবে তা কমান্ডারদের বুঝিয়ে দিলেন।

গযনী বাহিনীর অবস্থানের ডান দিকে ছিল যমুনা এবং বাম দিকে ছিল গঙ্গা নদী। দুই নদীর মাঝখানের বিস্তৃতি কোথাও বিশ মাইল কোথাও চল্লিশ মাইল। সুলতান মাহমূদ চাচ্ছিলেন রাজা গোবিন্দের সেনাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করতে; কিন্তু দৃশ্যত এটা সম্ভবপর মনে হচ্ছিল না। তবুও তিনি তার পরিকল্পনা মতো সেনাদের দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়ে বললেন, প্রত্যেক কমান্ডার যেন তাদের অধীনস্ত প্রত্যেক সেনার কাছে তার এই বার্তা ও পয়গাম পৌঁছে দেয়।

* * *

এদিকে আম্বরী দোশীনের তাঁবুটি তখনই চিহ্নিত করে এলো। দোশীনের কার্যক্রমে আম্বরীর দৃঢ় বিশ্বাস হলো, সে শুধু তার স্বামীকেই ধোকা দিচ্ছে না, সুলতান মাহমূদের জন্যও মারাত্মক ধোঁকা হয়ে এসেছে। সেই রাতের প্রথম প্রহরে আম্বরীকে তার স্বামী উমর ইয়াজদানী শত্রুবাহিনীর বিপুলতা এবং সুলতানের উদ্বেগ ও তাঁর ভাষণ সম্পর্কে জানিয়ে দু'আ করতে বলে তখনই তাঁবু ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

আম্বরী তখনো তার স্বামী উমরকে জানায়নি, এখানে এক সেলজুকী কমান্ডারের স্ত্রী হয়ে এসেছে এক খান তরুণী। আম্বরী দোশীনকে ভালো ভাবেই জানতো। জানতো দোশীনের মন মানসিকতা এবং স্বভাবচরিত্র। ফলে সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না দোশীন ও তার সেলজুকী স্বামী গযনী সরকারের প্রতি অনুগত। কারণ, দোশীন ছিল একজন মারাত্মক কূট স্বভাব ও দুশ্চরিত্রের প্রতিমূর্তি। তাই আম্বরী সেই সন্ধ্যার পর থেকেই দোশীনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলো। আম্বরী তার কর্মচারীকেও বলে দিয়েছিল দোশীনের প্রতি কড়া নজর রাখতে এবং তার তৎপরতা সম্পর্কে সাথে সাথে তাকে জানাতে।

পরের রাতের ঘটনা। সন্ধ্যার পর আম্বরী তার তাঁবুতে একাকি বসে আছে। তার স্বামী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময় আম্বরীর কর্মচারী তাঁবুতে ঢুকে তাকে জানালো, সে দোশীনকে নদীর দিকে যেতে দেখেছে এবং তার পিছু পিছু দুইজন কোচওয়ানও নদীর দিকেই যাচ্ছে।

একথা শোনার সাথে সাথে আম্বরী তার কর্মচারীর নির্দেশনা অনুযায়ী নদীর দিকে অগ্রসর হলো। আম্বরী মূল পথ ছেড়ে একটু দূর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। কিছুক্ষণ অগ্রসর হয়েই সে দেখতে পেলো, চারজন লোকের সাথে শুধু দোশীন একা নয় আরেকজন নারীও দাঁড়ানো। আম্বরী একটা ঝোপের আড়াল দিয়ে পা টিপে টিপে তাদের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল এবং তাদের কথাবার্তা পরিষ্কার শুনতে পেলো। তাদের কথা থেকে আম্বরী বুঝতে পারলো, তাদের মধ্যে আসল কথা আগেই হয়ে গেছে। সে শুধু একজনকে বলতে শুনল—

নদীর তীরে নৌকা বাধা আছে, নিঃশব্দে নৌকা পর্যন্ত গিয়ে নৌকার রশি খুলে দেবে। তোমরা যে দিকে যাবে সেদিকেই এখন পানির স্রোত। কিছুক্ষণ ভেসে দূরে গিয়ে বৈঠা চালাবে। প্রহরীরা কিন্তু ওদিকেও যায়, সতর্ক থাকবে। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে পৌছে যাবে তোমরা।

মহারাজা অশ্বারোহী সৈন্যদেরকে যেন আমাদের বামপাশে রাখে। তুমি তো আমাদের পথ দেখে এসেছো। এই পথের কথা ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেবে। আমরা এপাশেই থাকবো। মহারাজাকে বলবে, এ পাশে আমাদের পক্ষ থেকে তার বাহিনীর উপর কোন আক্রমণ হবে না। তারা একেবারে গযনী বাহিনীর মাঝখানে চলে যেতে পারবে। সুযোগ পেলে আমরাই তীর মেরে সুলতানকে মেরে ফেলবো।

মহারাজাকে আমাদের বাম পাশের অবস্থান পর্যন্ত পৌছার পথ বুঝিয়ে দেবে। আর বলবে, আমাদের সেনারা তার সেনাদের উপর আক্রমণ করে পিছিয়ে আসবে, তারা যেন আমাদের পিছিয়ে আসার কারণে এগিয়ে না আসে। তাহলে কিন্তু সুলতানের ফাঁদে আটকে যাবে। আমাদের আক্রমণকারীরা পেছনে সরে আসলে তারাও যেন পিছিয়ে যায়, নয়তো আমরা উভয় বাহুর আক্রমণের শিকার হবো। যাও, এখন চলে যাও। তোমাদের পুরস্কারের বিষয়টাতো জানাই আছে। ঠিক ঠিক পেয়ে যাবে।

দু'জন লোক নদীর দিকে অগ্রসর হলো। আর দোশীন, অন্য মহিলা ও বাকী দু'জন পুরুষ ভিন্ন পথ ধরলো। আম্বরী তাড়াতাড়ি ঝোপের আড়াল থেকে উঠে দ্রুত তার তাঁবুতে এলো এবং তীর ধনুক এবং একটি খঞ্জর কোমরে গোঁজে তাঁবু থেকে দ্রুত পায়ে নদীর দিকে অগ্রসর হলো। সে তার কর্মচারীকেও তারবারী আর বর্শা নিয়ে তার সঙ্গী হতে বললো।

আম্বরী ছিল অনভিজ্ঞ। কিন্তু সে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। সে এটা বুঝতে পেরেছিল, সুলতান মাহমূদ জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রতারণার শিকার হতে

যাচ্ছেন। কিন্তু কিভাবে এই চক্রান্ত সামাল দেয়া যাবে? এই অভিজ্ঞতা তার ছিল না। সুলতান মাহমূদের প্রতি তার এতোটাই শ্রদ্ধা ছিল যে, আবেগের তীব্রতায় সে তীর ধনুক ও খঞ্জর নিয়ে তার কর্মচারীকে সঙ্গী করে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। নদী খুব বেশী দূরে ছিল না। অতি আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ার কারণে তাকে কেউ অনুসরণ করছে কিনা সেই খেয়াল আম্বরীর ছিল না। কত তাড়াতাড়ি সে নদীর তীরে পৌঁছাতে পারবে এটাই ছিল তার লক্ষ্য। ঠিক সময়েই নদী তীরে পৌঁছে গেল আম্বরী।

সে নদী তীরে পৌঁছে দেখল, চক্রান্তকারী দু'জন নৌকায় উঠে পানিতে নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছে। স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে নৌকা। চাঁদনী রাত। বেশী দূর যায়নি নৌকাটি। আম্বরী তাড়াতাড়ি কিছুটা ভাটির দিকে গিয়ে এক হাটু মাটিতে ঠেকিয়ে ধনুকে তীর ভরে ছুড়ে দিল। কাল বিলম্ব না করে বিদ্যুৎ বেগে আরেকটি তীর ছুড়লো আম্বরী। উভয় তীর লক্ষভেদ করলো। কিন্তু ততোক্ষণে ঘটে গেছে অন্য কাণ্ড।

তার পিছনে আসা কর্মচারীর কণ্ঠ চিড়ে বেরিয়ে এলো আর্তচিৎকার। শেষ তীরটা ধনুক থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতেই পেছন দিকে তাকিয়ে আম্বরী দেখল, তার কর্মচারীর উপর দু'জন লোক আক্রমণ করেছে। এদের একজন আম্বরীর দিকে দৌড়াতে চাচ্ছে, আর আম্বরীর কর্মচারী বর্শা দিয়ে তাকে আটকাতে চাচ্ছে। কর্মচারী সর্বশক্তি দিয়ে দু'জনের মোকাবেলা করতে চাচ্ছিল। কিন্তু আক্রমণকারী দু'জন ছিল তরবারী ধারী। তাদের যৌথ আক্রমণে কর্মচারী আহত হয়ে গেল।

এক আক্রমণকারী ততোক্ষণে আম্বরীর উপর আক্রমণ করল। কিন্তু আঘাতটি ব্যর্থ হলো। আক্রমণকারী আবার আক্রমণ করলো। এটিও ব্যর্থ করে দিয়ে আম্বরী গলা ছেড়ে চিৎকার শুরু করে দিল। বলতে লাগল— আয়! তোরা নদীর দিকে আয়! একথা বলে সে উল্টো পায়ে পেছনের দিকে সরে গেল এবং চটজলদি একটি তীর ধনুকে ভরে নিল। আম্বরী চাচ্ছিল এদেরকে জীবিত ধরিয়ে দিতে।

ধনুক থেকে তীর বের করে ফেলো মেয়ে। আমরা তোমাকে ছেড়ে দেবো— আম্বরীকে শাসালো এক আক্রমণকারী। আম্বরী ছিলো পাকা তীরন্দাজ। সে ধনুক উপরে উঠিয়ে তীর ছুড়ে দিলো। আক্রমণকারী লাফিয়ে অন্য দিকে সরে গেল। কিন্তু তীর ততোক্ষণে তার উরু ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।

অপর আক্রমণকারী আম্বরীর কর্মচারীকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল। আম্বরী আরেকটি তীর ওই হামলাকারীকে লক্ষ্য করে ছুড়লো। তারও পায়ে আঘাত হানলো তীর।

তীরবিদ্ধ হওয়ার পর উভয় আক্রমণকারী দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলো; কিন্তু কেউই বেশী দূর এগুতে পারলো না। আম্বরী গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করে দিল। আম্বরীর চিৎকার শুনে প্রহরীরা দৌড়ে এলো। আম্বরী প্রহরীদের জানালো— দু'জন চক্রান্তকারীকে সে তীরবিদ্ধ করেছে। এরা তীরবিদ্ধ হয়ে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে। আর দু'জন হিন্দু গোয়েন্দাকে সে তীরবিদ্ধ করেছে। এরা নৌকায় চড়ে শত্রু বাহিনীর কাছে খবর নিয়ে যাচ্ছে। একটা নৌকা ভেসে যাচ্ছে, এর মধ্যে তীরবিদ্ধ দুই লোক রয়েছে। এরা গযনী বাহিনীতে হিন্দুদের চর হয়ে কাজ করে। এক প্রহরী একথা শুনে উচ্চস্বরে চিৎকার করলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌঁছে গেল কয়েকজন অশ্বারোহী। তাদেরকে বলা হলো, নদীতে ভাসমান নৌকায় তীরবিদ্ধ শত্রু সেনা আছে, এদেরকে পাকড়াও করো।

নির্দেশ পাওয়া মাত্র কয়েকজন সৈনিক নদীর ভাটির দিকে দৌড়াল এবং দু'জন পানিতে নেমে নৌকায় উঠে সেটিকে তীরে এনে দুই আহতকে নদী তীরে তুলে আনলো। অপর দিকে পলায়নপর তীরবিদ্ধ দুই আক্রমণকারীকেও ধরে ফেললো প্রহরীরা। কিন্তু প্রহরীরা এদেরকে দেখে অবাক হলো। এরা যে তাদেরই সেনাবাহিনীর দু'জন কমান্ডার।

গ্রেফতার করা সবাইকে সাথে সাথে প্রধান সেনাপতি আলতাঈর কাছে নিয়ে গেল প্রহরীরা। যে দু'জন নৌকা করে হিন্দুদের খবর পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল, এরা ছিল পরিচয় গোপনকারী হিন্দু। এরা দুই সেলজুকী কমান্ডারের কর্মচারী পরিচয়ে গযনী বাহিনীর সাথে এসেছিল।

তীরবিদ্ধ দুই কমান্ডার ছিল সেলজুকী কমান্ডার রজব ভাই আর কমান্ডার ফরিদ আফিন্দি। নৌকায় আরোহী দুই হিন্দুর শরীর থেকে তীর খোলে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু কমান্ডার দু'জনকে দেখে সুলতান নির্দেশ দিলেন, যতোক্ষণ না এরা সত্য কথা বলবে, ততোক্ষণ এদের শরীর থেকে তীর খুলবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই হিন্দু মুখ খুললো এবং বললো— আমরা অ'সলে হিন্দু। এই দুই সেলজুকী কমান্ডার আমাদেরকে পরিচয় গোপন করে সাথে এনেছে। এখন আমাদেরকে মহারাজা গোবিন্দের কাছে গযনী বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে খবর নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

গ্রেফতারকৃত দুই সেলজুকী কমান্ডারও স্বীকার করলো— তারা ইসরাঈল সেলজুকীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছিল। সুলতান একথা শুনে রাগে ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। বললেন— আল্লাহ যদি আমাদেরকে গযনী ফিরিয়ে নেয়,

তাহলে সবার আগে ইসরাঈল সেলজুকী এবং আলাফতোগীনকে শায়েস্তা করবো।

এই ভয়াবহ চক্রান্তের কথা জানার সাথে সাথে সুলতান দোশীন ও তার সহযোগী তরুণীকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন এবং সকল সেলজুকী সৈন্যকে একত্রিত করে তাদের কাছ থেকে সব অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিলেন। সেলজুকীদের সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে তাদেরকে নজরবন্দি ঘোষণা করে তাদের জন্য পাহারাদার নিয়োগ করলেন। ভয়ঙ্কর চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর আর কোন সেলজুকীর উপর আস্থা রাখা ঠিক হবে না— বলে মন্তব্য করলেন সুলতান।

মহারাজা গোবিন্দের বিশাল সৈন্যবহর দেখে সুলতান মাহমূদ খুবই চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। পরিস্থিতি কিভাবে সামলানো যাবে এই চিন্তায় তিনি ছিলেন পেরেশান। এর মধ্যে নিজ সেনাদের মধ্যে আত্মঘাতি ভয়ঙ্কর চক্রান্তের বিষয়টি তাকে দারুন উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দিল। বাহ্য দৃষ্টিতে কোন উপায় অন্তর না দেখে তিনি নফল নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে একান্ত মনে খুব কান্নাকাটি করলেন।

সারা রাত কখনো নামাযে কখনো হাতে কুরআন শরীফ নিয়ে আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করলেন সুলতান।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, শেষ রাতে তার মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তি দেখা গেলো। তিনি তখনই এক দূতকে ডেকে রাজা গোবিন্দের কাছে পয়গাম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। মনে হলো, সংকট থেকে উত্তোরণের কোন সহজ পথ পেয়ে গেছেন তিনি। তিনি রাজা গোবিন্দের উদ্দেশ্যে লিখলেন— ইসলাম সত্য ধর্ম, আর পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণ মানুষের তৈরি অবাস্তব ধর্ম। ইসলাম গ্রহণ করলে আপনি শান্তি ও নিরাপত্তা পাবেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তাহলে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, আপনি আপনার সেনাবাহিনী ও আপনার রাজধানীর উপর কেমন ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসবে।

আপনি যদি নেতিবাচক জবাব দেন, তাহলে সাথে সাথেই আমার সৈন্যরা আপনার উপর আক্রমণ করেবে। আর আপনার রাজধানী অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে রাজধানী অবরোধের আয়োজন হয়ে গেছে। আমার সৈন্যরা হয়তো সেখানে পৌঁছে গেছে। আশা করি, আপনি আমার সৈন্যদের হাতে আপনার সেনাদের গণহত্যার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করবেন এবং কালাঞ্জরের মন্দির ও শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে হেফাযত করবেন।

এই পয়গাম দিয়ে সুলতান রাজা গোবিন্দের কাছে দূত পাঠালেন। মহারাজা গোবিন্দ ইসলাম গ্রহণ করলেন না বটে, কিন্তু সুলতানের দূতকে সসম্মানে ফেরত পাঠালেন। তিনি সুলতানের সাথে মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সুলতানের সেনা শিবিরের দিকে অগ্রবর্তী সেনাদল পাঠিয়ে দিলেন

সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা ইউনিট সাথে সাথে খবর দিয়ে দিলো, রাজা গোবিন্দের অগ্রবর্তী সেনারা গযনী বাহিনীর দিকে রওয়ানা করেছে। সুলতান প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন গোবিন্দের অগ্রবর্তী বাহিনীর উপর এমন আক্রমণ করেন যে, তার গোটা বাহিনীর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

প্রধান সেনাপতি আলতাঈ যুদ্ধের ময়দানেই জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন। কোন অবস্থায় কি ব্যবস্থা নিতে হয় এ ব্যাপারে তিনি ইতিহাস বিখ্যাত ছিলেন। অগ্রীম খবর পাওয়া মাত্রই তিনি দুটি অশ্বারোহী ইউনিটকে ডানে বামে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদের কমান্ড নিজের হাতে রাখলেন।

মহারাজা গোবিন্দের অগ্রবর্তী সেনারা যখন তাদের মুখোমুখি এলো, তখন আলতাঈর নির্দেশে উভয় পাশের সৈন্যরা হিন্দু সেনাদের উপর উভয় দিক থেকে আক্রমণ করলো। আলতাঈ নিজে সেনাদের আক্রমণ পরিচালনা করলেন। ফলে মহারাজা গোবিন্দের অগ্রবর্তী বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। অধিকাংশই নিহত হলো। আর যারা প্রাণে বেঁচে পালাতে সক্ষম হলো, তার গোটা সেনাবাহিনীর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে দিল।

সেদিন আর কোন লড়াই হলো না। রাতের বেলায় সুলতান মাহমূদ আবারো আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। সুলতানের আশংকা ছিল, মহারাজা গোবিন্দের সৈন্যরা রাতে নিশ্চয়ই আক্রমণ করবে। কিন্তু রাতে আর কোন আক্রমণের ঘটনা ঘটলো না। নিরাপদেই রাত পোহাল। সুলতান যখন ফজরের নামায শেষ করলেন, তখন প্রধান সেনাপতি তাকে জানালেন— মহারাজা গোবিন্দের সেনাবাহিনীকে রাতের বেলায় কোথাও চলে যেতে দেখেছে আমাদের গোয়েন্দারা।

এটা নিশ্চয়ই ধোকা। এতো বিশাল বাহিনী মোকাবেলা না করে পালিয়ে যেতে পারে না। রাজা গোবিন্দ আমাদেরকে সামনে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। সে আশা করছে, আমরা সামনে চলে গেলে আমাদেরকে উভয় দিক থেকে ঘিরে ফেলবে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আসলে রাতের অন্ধকারে মহারাজা গোবিন্দের সেনাদের স্থানান্তর গযনী বাহিনীর মোকাবেলার জন্য ছিল না। পালানোর উদ্দেশ্যে তারা রাতেই পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলেছিল। দিনের বেলায় গোবিন্দের অগ্রবর্তী বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা দেখে রাত হতে না হতেই তার মনে হতে লাগলো, এতো দিন গযনী বাহিনীর দুর্ধর্ষতা সম্পর্কে তিনি যা শুনেছেন তাই ঠিক। তিনি গযনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নিজের ও রাজ্যের নিশ্চিত ধ্বংস ডেকে এনেছেন। তার মধ্যে দেখা দিল মারাত্মক আতংক। ফলে তিনি কাল বিলম্ব না করে রাতের মধ্যেই তার সেনাদেরকে শিবির ত্যাগ করার নির্দেশ দেন।

এটি ছিল সুলতান মাহমূদের দুআর বরকত। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি ও আত্মনিবেদনের ফল। আল্লাহ তার দু'আর বরকতেই প্রবল শক্তির অধিকারী হিন্দু রাজার মনে আতংক সৃষ্টি করে দিলেন। এই হিন্দুরাজা এতোটাই আতংকিত হলেন যে, তিনি মোকাবেলা না করে রাতের অন্ধকারে রণাঙ্গণ ত্যাগ করলেন।

সুলতানের গোয়েন্দারা খবর দিলো, শত্রুবাহিনী শিবির ত্যাগ করে চলে গেছে। তিনি বিষয়টি আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্যে এবং পরিস্থিতি যাচাই করার জন্যে দু'টি সেনা ইউনিটকে সাথে নিয়ে রাজা গোবিন্দের শিবির পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। সত্যিই অবাক করা দৃশ্য। ছাউনী তাঁবু যথারীতি রয়েগেছে; কিন্তু গোটা শিবির ফাঁকা। কোথাও একজন পাহারাদার পর্যন্ত নেই। সুলতান এটিকে ফাঁদ মনে করে অনাকাঙ্খিত আক্রমণ প্রতিহতের জন্যে সেনাদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিলেন; কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কোন দিক থেকে শত্রুপক্ষের কোন আক্রমণের আলামত দেখা গেলো না।

এক পর্যায়ে সুলতানের কাছে খবর এলো, মহারাজা গোবিন্দের সৈন্যরা কালাঞ্জরের পথে রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছে। সুলতান পিছু ধাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে নিজেই গোবিন্দের সৈন্যদের ধাওয়া করার জন্যে বিদ্যুৎ বেগে অগ্রসর হয়ে শত্রু সেনাদের একেবারে কাছে চলে গেলেন। এটি ছিল একটি অতি দুঃসাহসী কাণ্ড। অবস্থা আঁচ করে প্রধান সেনাপতি আলতাঈ আরো চারটি সেনা ইউনিট নিয়ে দ্রুত সুলতানের সাথে যোগ দিলেন, যাতে কোন অনাআঙ্খিত পরিস্থিতি না ঘটে। অবশ্য তেমন কিছু ঘটেনি। বরং গোবিন্দের সৈন্যরা গযনী বাহিনীর তাড়া খেয়ে মালপত্র, হাতি ঘোড়া ত্যাগ করে যে যার মতো জীবন নিয়ে পালিয়ে গেলো।

কোন ঐতিহাসিকই মহারাজা গোবিন্দের মোকাবেলা না করে রাতের অন্ধকারে রণাঙ্গন ত্যাগ করার কারণ বলেননি। ঐতিহাসিক স্মিথ ও উথবী লিখেছেন— আসলে মহারাজা গোবিন্দ গযনী বাহিনীর ভয়ে পালিয়ে যাননি। তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছিলেন। এটা দেখে তার সেনাকর্মকর্তারা আতংকিত হয়ে পড়ে এবং গযনী বাহিনী পিছু ধাওয়া করলে তারা হাতি ঘোড়া রসদপত্র ফেলেই জীবন নিয়ে পালিয়ে যায়।

অবস্থা এমন হয় যে, সুলতান যখন পিছু ধাওয়া ত্যাগ করে শিবিরে ফিরে আসতে থাকেন, তখন রাজার ছয়শ' জঙ্গি হাতির মধ্যে পাঁচশ আশিটি হাতিই ছিল তার সেনাদের দখলে। বিনা যুদ্ধে এই অস্বাভাবিক বিজয়ের পর সুলতানের অবস্থাও এমন হলো যে, তিনি হিন্দুস্তানে নিয়মিত সরকার গঠন না করেই গযনী ফিরে আসেন। ফিরে আসার ব্যাপারে কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন— সুলতানের কাছে খবর পৌছে যে, সেলজুকীরা বিপুল শক্তি সঞ্চয় করেছে। যে কোন দিন তারা গযনী আক্রমণ করতে পারে। এ খবর শুনে সুলতান হিন্দুস্তানে সরকার প্রতিষ্ঠা না করেই গযনী ফিরে আসেন।

স্লোগানেই কেল্লা জয়

সুলতান মাহমূদ যখন মহারাজা গোবিন্দকে পরাস্ত করে গযনী ফিরে আসেন, তখন তার সাথে ছিল যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হিসাবে প্রায় ছয়শ জঙ্গি হাতি, আড়াই হাজার ঘোড়া আর সাত হাজার হিন্দু বন্দি। গযনীর অধিবাসীরা বিজয়ী সুলতান ও সেনাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ঘর ছেড়ে অনেক পথ এগিয়ে গিয়ে ছিল। উল্লসিত জনতার তাকবীর ও স্লোগানে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠছিল। রণ ক্লান্ত দীর্ঘ সফরে শ্রান্ত সৈনিকদের চেহারাও জনতার উল্লাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বন্দিদের দীর্ঘ সারি যখন জনতাকে অতিক্রম করছিল তখন জনতার গগন বিদারী শ্লোগানে যমীন কাঁপতে লাগল।

মুগ্ধ আনন্দিত জনতা হিন্দু বন্দিদের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের তিরস্কার করছিল। কেউ কেউ বলছিল— গযনীতে তোমরা আসল খোদার দেখা পাবে। এসব খোদাকে প্রণাম করবে, তাহলে তোমরা মাফ পেয়ে যাবে। কিন্তু গযনীবাসীর এসব তিরস্কার ছিল ফারসী ভাষায়। হিন্দুরা ফারসী বুঝতো না। ফলে জনতার উল্লাস ধ্বনি ও অঙ্গভঙ্গি দেখে বন্দি হিন্দুদের কেউ কেউ অবাক বিস্ময়ে তাকাচ্ছিল, আবার কেউ পরাজিতের শুষ্ক হাসি হাসছিল আবার কারো চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু।

দর্শকদের মধ্যে চারজন লোক কিছুটা ভিন্নভাবে দাঁড়িয়ে তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সুলতানকে গভীর ভাবে দেখছিল। তাদের কণ্ঠে কোন শ্লোগান ছিল ন। তারা ছিল সম্পূর্ণ নীরব ও গম্ভীর।

সুলতান যখন তাদের অতিক্রম করলেন তখন তারা গযনী সেনাদের তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখছিল। মহারাজা গোবিন্দ মোকাবেলা না করার কারণে গযনী বাহিনীর কোন সৈনিকের প্রাণহানি ঘটেনি। ফলে মনে হচ্ছিল, গযনী থেকে যে পরিমাণ সৈন্য গিয়েছিল, ফিরে আসছিল তার চেয়েও বেশী। অবশ্য সুলতান মাহমূদ কন্নৌজ ও লাহোরে কিছু সৈন্য রেখে এসেছিলেন। ওই দু'টি এলাকার শাসকরা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল।

লড়াই না করেই ফিরে এসেছে সুলতান। দেখা যাচ্ছে ব্যাপক লুটপাট করে এসেছে— বললো নীরব দর্শক চারজনের একজন।

লড়াই না করলে যুদ্ধ বন্দি এলো কোত্থেকে? এতোগুলো হাতি ঘোড়া আর যুদ্ধ সরঞ্জামই বা কোথায় পেতো? বললো অপর একজন।

এতো লোকের মধ্যে আমি যদি সুলতানকে তীর ছুড়ে জনতার ভিড়ের মধ্যে মিশে যাই তাহলে আমাকে কেউ ধরতে পারবে না। সুলতানের লোভী জীবন এখানেই সাঙ্গ হয়ে যাবে— বললো এদেরই আরেক সঙ্গী।

আরে রাখো! শুধু শুধু একা সুলতানকে হত্যা করলে তার রাজ্য আমাদের দখলে এসে যাবে না। তার যুবক একটি ছেলে আছে। সেও বাবার মতোই যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী। সুলতানকে হত্যা করে কিছু অর্জন হবে না আমাদের। বললো এদেরই আরেকজন।

খুন খারাবীর কথা রাখো। আমাদেরকে সুলতানের সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখার জন্য পাঠানো হয়েছে। হিন্দুস্তান থেকে কি পরিমাণ সৈন্য নিয়ে ফিরে এসেছে, তাদের অবস্থা কি, তাই জানা আমাদের কাজ। কারণ ইসরাঈল সেলজুকী ধোঁকায় পড়ে একবার পরাজিত হয়েছে, আমাদের অনেক লোক নিহত হয়েছে। এমন ভুল সে আর করতে চায় না। বললো— চারজনের দল নেতা।

নিজেকে ধোকায় ফেলো না বন্ধু! গযনী সেনাদের শক্তি নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে অনেক বেশী— বললো তাদের অপর একজন।

ধুর, এসব বাজে কথা। একজন সেলজুকী গযনীর পাঁচজন সৈনিকের চেয়েও বেশী শক্তি রাখে। আমি তো আগেই বলেছি, শুধু সুলতানকে যদি খুন করে ফেলা যায়, দেখবে গোটা গযনী বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যাবে। গযনী বাহিনীর অবস্থা তখন এই ভিক্ষুকের মতোই হয়ে যাবে।

একথা বলে লোকটি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভিক্ষুককে ডাকলো। এই ভিক্ষুক! তোমার সুলতানকে বলো না, যে ধনসম্পদ হিন্দুস্তান থেকে লুট করে এনেছে, এ থেকে তোমাকে কিছু দিয়ে দিক।

পাকা দাঁড়ি, ছেড়া ফাটা ধুলি মলিন কাপড় পরা লোকটি ছিল যথার্থ অর্থেই একজন ভিক্ষুকের প্রতীক। তার এক হাতে একটি পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া লাঠি, আর এক হাতে ভিক্ষার ঝুলি। ভিক্ষুক জনতা থেকে কিছুটা ব্যবধানে দাড়িয়ে থাকা এই চারজনের পাশেই দাঁড়িয়ে ভিক্ষার আশায় সমবেত জনতার দিকে উম্মুখ হয়ে তাকিয়ে ছিল। ডাক পেয়ে সে পৃথকভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এই চার দর্শনার্থীর কাছে চলে এলো এবং বললো–

আমি গযনবী নই, একজন সেলজুকী। গযনীর লোকেরা সেলজুকী ফকীরদের ভিক্ষা দেয় না।

আরে তোমার দেহে সেলজুকী রক্ত থাকলে তুমি নদীতে ডুবে মরতে; কিন্তু ভিক্ষা করতে না— তিরস্কার মাখা কণ্ঠে বললো দর্শনার্থীদের একজন। যাও, চলে

যাও এখান থেকে। ইসরাঈল সেলজুকীর ওখানে চলে যাও। সেখানে কোন ভিখারী নেই, সবাই রাজা।

আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম আপনারা সেলজুকী। এজন্যই আপনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

কিন্তু আমরা তোমাকে ভিক্ষা দেবো না। তোমার এই বদ অভ্যাসকে আমরা সমর্থন করতে পারি না— বললো এক সেলজুকী।

এরপর ভিক্ষুক ও চার সেলজুকী দর্শনার্থীর মধ্যে আর কথা এগুলো না। সেনাবাহিনী সেই জায়গা অতিক্রম করার পর দর্শনার্থীরাও যে যার মতো করে চলে গেলো। এরাও জায়গা ত্যাগ করে শহরের পথ ধরলো। কিন্তু ভিক্ষুক তাদের পিছু ছাড়লো না। নিরাপদ দূরত্বে থেকে এই চার সেলজুকীর গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখলো।

* * *

রাজধানীতে ফিরে সুলতান মাহমূদ ঘরে না গিয়ে তার দফতরেই খাবার খেলেন। খাবার খেতে খেতেই তিনি তার অবর্তমানে দায়িত্ব পালনকারী উজিরের কাছ থেকে জেনে নিলেন গযনীর সার্বিক অবস্থা।

উজির সুলতানকে জানালেন— অবস্থা ভালো নয়। সেলজুকীরা আমাদের জন্যে মারাত্মক বিপদ হয়ে উঠছে। ইসরাঈল সেলজুকী বিরাট শক্তি সঞ্চয় করেছে। বুখারা ও আশেপাশের সব লোক তার সঙ্গী হয়ে গেছে। ইসরাঈল সেলজুকীর মধ্যে মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা আছে। সে বুখারার ক্ষমতালোভী নেতাদেরকে তার পক্ষে নিয়ে এসেছে। সে গোটা সেলজুকী জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে গাদ্দার আলাফতোগীনকে সাথে নিয়ে গযনী আক্রমণের চক্রান্ত করছে।

শুধু এখানেই নয়, সেলজুকী সমস্যা তো এবার আমার সঙ্গেই গিয়েছিল। আল্লাহর রহমতে কমান্ডার উমর ইয়াজদানীর স্ত্রীর অসম সাহসিকতার কারণে আমরা বেঁচে গেছি। যুদ্ধের আগের রাতে এরা রাজা গোবিন্দকে আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও সেনাদের অবস্থান জানানোর জন্যে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। পরিচয় গোপনকারী দুই কোচওয়ানের ধরা পড়ার ব্যাপারটি সবিস্তারে উজিরকে জানালেন সুলতান।

সেলজুকীরা গযনীতেই আপনাকে হত্যা করার অপচেষ্টা করছে। আজ চারজন সেলজুকীকে আমাদের গোয়েন্দারা গ্রেফতার করেছে– সুলতানকে জানালেন উজির।

এরা কি স্বীকার করেছে আমাকে খুন করার জন্যে এসেছিল? কোথায় এরা?

জী হ্যাঁ, তারা যে মন্দ ইচ্ছায় এসেছিল তা তাদের কাছ থেকে বের করা হয়েছে। কাছেই আছে। আপনি চাইলে তাদের এখানে হাজির করা হবে।

ধৃত চারজনকে সুলতানের সামনে হাজির করা হলো। তাদের পায়ে বেড়ী, মাথা দোলছিল। তাদের কেউই ঠিক মতো দাঁড়াতে পারছিল না। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তাদের উপর যথেষ্ট দখল গেছে। উজীর একজনের নাম উচ্চারণ করে প্রহরীকে বললেন— অমুককে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

একটু পরে সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করল একজন ভিক্ষুক। তার পরনে ছেড়া ফাটা ধুলোমলিন কাপড়। মাথায় উষ্কু খুস্কু লম্বা চুল, দীর্ঘ চুল আর ময়লা মিলে অনেকটাই জটের রূপ নিয়েছে। তার হাতে লাঠি আর কাধে ভিক্ষার ঝুলি।

সম্মানিত সুলতান! এই লোক হলো সেই ভিক্ষুক, যে এদের কথা কাছে থেকে শুনেছে এবং এদের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রেখে এদের আস্তানা থেকে সময় মতোএদেরকে ধরিয়ে দিয়েছে। এরা যার বাড়ীতে ছিল সেখানকার তল্লাশী নিয়ে জানা গেছে, লোকটি সন্দেহজনক। এই ভিক্ষুক আসলে গোয়েন্দা বিভাগের একজন দক্ষ কর্মকর্তা।

আমরা যখন দেখলাম আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্যে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছে, তখন ভীড়ের মধ্যে গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দিয়েছিলাম, যাতে কোন নাশকতা কিংবা অনাকাঙ্খিত ঘটনার উদ্ভব না ঘটতে পারে। এই গোয়েন্দা আপনাকে জানাবে কিভাবে সে এদের পাকড়াও করেছে। ভিক্ষুক বেশধারী গোয়েন্দা কর্মকর্তা সুলতানকে জানালো—

মাননীয় সুলতান! আমি দেখলাম, আপনার অভূতপূর্ব বিজয়ে লোকজন আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফালাফি করছে। আনন্দে নাচছে, গাইছে, শ্লোগান দিচ্ছে এবং এলোপাথাড়ী হয়ে ছুটাছুটি করছে, ধাক্কাধাক্কি করছে। কিন্তু এরা চারজন জটলা থেকে কিছুটা দূরে নির্বিকার দাঁড়ানো। দেখে মনে হচ্ছিল, তারা জটিল কিছু ভাবছে এবং এই বিজয় উল্লাসে তারা মোটেও খুশি হতে পারছে না। বরং মানুষের এই উল্লাসে তারা বিরক্ত। আমি তখন ধীরে ধীরে তাদের কাছে গিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করলাম।

সেলজুকীদের পারস্পরিক কথাবার্তা এবং তার সাথে সেলজুকীদের কথাবার্তার বিস্তারিত সুলতানকে শোনালো গোয়েন্দা।

সব শুনে সুলতান অভিযুক্ত সেলজুকীদের উদ্দেশ্যে বললেন— তোমরা কি তোমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমার কাছে কিছু বলবে? আমি শুনতে পেলাম, তোমরা আমাকে হত্যা করতে এসেছিলে?

না সুলতান! আমরা আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আসিনি— বললো এক সেলজুকী। অবশ্য আমাদের একজন আপনাকে হত্যা করার কথা বলেছিল। কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য তার ছিল না। ধরা পড়ে যাওয়ার পর আমরা সবই বলে দিয়েছি। আমাদের উপর এতো জুলুম করার দরকার ছিল না। আমরা কিন্তু ধরা পড়ার সাথে সাথেই পরিষ্কার করে সব বলে দিয়েছি। আমরা সেলজুকী। সেলজুকীরা মিথ্যা বলে না। আমরা আপনাকে শত্রু মনে করি। আপনি চালাকি করে একবার আমাদের বহু লোককে হত্যা করেছেন।

আমরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছি। আমরা সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবো। আমরা হিন্দুস্তানের মূর্তিপূজক নই, মুসলমান। কিন্তু মুসলমান হলেও আমাদের কোন দেশ নেই, রাজ্য নেই। আল্লাহর যমীনে এমন কোন জায়গা নেই, যাকে আমরা আমাদের দেশ বলতে পারি। আমরা দীর্ঘ দিন ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা চাই আমাদের একটা দেশ হোক। এই দেশের জন্যই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। যেখানে সেলজুকীরাই হবে বাদশা। একটা সেলজুকী রাষ্ট্র হবে।

তোমাদের কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু তোমাদের রাষ্ট্র গঠনের জন্যে আমার সালতানাতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি কেন? যে কোন দুর্বল একটা রাজ্য দখল করে নিলেই পারো।

দুর্বলের কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেয়া বীরত্বের ব্যাপার নয়। আপনি আমাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। আমরা চাচ্ছি আপনার অধীনস্থ কোন রাজ্যে আমাদের রাষ্ট্র গঠন করতে। বিশ্বাস করুন, আপনাকে হত্যা করার কোন ইচ্ছা আমাদের আদৌ ছিল না। আমরা চাচ্ছিলাম, আপনার সামরিক শক্তি দুর্বল করে দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আপনাকে পরাজিত করতে।

ধন্যবাদ তোমাদেরকে। আমার কাছে ভালো লাগছে যে, মৃত্যুমুখেও তোমরা বীরের মতো অকপটে তা-ই বলছো, যে কথা তোমরা বিশ্বাস করো এবং মনে পোষণ করো— বললেন সুলতান। আমিও তোমাদের সাথে বীর জাতির নেতার মতোই আচরণ করবো। আমার বিরুদ্ধে এবং মুসলিম সালতানাতের বিরুদ্ধে

অন্যায় চক্রান্তকারী হলেও আমি তোমাদের হত্যা করবো না এবং জেলে ঢোকাবো না। তোমাদেরকে আমি শাহী মেহমানের মতোই মর্যাদা দেবো। সুলতান একজন প্রহরীকে ডেকে বললেন— এদের বেড়ী খুলে দাও।

ডান্ডা-বেড়ী খুলতে খুলতে সুলতান বললেন, গযনী বাহিনী সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?

খুব শক্তিশালী বাহিনী— বললো এক সেলজুকী। আমাদের ধারণা ছিল হিন্দুস্তান থেকে আপনার সৈন্যরা দুর্বল ও রণক্লান্ত হয়ে গযনী ফিরবে। কিন্তু যা দেখলাম, নতুন হাতি, ঘোড়া, সাজ সরঞ্জাম নিয়ে আপনার বাহিনী আগের চেয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে ফিরেছে।

তোমাদের নেতা ইসরাঈল সেলজুকী কি আমাদের সাথে এখনও যুদ্ধ করবে? জানতে চাইলেন সুলতান।

এ কথার জবাব সেই দিতে পারবে, আমরা এর জবাব দিতে পারবো না। আমাদের কাছে আমাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারেন— বললো এক সেলজুকী।

না, আমি আর কিছুই তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো না— বললেন সুলতান। আমি তোমাদের কয়েকটি কথা বলে দিতে চাই। ফিরে গিয়ে তোমরা তোমাদের নেতা ইসরাঈল সেলজুকীকে আমার সালাম দিয়ে বলবে— আমি তোমাদেরকে পাহাড়ের উপত্যকা ছেড়ে ঝিঝান নদীর তীরবর্তী বিশাল এলাকায় বসবাস করতে দেবো এবং সেখানে তোমরা নিজের মতো করে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে। তাকে বলবে, একই ধর্মের অনুসারী দু'টি জনগোষ্ঠী যদি একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাতে উভয় গোষ্ঠীই দুর্বল হয়ে পড়বে শক্তিশালী হবে ইহুদী নাসারা গোষ্ঠী। যারা আদিকাল থেকেই মুসলমানদের শত্রু। ইহুদী খৃষ্টানরা আমার যেমন শত্রু তোমাদেরও বন্ধু নয়। সুযোগ পেলে তারা আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে।

তাকে আরো বলবে, জন্ম মৃত্যু আল্লাহর হাতে। তদ্রুপ জয় পরাজয়ও আল্লাহ হাতে। তোমরা আমার সেনাদের মধ্যে তোমাদের চর ঢুকিয়ে দিয়ে হিন্দু রাজাদেরকে আমার যুদ্ধ কৌশল ও সেনাদের স্থানের খবর দিয়ে আমাকে পরাজিত করতে চেয়েছো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের বন্ধুগোষ্ঠী এলিকখানী এক তরুণীর দ্বারাই তোমাদের সকল চক্রান্ত্র ফাঁস করে দিয়েছেন। তোমরা যদি বাহাদুর জাতিই হবে তাহলে নারী দিয়ে এই চক্রান্ত করতে গেলে কেন? যুদ্ধতো পুরুষের কাজ। হিন্দুদের সাথে মৈত্রী করে তোমরা আমাকে ধোকা

দিতে চাচ্ছিলে। কিন্তু তোমরা কি জানো না, কোন কিছুই প্রকৃত মুসলমানের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তোমাদের নেতাকে বলবে, সে যার হাতে আমাকে পরাজিত করার চক্রান্ত করেছিল, সে আমাকে এতোটাই ভয় পেয়ে গেছে যে, লড়াই করা ছাড়াই হাতি ঘোড়া ফেলে রণাঙ্গণ থেকে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তোমাদেরকেও বলবো, আল্লাহর সামনে নিজেদেরকে পেশ করো।

ইসরাঈলকে বলবে, সে যেনো নির্দ্বিধায় আমার সাথে সাক্ষাত করে। সে যদি না আসতে চায়, তবে আমাকে ডাকলে আমি তার কাছে চলে যাবো। আমার এই কথাগুলো হুবহু তাকে বলবে। যাও, তোমরা মুক্ত।

এই গল্পেই আমরা আগে বলে এসেছি বুখারা ও সমরকন্দের পাহাড়ী এলাকায় ঈঝ নামের একটি উপজাতি বসবাস করতো। এদের কোন নির্দিষ্ট এলাকা ছিল না। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো এরা। ঈঝ গোত্রের এক নেতার নাম ছিল লুকমান। লোকটি ছিল যেমন সাহসী তেমনই বুদ্ধিমান ও সুপুরুষ। সে নিজেকে সেলজুকী বলতো। লুকমান ঈয্ উপজাতিদের মধ্যে ধীরে ধীরে এতোটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, সে নিজের পছন্দের নামে একটি স্বতন্ত্র গোত্র করে, গোত্রের নাম দেয় সেলজুকী। ঈঝ গোত্রের অধিকাংশ লোক লুকমানের নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং নিজেদেরকে সেলজুকী বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। সেলজুকী গোত্র ছিল স্বাধীন। তারা কোন নিয়মতান্ত্রিক শাসকের অধীনে ছিল না। গোত্রপতিই ছিল তাদের শাসক।

সেলজুকী গোত্রের জীবন ধারণের প্রধান উপায় ছিল পশুচারণ। এক পর্যায়ে এরা অন্যান্য লোকদের পশু ছিনতাই এবং লোকজনের কাফেলায় ডাকাতি ও লুটতরাজ করতে শুরু করে। এরা খুবই সঙ্গবদ্ধ হয়ে পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় থাকতো। তাই কেউ এদের মোকাবেলার চিন্তা করতো না। পরবর্তীতে এরা সুন্দরী মেয়েদেরও অপহরণ করতে থাকে। কিন্তু মেয়েদের অপহরণ করে এরা তাদের উপর কোন জুলুম করতো না। বরং পরম যত্নে তাদের নেতাদের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতো। ফলে অপহৃত মেয়েরা তাদের এখানে পরম সুখেই কালাতিপাত করতো।

সেলজুকীরা উপজাতি হলেও তাদের জীবন-যাপন, চলা ফেরা এমন আকর্ষণীয় ছিল যে, অন্যান্য গোত্রের উপজাতি লোকেরাও সেলজুকীদের সাথে মিশতে থাকে এবং নিজেদের সেলজুকী পরিচয় দিতে থাকে। দেখতে দেখতে ষাট সত্তর বছরে এই সেলজুকী গোত্রের পরিধি বিরাট আকার ধারণ করে।

ইতোমধ্যে আরো ভিন্ন গোত্রের লোক এসে সেলজুকী গোত্রে যোগ দেয়, মূল গোত্রের লোকদেরও সন্তান সন্ততি বেড়ে লোক সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

সেলজুকীরা লড়াকু ও দুঃসাহসী হওয়ার কারণে ছোট ও দুর্বল রাজ্যের শাসকরা তাদেরকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগিয়ে দিতো। কারণ সেলজুকীরা রীতিমতো একটি সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাদের গোত্রে ছিল অনেক যুদ্ধ পারদর্শী সক্ষম যুবক।

তুর্কি ও সামানীদের মধ্যে বিরোধ ছিল দীর্ঘ দিনের। সামানী শাসকরা এক পর্যায়ে সেলজুকীদেরকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধে ব্যবহার করে। এরপর সুলতান মাহমূদের কাছে পরাজিত আলাফতোগীন গযনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে সেলজুকীদের সাথে একটি সামরিক চুক্তি করে। এই সামরিক চুক্তির প্রধান কারণ ছিল লকুমান সেলজুকীর মৃত্যুর পর গোত্রের নেতা হয় তার ছেলে ইসরাঈল সেলজুকী। ইসরাঈল সেলজুকী সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসে শোচনীয় পরাজয়ের শিকার হয়।

সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তান থেকে লড়াই ছাড়াই বিজয়ী বেশে ফিরে আসার পর তার উজীর তাকে জানালেন, ইসরাঈল সেলজুকী এখন গযনীর জন্যে মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে। এখনই এই আপদ দমন না করলে আমাদের বহু মূল্য দিতে হতে পারে। সেলজুকী হুমকির প্রমাণ সুলতান গযনীতে পা দিয়ে নিজের চোখেই দেখলেন। কিন্তু নিজের প্রাণঘাতি দুশনদের প্রতি খড়গহস্ত না হয়ে তিনি পরম ধৈর্যধারণ করে ধৃত চার সেলজুকীকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে ইসরাঈল সেলজুকীর কাছে মৈত্রী পয়গাম পাঠালেন।

যে ব্যক্তি আপনাকে হত্যার চক্রান্তে লিপ্ত, যে আপনার সালতানাতের জন্যে বিরাট হুকমী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার সাথে আপনি সৌজন্য সাক্ষাতের প্রস্তাব করলেন সুলতান! সুলতানের পয়গাম শুনে অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন উজীর।

হ্যাঁ, আমি তাকে দোস্ত বানাতে চেষ্টা করবো। ইসরাঈল সেলজুকী নামের মুসলমান হলেও নিজেকে তো সে মুসলমান বলে দাবী করে। কোন মুসলমানের রক্ত ঝরাতে চাই না আমি। নিজ ভূমি থেকে বহু দূরের দেশ হিন্দুস্তানের পেটের মধ্যে আমি চলে যাওয়ার মতো দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা করি। সেখানকার মাটি, বাতাস, তরু-লতা পর্যন্ত আমার শত্রু। এটা যেমন এক ধরনের দুঃসাহস, নিজের চিহ্নিত শত্রুদের অপরাধ ক্ষমা করে তাদের কাছে বন্ধুত্বের প্রস্তাব করাও এক ধরনের দুঃসাহস।

অবশ্য এটা আমার ও আমার সঙ্গীদের জন্যে চরম দুঃখের বিষয় যে, আমাকে একই সাথে দুটি শক্তির মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এক দিকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজিত হিন্দুস্তানের বিস্তৃত এলাকা, যা মুসলমানদের কাছ থেকে হিন্দুরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। দারুল ইসলামকে হিন্দুরা দারুল কুফরে পরিণত করেছে, আমি বিন কাসিমের সেই বিজিত এলাকাকে পুনরুদ্ধার করে সেখানে ইসলামের পুনর্জাগরণ করতে চাই এবং ক্রমবর্ধমান পৌত্তলিক অপশক্তির কোমর ভেঙে দিতে চাই।

কারণ, হিন্দু শক্তিকে খতম করতে না পারলে এরা শুধু হিন্দুস্তানের মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। অপর দিকে আছে ইহুদী খৃস্টান অপশক্তি। এই দুই অপশক্তির দ্বারা আমরা বেষ্টিত। আমরা কেন, যে কোন সময় মুসলমানরাই এই দুই অপশক্তির ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়বে কিংবা তাদের ফাঁদে পা দেবে, মুসলমানরা আত্মকলহে জড়িয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে।

আর স্বজাতিও স্বধর্মের ক্ষমতা লোভীরা তো আমার জঘন্য শত্রু। ক্ষমতার মোহ আর রাজত্বের লালসা এদেরকে আমার বিরুদ্ধে লাগিয়ে রেখেছে।

ইসরাঈল সেলজুকী বাস্তবেই একটা সামরিক শক্তি হয়ে উঠেছে। আমি ইচ্ছা করলে এই শক্তি শেষ করে দিতে পারি। বেঈমানরা তাই চায়। কিন্তু আমি কাফের বেঈমানদের আকাঙ্খা পূরণ করতে চাই না। আমি ইসরাঈল সেলজুকীকে আমার শর্ত মানাতে চেষ্টা করবো। প্রয়োজনে আমি একটা এলাকা তাকে দিয়ে দেবো।

* * *

এই ঘটনার বিশ বাইশ দিন পর পাহাড়ের পাদদেশের একটি মনোরম জায়গায় ইসরাঈল সেলজুকী বসেছিল। তার পাশে স্ত্রী মারয়াম এবং অর্ধ বয়স্ক দু'জন লোক। তা ছাড়া যে চার সেলজুকী গযনীতে সুলতান মাহমূদকে হত্যা ষড়যন্ত্রে গ্রেফতার হয়েছিল তারাও ছিল। তারা সেলজুকী নেতা ইসরাঈলকে তাদের গ্রেফতার ও মুক্তি পাওয়ার ঘটনা সবিস্তারে জানালো। তারা এও জানালো, সুলতান মাহমূদ তাদের কি বলে মুক্তি দিয়েছেন এবং ইসরাঈলের কাছে কি পয়গাম পৌঁছাতে বলেছেন।

তোমরা বলছো, সুলতান মাহমূদ আমাদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটা এলাকা দিয়ে দিতে চায়- বললো ইসরাঈল। আচ্ছা! একথা কি সে

সত্যিকার অর্থেই বলেছে? না তোমাদের প্রতি এই বলে তিরস্কার করেছে? একথা বলার সময় তার ভাবভঙ্গি কেমন ছিল? সে কি গর্ব অহংকারে আমাদের প্রতি তাচ্ছিল্য করে একথা বলেছে?

না সর্দার! জবাব দিল এক সেলজুকী। সে অহংকার নিয়ে একথা বলেনি। যদি তার মনে আমাদের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব থাকতো তাহলে একথা বলতো না। আপনি চাইলে সে আপনার সাক্ষাতে এখানেও চলে আসতে পারে।

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে সেলজুকীরা এখন এমন শক্তি অর্জন করেছে যে, তারা যে কাউকে তাদের শর্ত মানতে বাধ্য করতে পারে— বললো মারয়াম।

মারয়ামের কথা আগেই বলা হয়েছে। সুলতান মাহমূদের আজীবন শত্রু এলিক খানের ভাতিজী এই সুন্দরী তরুণীর চিন্তা ভাবনা ও মন মানসিকতা ছিল এলিক খানের মতোই ইসলাম বিরোধী। সে বিয়ের আগেই ইসরাঈলকে বলেছিল— সুলতান মাহমূদকে যে হত্যা করতে পারবে, তার জন্যে আমি জীবন যৌবন সব কিছু কুরবান করে দিতে প্রস্তুত। ইসরাঈল সেলজুকী সুলতান মাহমূদকে চক্রান্ত করে হত্যা করবে, এই প্রত্যাশায়ই এলিক খান মারয়ামকে ইসরাঈলের কাছে বিয়ে দেয় এবং মারয়ামও এই নেশায়ই ইসরাঈলকে বিয়ে করে যে, ইসরাঈল মাহমূদকে হত্যা করে গযনীর রাজা হবে। আর মারয়াম হবে রাজ রাণী।

কিন্তু মারয়াম এখন বুঝতে পারছিল, ইসরাঈল সেলজুকী সুলতান মাহমূদের প্রস্তাব নিয়ে কিছু একটা ভাবছে। একটি স্বাধীন এলাকা পেয়ে গেলে সে এখন সুলতান মাহমূদের সাথে বিবাদে জড়াতে চাচ্ছে না।

এক পর্যায়ে ইসরাঈল সেলজুকী গযনী থেকে ফিরে আসা চার সেলজুকী ও অর্ধবয়স্ক দুই বিদেশী লোককে বিদায় দিয়ে দিল। তারা চলে গেলে তার কাছে থাকল শুধু স্ত্রী মারয়াম। এই সুযোগে স্বামীর উদ্দেশে মারয়াম বললো—

আমি একথা শুনতে চাই না যে, আপনি সুলতান মাহমূদের সাথে কোন বিষয় নিয়ে সমঝোতা করেছেন। আপনার পরাজিত হওয়ার ব্যাপারটি ছিল একটা দুর্ঘটনা। এখন আপনার এমন শক্তি আছে যে, আপনার কাউকে ভয় করার দরকার নেই। আপনার গোত্রের লোকেরা ছাড়াও আলাফতোগীন আছে আপনার সাথে, তোগাখানও আপনার সহযোগী। এখন আপনার কারো ঢোপ গেলার দরকার নেই। আপনি ইচ্ছা করলেই যে কারো কাছ থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

শোন মারয়াম! আমি জানি, সুলতান মাহমূদকে তোমার ঘৃণা করার কারণ। তোমার রাজ রাণী হওয়ার স্বপ্ন পূরণে সে প্রধান বাধা। আমি তোমার রাজরাণী হওয়ার স্বপ্ন ঠিকই পূরণ করে দেবো। কিন্তু সংঘাতে যাওয়ার আগে আমাদের একটা নিজস্ব ঠিকানা দরকার, যে ঠিকানাটিকে আমরা আমাদের দেশ বলতে পারবো। একটি দেশ হলে আমরা সেখানে নিয়মিত একটি সেনাবাহিনী গঠন করতে পারবো, তাদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবো। সেখানে আমাদের একটা মজবুত দুর্গ থাকবে। এখন তো আমাদের অবস্থা এমন যে, আমাদেরকে কেউ তাড়া করলে আমাদের আত্মরক্ষার কোন জায়গা নেই। আমাদেরকে লোকেরা জংলী যাযাবর, ছিন্নমূল ইত্যাদি বলে ডাকে। এজন্য মাহমূদের কাছ থেকে কিছু একটা আদায় করার সুযোগ দাও আমাকে।

ইসরাঈল সেলজুকীর কথার মর্ম বুঝতে পেরেছিল মারয়াম। কিন্তু তাদের কাছে বসা বিদেশী দুই লোক চাচ্ছিল না মারয়াম ইসরাঈলের কথার মর্ম উপলব্ধি করুক।

রাতের বেলা এই বিদেশী দু'জন লোক একটি দেয়ালের মতো জায়গার আড়ালে বসেছিল। তাদের কাছে ছিল ইসরাঈলের স্ত্রী মারয়াম। মারয়াম দুই বিদেশীকে বলছিল, সুলতান মাহমূদকে হত্যা করার শর্তে আমি তাকে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সে গযনী শাসকের ফাঁদে পা দেবে। সে আমাকে বলেছে, তাকে যেনো আমি মাহমূদের কাছ থেকে একটা অঞ্চল হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ দেই। কিন্তু তার নিয়তের ব্যাপারেই এখন আমার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, সে মাহমূদের কেনা গোলামে পরিণত হবে।

ইসরাঈল ছাড়া তোমার দৃষ্টিতে নেতৃত্ব দানের মতো এই গোত্রে কি দ্বিতীয় কেউ আছে? মারয়ামকে জিজ্ঞেস করল একজন।

হ্যা, অবশ্যই আছে। আর সে হলো তোগাখান। দরকার হলে তাকে আমি বিয়ে করে নেবো।

আরে! সে আমার জন্যে এতাটাই পাগল যে, যখন শুনলো আমি ইসরাঈলকে বিয়ে করেছি তখন বিষ খেয়ে মরে যেতে চাচ্ছিল। একথা জানতে পেরে আমি তার সাথে সাক্ষাত করি। তখন তার অনেকটা পাগলের মতো অবস্থা। অথচ সে ছিল তার বাবার একমাত্র স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য। কিছু দিন পরেই তার বাবা ম্যরা গেল। সে হলো তার বাবার স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু তার মাথা ঠিক ছিল না। তার এই অবস্থা হোক সেটি আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। ফলে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করার জন্যে আমি ইসরাঈল

সেলজুকীর স্ত্রী হওয়ার পরও চুরি করে তোগা খানের সাথে সাক্ষাত করেছি । তাকে সঙ্গ দিয়েছি।

গোপনে গোপনে তার সাথেও আমার স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা আজ পর্যন্ত চালু আছে। এখন আমার মনে হচ্ছে ইসরাঈলের মৃত্যুই হবে আমাদের জন্যে উপকারী। তোগাখানই আমাদের আশা পূরণের যোগ্য ব্যক্তি।

এরা তিনজন চাঁদনী রাতের আলো আধারীর মধ্যে যে জায়গাটায় বসে কথা বলছিল, হঠাৎ সেই জায়গায় একটা ছায়ার মতো দেখা গেল এবং ধীরে ধীরে ছায়াটি দূরে সরে গেল। বিদেশী দু'জনই সেই ছায়া দেখে দাঁড়িয়ে গেল। তারা দেখতে পেল, আকাশের যেখানে চাঁদটা ভাসছে এর নীচ দিয়ে একটা ছায়ার মতো কি জানি সরে যাচ্ছে।

কি হয়েছে? অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞেস করলো মারয়াম।

আমার মনে হয় চাঁদের উপর দিয়ে মেঘ ভেসে গেছে। এজন্য ছায়া পড়েছে— বললো একজন বিদেশী।

* * *

পরের দিনের ঘটনা। তখন সকাল বেলার সূর্য উঠে গেছে। মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সব দিকে। পাহাড়ের সবুজ বৃক্ষ-লতায় ভোরের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। তিন দিকে দেয়ালের মতো পাহাড় ঘেরা একটি ফাঁকা জায়গা। মাঝখানটা সমতল। সমতলের ঠিক মাঝখানে পাশাপাশি তিনটি বড় গাছ। ভারি সুন্দর জায়গা। মাঝখানের গাছটির সাথে যেন পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মারয়াম। তার হাত পেছন মোড়া করে বাধা। আর তার পা ও শরীর একটি রশি দিয়ে গাছের সাথে প্যাঁচানো। তার ডান ও বাম পাশে মারয়ামের গত রাতের গল্পের সঙ্গী দুই বিদেশীও একইভাবে গাছের সাথে বাঁধা। তাদের সামনের ফাঁকা জায়গাটায় ইসরাঈল সেলজুকী পায়চারী করছে। আর তাদের সোজা সামনে দশ বারো গজ দূরে তিন জন তীরন্দাজ ধনুকে তীর ভরে তাদের প্রতি ধনুক তাক করে রেখেছে।

আমি জানতাম তোমরা ইহুদী, তোমরা মুলমানদেরকে পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে দিতে পটু। দুই বিদেশীর উদ্দেশ্যে বললো ইসরাঈল। কিন্তু আমি তা জেনেও কয়েকজন মেয়ে ও কয়েকজন পুরুষকে সুলতান মাহমূদের সৈন্যদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্যে প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ দিয়ে ছিলাম। তোমরা সেই কাজে মনোযোগী না হয়ে অবশেষে আমাকেই হত্যার নীল নকশা করছো। অবশ্য

আমাকে একজন বলেছিল, ইহুদীরা সাপের মতো। এরা নিজ প্রভুকেই ছোবল মেরে বসে। আর এই কাল নাগিনীটাকে দেখো, তার স্ত্রী মারয়ামের প্রতি ইশারা করে বললো ইসরাঈল। এক সাথে সে দু'জনের স্ত্রী হিসেবে কাজ করছে। বিদ্রূপের একটা হাসি দিয়ে মারয়ামের উদ্দেশ্যে বললো— তুমি রাজরানী হতে চাচ্ছিলে? একবারও চিন্তা করলে না, তুমি কার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছো?

আমি তোমাকে শেষ বারের মতো বলছি— সুলতান মাহমূদের ফাঁদে পা দিয়ো না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো মারয়াম।

হ্যাঁ, যা বলার শেষ বারের মতো বলে ফেলো। আমিও তোমাকে শেষ বারের মতো বলে দিচ্ছি— তুমি আমাকে ধোকা দেয়ার পরও আমি তোগা খানের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখবো। সেই সাথে সুলতান মাহমূদের সাথেও আমার শত্রুতা বজায় থাকবে। একদিন মানুষ গযনী সালতানাতের কথা ভুলে যাবে। সেলজুকী সালতানাতই তাদের কাছে মুখ্য বিষয় হয়ে উঠবে।

ইসরাঈল বুক টান করে মাথা উচিয়ে উদ্যত কণ্ঠে বললো— আমি অবশ্যই সুলতান মাহমূদের কাছ থেকে একটা এলাকা নিয়ে নেবো এবং সেই এলাকাই হবে গযনীর সেনাবাহিনী, সুলতান মাহমূদ এবং গযনী সালতানাতের কবর রচনার উৎস।

তোমার মতো উগ্র, মূর্খ উপজাতি লোকেরা শত্রুর জন্যে গর্ত খুঁড়ে নিজেরাই সেই গর্তে পতিত হয়— বললো এক ইহুদী। শোন ইসরাঈল! তোমার নাম ইসরাঈল রাখা হয়েছে। তোমার গায়ে ইহুদী রক্ত রয়েছে বলে। এই ইহুদী রক্তের মান রাখার জন্যে আমি তোমাকে খুব মূল্যবান একটা কথা বলছি। মনোযোগ দিয়ে শোন।

তুমি ঠিকই বলেছো, আমরা দু'জনই ইহুদী। কিন্তু আমরা দু'জনই আমাদের পোষাক-আশাক মুসলমানদের মতো করে রেখেছি। আমরা তোমাদের ইসলাম সম্পর্কে এতোটুকু জানি, যা তোমাদের ইমাম ও আলেমরাও জানে না। আমরা তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করে দিতে পটু।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ আমরা তোমার হাতে বন্দি। ঘটনা যা ঘটেছে তাহলো, তোমার কোন লোক আমাদের গোপন কথাবার্তা শুনে ফেলেছিল। নয়তো যে চমৎকার কৌশল ও নৈপূন্যের সাথে আমরা তোমার স্ত্রীর হাতে তোমাকে খুন করাতে যাচ্ছিলাম তুমি এর প্রশংসা না করে পারবে না। এটাও দেখেছো, কিভাবে আমরা সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রায় ভাঙ্গন ধরিয়ে ছিলাম এবং মাহমূদের বিরুদ্ধে তোমাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে সফল হয়েছিলাম।

শোন ইসরাঈল! শেষ কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি? তুমি যতোই চেষ্টা করো না কেন, সুলতমান মাহমূদকে তুমি পরাজিত কিংবা খুন কিছুই করতে পারবে না। অচিরেই এক মারাত্মক পরিণতির শিকার হবে তুমি। কারণ মাহমূদ পাক্কা ঈমানদার লোক যাদের ঈমান দুর্বল তারা পাক্কা ঈমানদারদের মোকাবেলায় পরাজিত হতে বাধ্য। কার ঈমান পাকা আর কার ঈমান কাচা এ নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। আমাদের কাজ হলো, দুর্বল সবল সকল মুসলমানদেরকে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত রেখে মুসলিম শক্তি ও ঐক্যকে দুর্বল করে রাখা। সাধারণ সংঘর্ষে দুর্বল ঈমানদারদের পরাজিত হতে হয়, কিন্তু আমরা তাদেরকেই বলি, তোমরাই পাক্কা ঈমানদার। লেগে থাকো বিজয় তোমাদেরই হবে।

অভিশপ্ত ইহুদী। দাঁতে দাঁত পিষে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো হিসরাঈল। আমার সামনে মৃত্যু মুখে দাঁড়িয়েও আমাকে অপমান করছো? যাও, জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবো তোমাদেরকে। কথা শেষ করে দ্রুত এক দিকে সরে গেল ইসরাঈল এবং ধনুক তাক করে থাকা তিনজনকে ইঙ্গিত দিল। মুহূর্তের মধ্যে তিনটি তীর তিনজনের বুকে বিদ্ধ হলো।

আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলো মারয়াম। ব্যথায় কুঁকিয়ে উঠলো ইহুদী দু'জন। কিন্তু কেউ বাঁচার জন্যে আকুতি করলো না। কারণ তারা জানে, খুনের চক্রান্তে জড়িত লোকদেরকে ইসরাঈলের মতো লোক কিছুতেই ক্ষমা করবে না। অতএব ক্ষমা ভিক্ষা অর্থহীন।

অতি লোভ আর মারয়ামের রাণী হওয়ার আকাঙ্খার এখানেই সমাপ্তি ঘটলো। সমাপ্তি ঘটলো মারয়াম অধ্যায়ের।

* * *

এরপর কেটে গেল কয়েক মাস। হঠাৎ এক দিন হিন্দুস্তান থেকে গযনী বাহিনীর এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা সুলতানের কাছে খবর নিয়ে এলো। এই খবর পাঠিয়েছেন কন্নৌজে নিয়োজিত গভর্ণর সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকী।

গোয়েন্দা সুলতানকে জানালো, কন্নৌজের গভর্ণর গোয়ালিয়র ও কালাঞ্জরে বহু গোয়েন্দা নিয়োজিত করেছিলো যখন কালাঞ্জরে মহারাজা গোবিন্দ পালিয়ে গেলেন। বিশেষ করে আমি রাজা গোবিন্দের রাজধানী কালাঞ্জরে পৌছার সাথে সাথেই ঋষীর বেশ ধরে সেখানে পৌছি। আমি গিয়ে মন্দিরের পুরোহিতদের আস্তানায় ঠাঁই নিই।

তখন গোটা রাজধানী ছিল ভয় আতংকে কম্পমান। লোকদের মধ্যে এতোটাই আতংক ছড়িয়ে পড়ে ছিল যে, কেউ ঘর থেকে বের হওয়ার সাহস করতো না। মন্দিরের শিংগা ও ঘন্টাগুলো অবিরত ঘন্টা বাজিয়ে এই আতংককে আরো ভয়াবহ করে তুলেছিল। আমি দেখিনি, আমাকে জানানো হয়েছে, রাজা গোবিন্দ রাজধানীতে পৌঁছে দুই দিন মন্দিরে ছিলেন। রাজ প্রাসাদে তাকে দেখা যায়নি। কিন্তু দু' দিন পর রাজার অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যায়। তিনি পূর্ণ স্বাভাবিকতা ফিরে পান এবং কেন এমনটি হলো এর কারণ উদঘাটন করতে শুরু করেন।

একদিন ঋষির বেশে আমি শহরের একটি গলি দিয়ে হাটছিলাম। একটি বাড়ির আঙিনায় এক যুবতী মহিলাকে মাটিতে পড়ে কাঁদতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলাম- মা! কাঁদছো কেন?

সে দাঁতে দাঁত পিষে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো- তুমি সন্যাসী সেজেছো? আমার বাচ্চাকে ফিরিয়ে দাও। তার সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, মন্দিরের পুরোহিতরা রাজার এই অবস্থা দেখে পরামর্শ দিয়েছে, তিনটি পাঁচ ছয় মাসের শিশু বলি দিতে হবে।

যেই কথা সেই কাজ। রাজার নির্দেশে শহরে খোঁজ খবর নিয়ে তিন মায়ের কোল খালি করে তিনটি শিশুকে নিয়ে বলি দিয়ে তাদের রক্ত দিয়ে রাজাকে গোসল করানো হয়।

আহা! মহিলাটি কেঁদে কেঁদে আমাকে বলছিল, আমার নিষ্পাপ বাচ্চাটিকে যারা খুন করেছে, তাদের একদিন না একদিন শাস্তি হবেই হবে।

সেই গোয়েন্দা বললো- আমি বেশীর ভাগ সময় মন্দিরেই কাটিয়েছি। পুরোহিতদের সাথে আমার বেশ সখ্যতা গড়ে উঠলো। ফলে আমার পক্ষে রাজ মহলের অভ্যন্তরীণ খবরাখবরও জানার সুযোগ হয়েছিল। সুলতান!

আবেদীন! একথা ভুলে যাও, আমি কোন গযনীর সুলতান বা আদৌ সুলতান কি না। তুমি আমাকে সেই সব না বলা কথা শোনাও, যা কোন বন্ধু একান্ত বন্ধুকে শুনিয়ে থাকে।

জী সুলতান! আমি বলছিলাম, হিন্দুদের মন্দিরের রহস্যজনক, জটিল ও প্রতারণাপূর্ণ কর্মকাণ্ড দেখলে মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। হিন্দু ধর্মে নারীর প্রভাব যথেষ্ট।

অন্ধকার গুহার মধ্যে চামচিকারা যেভাবে ঝাকে ঝাকে থাকে ওখানকার পথে ঘাটে এভাবেই গিজগিজ করে যুবতী নারীরা। একদিন আমি একটি বাড়ীর

অন্ধকার আঙিনা পেরিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার সাথে একটি মেয়ের ধাক্কা লাগল। কাঁদছিল। আমাকে পেয়ে সে অনুরোধ করতে লাগল, দয়া করে এখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। আমি আজীবন আপনার দাসী হয়ে থাকবো। আমি মরতে চাই না। রাজার জন্যে আমি জীবন বিলিয়ে দিতে চাই না।

সে ছিল তরুণী। ভয়ে কাঁপছিল সে। আমাকে জড়িয়ে ধরলো। জীবন বাঁচানোর জন্যে আমাকে হাতে পায়ে ধরে অনুনয় বিনয় করতে লাগল। তার কথা শুনে আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না, এই তরুণী কারো না কারো কুমারী কন্যা। মন্দিরের পুরোহিতরা তাকে বলী দেয়ার জন্যে তুলে নিয়ে এসেছে।

আমাকে ক্ষমা করবেন সুলতান! তরুণীর অনুরোধে আমি আমার কর্তব্য ভুলে গেলাম। মূলত আমার সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল রাজা গোবিন্দের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু একটা নিরপরাধ মানুষের জীবন এভাবে নষ্ট হতে দেখে আমার মধ্যে মানবিক দায়বোধ সৃষ্টি হলো। আমি মেয়েটিকে যথাসম্ভব আশ্বস্ত করতে বললাম– ঠিক আছে, তুমি শান্ত হও। দেখি তোমার জন্য আমি কি করতে পারি।

আমি মনে মনে আল্লাহর কাছে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ! মানুষের জন্যে এখানে মানুষকে জবাই করা হয়। আমি এই অনর্থক জবাই হওয়া থেকে তোমার এক নগন্য বান্দিকে বাঁচাতে চাই, এর বদৌলতে তুমি আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য সফল করে দাও।

অন্ধকার আঙিনায় হঠাৎ আমি একটু আশার আলো দেখতে পেলাম। মেয়েটি আমাকে তাগাদা দিচ্ছিল আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন। যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যান। তাড়াতাড়ি করুন। আমি মন্দিরের বদ্ধ কক্ষ থেকে পালিয়ে এসেছি। মন্দিরের পুরোহিতরা হয়তো আমাকে খুঁজছে।

মেয়েটি তখন থরথর করে কাঁপছিল।

এমন সময় আমার কানে কারো দৌড়ানোর শব্দ ভেসে এলো। আমি মেয়েটিকে বললাম– তোমাকে নিয়ে তো আমি বিপদে পড়বো। মনকে শক্ত করে এখন কান্না থামাও। এরপর মেয়েটিকে এক হাতে ধরে তাকে নিয়ে একটি দেয়ালের ভাঙ্গা অংশ দিয়ে একটি পরিত্যক্ত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

আমরা ঘরের ভেতরে ঢুকতেই বাইরে থেকে কানে ভেসে এলো, এ ঘরে ঢুকে দেখো। এতো অল্প সময়ের মধ্যে যাবে কোথায়?

সন্ন্যাসীর পোষাকের ভেতরে আমি খঞ্জর লুকিয়ে রেখেছিলাম। সেটি বের করে প্রস্তুতি নিয়ে নিলাম। বাইরে হয়তো দু'জন লোক ছিল। ভাঙ্গা দেয়াল দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল একজন। আমি তখন দরজাবিহীন খালি জায়গাটায় দেয়ালের আড়ালে ওৎপেতে রইলাম। লোকটি ঘরের দরজায় এসেই হাঁক দিল। কে এখানে? ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকারে লোকটিকে ভূতের মতো একটা ছায়া মনে হচ্ছিল। আমি তাকে খঞ্জরের আঘাত না করে এক ঝাপটায় তার ঘাড় পেঁচিয়ে ধরলাম এবং আমার বাহুতে আটকে ফেললাম। তার পক্ষে কোন কথা বলা সম্ভব হলো না।

বাইরে থেকে আওয়াজ এলো– ভেতরে কেউ আছে, না নেই?

আমি বললাম– নেই। তোমরা সামনে দৌড়াও।

মুহূর্তের মধ্যে আমার কানে এলো দৌড়ানোর শব্দ। এদিকে আমি যার গলা আটকে রেখে ছিলাম এমনভাবে তার গলায় চাপ দিলাম যে, সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কয়েকটা ঝাকুনি দিয়ে নেতিয়ে পড়ল। মৃত্যু নিশ্চিত হলে আমি তাকে ফেলে দিয়ে দ্রুত তার শরীরের কাপড় খুলে মেয়েটিকে পরিয়ে দিলাম। তরুণীর চুলছিল খোলা? এলোমেলো। তা ছাড়া তার চেহারাও বেশ সুন্দর। আমি মেঝেতে হাত দিয়ে ধুলোবালি হাতে নিয়ে তার চেহারায় মাখলাম এবং কাপড় দিয়ে তার মাথা পেঁচিয়ে ফেললাম। আর মৃত পুরোহিতের গলার মালাটি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে তার লেবাস সূরত সম্পূর্ণ বদলে ফেললাম।

এরপর তাকে নিয়ে সদর রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। আলোকিত প্রশস্ত রাস্তা দিয়েই আমি তাকে নিয়ে প্রধান মন্দিরের একটি পরিত্যক্ত জায়গায় চলে এলাম। এই জায়গাটিতে ময়লা ও শেওলা পরে সবুজ আঁঠার মতো হয়েছিল। আমি এই আঁঠালো ময়লা হাতে নিয়ে মেয়েটির চেহারায় ও চুলে মেখে তাকে পুরোদস্তুর সন্ন্যাসীনীর রূপ দিলাম।

এদিকে মন্দিরের ভেতরে বাইরে তরুণীর খোঁজে দৌড় ঝাপ শুরু হয়ে গেলো। পুরোহিত ও তাদের চেলারা এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছিল। আমাদের পাশ দিয়েও অনেকে ছুটাছুটি করেছিলো কিন্তু আমাদের প্রতি কেউ সন্দেহ করেনি এবং সন্যাসী বেশের তরুণীকে কেউ চিনতে পারেনি। এরপর আমি মেয়েটিকে মন্দিরের চৌহদ্দি থেকে বের করে শহরের কাছাকাছি একটি জঙ্গলে নিয়ে গেলাম।

মন্দির থেকে নিরাপদ জায়গায় পৌছলে মেয়েটি আমাকে জানালো, আর দু'এক দিনের মধ্যেই আমাকে বলি দেয়া হতো। মেয়েটি আমাকে আরো

জানালো, তার বাবা কিছুতেই তার বলিদানে সম্মত ছিল না। কিন্তু রাজার একান্ত সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও পুরোহিতরা তাকেও হত্যার এবং তার উভয় মেয়েকেই তুলে নেয়ার হুমকী দেয়। সেই সাথে তাকে সরকারী চাকুরী থেকেও বরখাস্ত করে কঠিন শাস্তি দেয়ার হুমকী দেয়া হয়।

মেয়েটিকে নিয়ে রাতটি আমি জঙ্গলেই কাটালাম এবং দিনের বেলায় তাকে একটি নিরাপদ আস্তানায় রেখে সন্ধ্যার পর তার বাবার সাথে সাক্ষাত করলাম। সাক্ষাতে মেয়েটির বাবাকে জানালাম, তার মেয়ে এখন একটি নিরাপদ আস্তানায় আছে। লোকটি খুবই আতংকিত ছিল। সে আমাকে জানালো, ইতিমধ্যে তার ঘরে তল্লাশী চালানো হয়েছে। তাকে রাজার লোকেরা হুমকী দিয়ে গেছে। যদি তার মেয়েকে খোঁজে না পাওয়া যায় তাহলে তার অন্য মেয়েটিকে তুলে নেয়া হবে। সে আরো জানালো, আমার পক্ষে কোন অবস্থাতেই মেয়েটিকে ঘরে জায়গা দেয়া সম্ভব নয়। কারণ, পালিয়ে আসা মেয়েকে বাড়ীতে পেলে রাজার লোকেরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করবে।

লোকটি আমাবে দেখে খুবই অবাক হলো। কেননা, আমার লেবাস সূরত ছিল সন্ন্যাসীর। একজন সন্ন্যাসী কি করে মন্দিরে বলিদানের জন্যে আটক তরুণীকে পালানোর ব্যা'পারে সহায়তা করতে পারে?

আমি তাকে বললাম, আসলে আমি সন্ন্যাসী নই। তবে আমার আসল পরিচয় তাকে তখনো জানাইনি। আমি তাকে বললাম, আপনি যদি অন্য মেয়েটিকে নিয়েও শংকাবোধ করেন তাহলে তাকেও আমি নিরাপদ জায়গায় পৌছে দিতে পারি।

লোকটি পড়ে গেল দোদুল্যমান অবস্থায়। একদিকে তার দুই সন্তানের জীবন, অপর দিকে তার নিজের অস্তিত্ব। এক পর্যায়ে সে বললো, আমরা সবাই যদি এখান থেকে চলে যেতে চাই তবে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?

আমি বললাম, আমি ইচ্ছা করলে আপনাদেরকে কন্নৌজ দুর্গে পৌছে দিতে পারি।

এক পর্যায়ে লোকটি তার অপর মেয়ে ও স্ত্রীসহ কন্নৌজ চলে যেতে রাজি হলো। সে ছিল একজন উচ্চ পদস্থ রাজ কর্মচারী। ফলে কন্নৌজ যাওয়ার জন্যে একটি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা সে করে ফেললো। পরে আমি তার দুই মেয়েকেই সন্ন্যাসীর বেশে সাজিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে সওয়ার হয়ে শহরের বাইরের জঙ্গল থেকে রওয়ানা হলাম। আর মেয়েদের বাবা পৃথক ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আমাদের অনুসরণ করলো।

সাধারণত হিন্দুদের স্বভাব হলো, বিপদে পড়লে তারা তাদের স্ত্রী-কন্যাদের ফেলে নিজেদের জীবন নিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু এই লোকটি ছিল ব্যতিক্রম। সে তার মেয়ে দুটোকে প্রাণাধিক ভালোবাসতো। মেয়েদের জীবন রক্ষার্থে সে তার নিজের জীবনও ঝুকির মধ্যে ফেলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

পথিমধ্যে একবার বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় বিরতির আগেই আমরা রাজা গোন্ডার এলাকা অতিক্রম করতে সক্ষম হলাম। তখন মেয়েদের বাবাও আমাদের সাথে মিলিত হলো এবং আমাকে বললো, আমার মেয়ে দুটোর জীবন বাঁচানোর জন্যে সে আমাকে পুরস্কৃত করতে চায়। এজন্য সে তার বাড়ী থেকে প্রচুর সোনা দানা নিয়ে এসেছে। আমি তাকে জানালাম, আমার এসবের দরকার নেই এবং সোনা দানার প্রতি আমার কোন আগ্রহও নেই। কারণ, আমি মুসলমান। আমি কালাঞ্জরে ছদ্মবেশে অবস্থান করছিলাম রাজা গোবিন্দের অবস্থা ও তার যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। এটিই আমার মূল কর্তব্য।

একথা শোনে লোকটি খুশী হয়ে বললো, আরে মহারাজার সব খবরতো তোমাকে আমিই দিতে পারি। কারণ, গুরুত্বপূর্ণ রাজ কর্মচারী ছিলাম আমি। মহারাজা ও রাজপ্রাসাদের সব অভ্যন্তরীণ বিষয় আমার নখদর্পণে। রাজমহলের সদর অন্দর সব খবরই আমি জানি। আমি তোমাকে সবই বলতে পারবো। সে জানালো–

মহারাজা গোবিন্দ রণাঙ্গন থেকে মারাত্মক এক আতংক নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু এই ভয়ের কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তুমি যেহেতু হিন্দুস্তানে থাক, তাই তুমি হয়তো জানো, আমাদের সাধু সন্ন্যাসী ও যোগী ঠাকুররা এমন কিছু বিষয় জানে, তারা ইচ্ছা করলে যে কারো মাথা খারাপ করে দিতে পারে।

কিছু কিছু যোগী হিমালয়ের শৃঙ্গে চলে যায়। সেখানকার বরফ কখনো গলে না। সেখানে তারা উলঙ্গ অবস্থায় থেকে সাধনা করে। এরা এমন শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয় যে, দূরে থেকেও তারা যে কারো উপর যাদুর খেলা চালাতে পারে।

আসলে মহারাজা গোবিন্দ এতোটা হীনবল ছিলেন না যে, তিনি তিনগুণ সৈন্য থাকার পরও গযনী বাহিনীর মোকাবেলা না করেই রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসবেন। কিন্তু তারপরও যখন মহারাজা পালিয়ে গেলেন, তখন কালাঞ্জরে এতোটাই আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল যে, লোকজন বাড়ীঘর ছেড়ে শহর থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তখন বাতাসে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, মানুষ খেকো গযনীর সেনারা এ দিকে ধেয়ে আসছে।

এ অবস্থায় এক যোগী বললো, মহারাজাকে কেউ যাদু করেছে। সে যাদুর প্রভাব মুক্ত করার কাজে লেগে গেল। তিনটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বলি দিয়ে সেই রক্ত পানির সাথে মিশিয়ে মহারাজাকে গোসল করানো হলো।

এক পর্যায়ে যাদুর প্রভাব কেটে গেল। মহারাজা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল। জানা গেল, রাজারই এক রাণী তার ছেলেকে রাজার স্থলাভিষিক্ত করার জন্যে এই যাদু করিয়েছিল। কারণ রাজা সেই রাণীর পুত্রকে তার স্থলাভিষিক্ত না করে অন্য রাণীর পুত্রকে স্থলাভিষিক্ত করার ঘোষণা দিয়েছিল। ফলে রাণী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে রাজার উপর যাদু চালায়।

রাণীর যাদুর ব্যাপারটি জানতে পেরে রাজা গোবিন্দ অভিযুক্ত রাণীও তার ছেলের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। রাণী মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনে রাজার কাছে আবেদন করে, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাকে মৃত্যু দণ্ড দিলেও তার নিরপরাধ পুত্রকে যেন রাজা ক্ষমা করে দেন। রাজা শর্ত দিলেন, যে যোগী এই যাদু করেছে তার পরিচয় বললে তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হবে। রাণী বললো, যে সন্ন্যাসী এখন আপনাকে সুস্থ করেছে সেই সন্ন্যাসীই যাদু করেছিল। বিষয়টি জানার পর রাজা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। রাজা এই রাণীর সাথে তার পুত্রকেও হত্যা করে এবং সেই যোগী সন্ন্যাসীকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়।

এর পর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাজাকে বললো– আপনার আশু বিপদ মুক্তির জন্য একটি কুমারী তরুণীকে বলিদান করতে হবে। তারা তরুণীর গুণাবলী বললো, এবং আমার ছোট মেয়েকে নির্বাচন করলো।

অবশ্য আমি আমার মেয়েকে নির্বাচন করার কারণ বুঝতে পেরেছিলাম। পণ্ডিতেরা একবার আমার বড় মেয়েকেও বলি দেয়ার প্রস্তাব করেছিলো। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম।

তুমি মুসলিম। তোমরা তো বুঝবে না দেবতাদের অসন্তুষ্ট করলে আমাদের সবকিছুই বরবাদ হয়ে যায়। পণ্ডিতেরা যদি কোন কারণে ক্ষুব্ধ হয় তাহলে আমাদের মাথার উপর আসমান ভেঙে পড়ে। কারণ পুরোহিত আর পণ্ডিতদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি আর চাওয়া পাওয়াই আমাদের ধর্মের মূলভিত্তি।

মাননীয় সুলতান! এরপর লোকটি আমাকে জানালো, মাথা ঠিক হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রাজা গোবিন্দ সকল সৈন্যদের একত্রিত করে তাদের বলল, আমার উপর এক যোগী যাদু করেছিল। যাদুর প্রভাবে আমার মাথা ঠিকমতো কাজ করছিল না। আমরা রণাঙ্গণ ছেড়ে আসায় মুসলমানরা হয়তো আনন্দে আত্মহারা যে, তারা বিনা যুদ্ধে বিশাল এক জয় পেয়ে গেছে। এবার আমি নতুন করে গযনী

বাহিনীকে যুদ্ধের আহ্বান করবো। দেখবে? বিজয়ের নেশায় এবার তারা পঙ্গপালের মতো উড়ে আসবে। আর তোমরা ওদের ধরে ধরে বলি দেবে। তোমাদের ঘোড়া ও গরুর গাড়ী ও ঠেলাগাড়ির সামনে দলে দলে ওদের জুড়ে দেবে। ওরা তোমাদের গাড়িগুলোকে গলির মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। হরি হরিদেব আমাকে ইশারা দিয়েছেন, এবার গযনীর মুসলমানরা এখানে ধ্বংস হতেই আসবে।

রাজা গোবিন্দ অসুস্থতা থেকে ওঠে এমন জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল যে, তার সেনাদের মধ্যে নতুন করে যুদ্ধ উন্মাদনা দেখা দিল। শুধু সৈন্যরাই নয় সাধারন জনতাও সৈন্যদের সাথে এসে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো।

এরপর রাজা গোবিন্দ গোয়ালিয়রে রাজা অর্জুনের কাছে চলে গেল। কয়েক দিন সেখানে কাটিয়ে এসে বলল, গোয়ালিয়রের সৈন্যদের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছেন তিনি। গোয়ালিয়র থেকে ফিরে সে লাহোর গেলেন। কিন্তু মহারাজা তরলোচনপাল তাকে হতাশ করল। তরলোচন তাকে সামরিক সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানালো। তবে তাকে বহু সংখ্যক সৈন্য যুদ্ধ সরঞ্জাম, অর্থ সম্পদ দিয়ে বিদায় করল। সেই সাথে আরো আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দিল।

সুলতানে আলি মাকাম! সেই হিন্দু কর্মকর্তা আমাকে জানিয়েছে, লাহোরের সৈন্যরা গঙ্গা যমুনার মিলনস্থলে পৌঁছে গেছে। তাদের গন্তব্য কালাঞ্জর।

মহারাজা গোবিন্দ বলেছেন, এবার তিনি মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে গোটা হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়বেন এবং হিন্দুস্তানের মাটিতে কোন মসজিদের অস্তিত্ব রাখবেন না এবং কোন মুসলমানকে বেঁচে থাকার সুযোগ দেবেন না।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাজা গোবিন্দ কি ফাঁকা বুলি আওড়াচ্ছে, না যা বলছে তা তার করার সামর্থ আছে?

সে বললো, তা করার সামর্থ তার আছে। সে এতোটাই শক্তি অর্জন করেছে যে, রাজা অর্জুনকে সাথে নিয়ে সে লাহোরও দখল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কন্নৌজ, রাড়ী, মহাবন, মথুরা, নগরকোট, মুলতান ও বেড়ায় যে সামান্য সংখ্যক গযনীর সৈন্য রয়েছে তাদেরকে দ্রুত নিঃশেষ করে দেয়া হবে। তোমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। এখন তার প্রস্তুতি খুব ব্যাপক। এই অঞ্চলের প্রতিটি নারীও এখন যুদ্ধে শরীক হতে প্রস্তুত।

* * *

এই গোয়েন্দার নাম আবেদনী। গোয়েন্দা আবেদীন সুলতান মাহমূদকে জানালো, সেই হিন্দু রাজ কর্মকর্তাকে তার দুই মেয়েসহ কন্নৌজ পৌঁছে দেয়া হলো এবং কন্নৌজে তার সাথে খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করা হলো। সে গভর্নর ও সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকীকে বহু সোনা দানা উপহার দিয়ে বললো, আমি শুধু এতটুকুই আপনার কাছে আশা করি যেন আমার মেয়েদের কেউ হয়রানী না করে। সেনাপতি তার সোনাদানা কিছুই গ্রহণ করেননি। তিনি তার পরিবার নিয়ে সম্মানজনকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিছুদিন কন্নৌজে থাকার পর সে মুসলমানদের আচার-আচরণ ও জীবনাচার দেখে এতোটাই মুগ্ধ হলো যে, কন্নৌজ দুর্গের প্রধান ইমামের নিকট গিয়ে সে তার দুই মেয়েসহ ইসলামে দীক্ষা নিল।

গোয়েন্দা আবেদীন সুলতানকে জানালো, সম্মানিত সুলতান! আমরা সেই হিন্দুর সব কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু তার কথা যাচাই করার জন্য আমরা সেইসব জায়গায় খোঁজ নিয়ে দেখেছি, সে যা বলেছিল তার সবই সত্য।

গোয়ালিয়রে আমাদের যে ব্যক্তি দায়িত্বপালন করছে, সে জানিয়েছে– গোয়ালিয়রে জোরদার যুদ্ধপ্রস্তুতি চলছে। সে আরো জানিয়েছে, হিন্দুরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের প্রথম টার্গেট হবে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে থাকা গযনী বাহিনীর সৈন্যরা। এরপর হিন্দুস্তানে বসবাসকারী ছেলে বুড়ো, শিশু মহিলা নির্বিশেষে সকল মুসলমান হবে তাদের পরবর্তী টার্গেট। এরপর সারা হিন্দুস্তানের সৈন্যরা গযনীর দিকে অভিযান চালাবে। গোয়েন্দা আরো জানালো, হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। মন্দিরগুলোতে পণ্ডিতেরা মুসলমান হত্যাকে পূণ্যের কাজ বলে প্রচার করছে।

তুমি কি বলতে পারো, তাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি কোন পর্যায়ে আছে? জানতে চাইলেন সুলতান।

অবশ্যই বলতে পারি সুলতান! বললো গোয়েন্দা আবেদীন। হিন্দু রাজাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। যে সব লোক সেনাবাহিনীতে নতুন যোগ দিয়েছে তারা ততোটা গড়ে উঠতে পারেনি। তবে তারা অশ্বারোহণ, তরবারী চালনা ও তীরন্দাজী জানে। কিন্তু নিয়মিত সেনাদের মতো তারা রণাঙ্গনে মুখোমুখী যুদ্ধের উপযোগী হয়নি। এখনো তাদের প্রশিক্ষণ চলছে।

সেনাপতি আব্দুল কাদের সেলজুকী ও অন্যান্য ক্যাম্পে থাকা কমান্ডারগণ আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে দ্রুত সেনাভিযানের জন্য অনুরোধ করি। তাহলে হিন্দুদের প্রস্তুতি পর্বেই আমরা কাবু করে ফেলতে

পারবো। ওখানকার মুসলমানরা আতংকে আছে, হিন্দুরা না আবার মুসলিম হত্যায় মেতে ওঠে। আমাদের সেনারা তো লড়াই করে প্রাণ দিবে যেহেতু তারা শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত কিন্তু নিরপরাধ একজন মুসলমানের উপর আঘাত এলেও তা হবে আমাদের জন্যে অসহ্যকর।

মাননীয় সুলতান! সাধারণ মুসলমান ও মসজিদগুলোকে আমাদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। হিন্দুরা যদি আক্রমণ করে তাহলে মুসলমান মেয়েদেরকে প্রথম সুযোগেই অপহরণ করবে। এমনটি ঘটলে কেয়ামত পর্যন্ত লোকেরা আমাদের ঘৃণাভরে স্মরণ করবে এবং অভিশাপ দেবে।

হ্যাঁ, বুঝেছি। এবার লাহোরে আমাদেরকে অবশ্যই হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং খুব দ্রুত অভিযান চালাতে হবে- বললেন সুলতান।

* * *

সুলতান মাহমূদ তখনই সকল সেনাপতি ও কমান্ডারদের ডেকে ভারতের অবস্থা জানিয়ে দ্রুত সেনাভিযানের প্রস্তুতি নিতে বললেন। এও বললেন, অভিযান হবে খুব দ্রুত এবং সফরে খুব কম যাত্রা বিরতি দেয়া হবে। চলার মধ্যেই আমাদেরকে খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে হবে। আমাদের প্রথম টার্গেট হবে কালা র দুর্গ। আমরা প্রথমেই কালাঞ্জর দুর্গ অবরোধ করবো। অবরোধ আরোপের পর সৈন্যরা কিছুটা বিশ্রাম সেরে নিতে পারবে। সুলতান সেনাপতিদেরকে যাত্রাপথ ও যাত্রা বিরতির জায়গাগুলো ভৌগোলিক মানচিত্রের সাহায্যে দেখিয়ে দিলেন।

সুলতান মাহমূদ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের দিক নির্দেশনা দিয়ে শেষ করতেই ইসরাঈল সেলজুকীর পয়গামবাহী দূত এসে হাজির। ইসরাঈল সেলজুকীর পয়গামবাহী মৌখিক পয়গামে জানালো, সেলজুকী নেতা বলেছে- সুলতান যদি আমাদের সামরিক শক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমাদেরকে রাষ্ট্রগঠনের জন্যে জায়গা দিতে রাজী হয়ে থাকেন, তাহলে আমি তার জমি গ্রহণ করতে রাজি।

আর যদি তিনি তার সামরিক শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে থাকেন এবং আমাকে ভিখারী মনে করে ভিক্ষা হিসাবে এই প্রস্তাব দিয়ে থাকনে, তাহলে আমি তার এই প্রস্তাব মানতে রাজি নই। আমি আমার জাতির জন্যে একটি ভূখণ্ড অর্জন করার ক্ষমতা রাখি। আমাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে, সুলতান কেন আমার প্রতি এই অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন? সুলতানকে মনে রাখতে হবে, গযনী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার মতো সৈন্যবল আমার আছে।

ইসরাঈল সেলজুকীর বার্তা শুনে সুলতান হেসে বললেন– আমি বিশ্বাস করি, ইসরাঈল সেলজুকীর শক্তি ও সাহস উভয়টিই আছে। কিন্তু বুদ্ধি কিছুটা কম মনে হচ্ছে। তিনি দূতের উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি গিয়ে ইসরাঈল সেলজুকীকে বলবে, আমি তাকেও দুর্বল ভাবছি না, নিজেকেও দুর্বল মনে করছি না। আমি আসলে এই অঞ্চলে একটা শান্তিময় স্থিতিশীল পরিবেশ চাই। কারণ আমাদের পারস্পরিক লড়াইয়ে কাফের ও বেঈমানেরাই শক্তিশালী হবে।

ইসরাঈল সেলজুকীকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, এখন আমি হিন্দুস্তান যাচ্ছি। সে যেন আমার আসার জন্যে অপেক্ষা করে। আমি তাকে তার এলাকায় সবচেয়ে প্রভাবশালী বলেই মনে করি। তবে আমার অবর্তমানে যেন গযনীর বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা না চালানো হয়।

এ পর্যায়ে সুলতান মাহমূদ শংকাবোধ করছিলেন, ইসরাঈল সেলজুকী না আবার তার অবর্তমানে গযনী আক্রমণ করে বসে। কারণ? তিনি জানতেন, সেলজুকীরা এমন শক্তি অর্জন করেছে, তারা ইচ্ছা করলে যে কোন ছোট রাজ্যের শাসককে তরবারী দেখিয়ে শর্ত মানতে বাধ্য করার ক্ষমতা রাখে।

এই প্রেক্ষিতে সুলতান মাহমূদ ইসরাঈল সেলজুকীর দূতকে একটি সবুজ-শ্যামল এলাকা দেখিয়ে বললেন, এই এলাকাটি সেলজুকীদের দেয়া হবে এবং সেলজুকীদের সব শর্তই মানা হবে।

ইসরাঈল সেলজুকীর দূত ফিরে গিয়ে সেলজুকীকে সুলতানের বক্তব্য জানালে সে সুলতানের ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে সম্মতি প্রকাশ করলো।

* * *

১০২৩ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। সুলতান মাহমূদ এমন ক্ষিপ্রগতিতে ভারতে প্রবেশ করলেন যে, আজো তার সেনাদের গতির ব্যাপারটি নিয়ে সামরিক বিশেষজ্ঞগণ বিস্ময় প্রকাশ করেন। গযনী বাহিনী যে গতিতে কালাঞ্জরে পৌঁছেছিল, তখনকার পথ-ঘাট, গযনী থেকে কালাঞ্জরের দূরত্ব বিবেচনায় তা অসম্ভব মনে হয়। তখনকার সেনাবাহিনীর গঠন ও পথঘাটের অবস্থা বিবেচনায় যেকোন সফর ছিলো কঠিন ও দুর্গম। এছাড়াও পথিমধ্যে নদী-পাহাড়-জঙ্গল আরো কতো শত বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে গোয়ালিয়র হয়ে যে বিদ্যুৎগতিতে সুলতান মাহমূদ কালা রে পৌঁছেন তা ছিল এক অপার বিস্ময়।

গযনী থেকে গোয়ালিয়র যেতে ছোট নদীগুলো বাদ দিলেও অন্তত পাঁচটি বড় নদী তাকে পার হতে হয়েছে। তন্মধ্যে সিন্ধু, ঝিলম, চন্নাব, রাবী, সালাজ, গঙ্গা, যমুনা এবং গাম্বল নদী ছিল উল্লেখযোগ্য।

গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন ছিলেন কালাঞ্জরের রাজা গোবিন্দের পরম মিত্র। গোয়ালিয়র দুর্গ আজো কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। সেই যুগে গোয়ালিয়র দুর্গ ছিল কিংবদন্তিতুল্য। দুর্গটি ছিল অত্যন্ত মজবুত শক্ত কাঠামো এবং সমতল থেকে উঁচু জায়গায় অবস্থিত। চতুর্দিকে গভীর খাদের মতো খাল থাকার কারণে গোয়ালিয়র দুর্গ ছিল যে কোন শত্রু আক্রমণে অজেয়।

সুলতান মাহমূদ যখন গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ সম্পন্ন করে ফেলেছেন, তখন রাজা অর্জুন টের পেলেন গযনী বাহিনী এসে গেছে। অবশ্য একটা মোক্ষম সময়ে সুলতান হিন্দুস্তানে পৌঁছাতে সক্ষম হন। দু'দিনের মধ্যে গোয়ালিয়র ও কালাঞ্জরের সৈন্য একত্রিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তারা তখনো অবস্থান করছিল নিজ নিজ রাজধানীতে। তখনো তাদের রণপ্রস্তুতি সম্পন্ন হয়নি।

অবরোধ আরোপ শেষ হতেই সুলতান মাহমূদ বুঝতে পারলেন, এই দুর্গকে কব্জা করা কঠিন। কারণ দুর্গ প্রাচীরের বাইরে যে ঢালু এবং খোলা এলাকা রয়েছে সেখানে কারো পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়ানোই কষ্টকর। তারপরও সুলতান মাহমূদ সৈন্যদের দুর্গ প্রাচীর ও দুর্গ ফটকে আঘাত হানার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, সবাই সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চ আওয়াজে তকবীর ধ্বনি দিতে থাকো।

দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে গযনী সেনাদের লক্ষ্য করে তীর বর্ষণ শুরু হলো। কিন্তু তা দিয়ে মোটেও দমাতে পারলো না গযনী বাহিনীকে। তারা দল বেঁধে একসাথে আঘাত করে দুর্গ ফটক ভাঙতে চেষ্টা করলো। দুটি হাতিকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে এদের কাঁধে দীর্ঘ মোটা একটি গাছের কাণ্ড ঝুলিয়ে দিয়ে হাতিকে দুর্গ প্রাচীরের দিকে দৌড়াতো, হাতি ফটকের দিকে এগিয়ে সজোরে ধাক্কা দিতো, কিন্তু তাতেও দুর্গ ফটক ভাঙা সম্ভব হচ্ছিল না। এর পাশাপাশি গযনীর তীরন্দাজরা দুর্গ প্রাচীরের উপরে থাকা তীরন্দাজদের প্রতি তীর ছুঁড়ে ফটকে হামলাকারীদের সহায়তা দিচ্ছিল।

সকল গযনী যোদ্ধাদের সমস্বরে উচ্চারিত 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠছিল। এভাবে হামলা অব্যাহত থাকল চারদিন। পঞ্চম দিনের সূর্য উদয় হতেই দেখা গেল দুর্গে সাদা পতাকা উড়ছে। সাদা পতাকা দেখে সুলতান মাহমূদ লড়াই বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। এদিন দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে গযনী সেনাদের দিকে কোন তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল না। দুর্গের প্রধান ফটক

খোলা ছিল। এ সময় ফটক পেরিয়ে বাইরে এসে থামল একটি পালকি। পালকিটি বয়ে এনেছিল চারজন সেনা। পালকিটি সুলতান মাহমূদের সামনে এনে রাখা হলো। পালকির ভেতর থেকে বের হলো একজন রাজকীয় পোষাক পরিহিত লোক। সে রাজার দূত। রাজা মৈত্রীর বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন। রাজা অর্জুন যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন ইতিহাসে সেই বার্তার কথা এভাবে লিখিত হয়েছে–

গযনীর সুলতান মাহমূদ গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করে টানা চারদিন এমন জোরদার আক্রমণ চালান যে, চারদিন পর পঞ্চম দিনে মহারাজা অর্জুন পালকীতে করে সুলতান মাহমূদের কাছে একজন শান্তি দূত পাঠান।

দূত এসে সুলতানের কাছে জানতে চাইলো, আপনি কি চান এবং আপনার আক্রমণের উদ্দেশ্য কি?

সুলতান বললেন, আমি মুসলমান। আমি আপনাদের আহ্বান করছি মূর্তিপূজা ত্যাগ করে আমরা যে একক সত্তা আল্লাহর ইবাদত করি আপনারাও তাঁর ইবাদত করুন। আপনারা আমাদের মতো ইবাদত করুন এবং গরুকে পূজা না করে গরুকে একটি ভক্ষণযোগ্য পশু মনে করে এর গোশত আহার করুন।

দূত বললো, আমাদের পক্ষে গরুর গোশত খাওয়া সম্ভব নয়। তবে আপনি আপনার কোন পণ্ডিতকে দুর্গে পাঠান, যিনি আপনাদের ধর্মের ব্যাপারটি আমাদের কাছে উপস্থাপন করবেন যদি আপনাদের ধর্ম আমাদের ধর্ম থেকে আরো উত্তম হয়, তাহলে আমরা তা মেনে নেবো।

সুলতান সেনাবাহিনীর একজন ইমামকে একজন দুভাষীসহ দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম রাজা অর্জুনের সাথে কথা বলে বিকেলে ফিরে এসে জানালেন, রাজা বলেছেন, আপনাদের ধর্ম মেনে নিতে পারবো না, তবে আমরা আপনাদেরকে তিন'শ হাতি এবং বিশ মণ রুপা উপঢৌকন দিচ্ছি। এর বিপরীতে আপনারা অবরোধ তুলে নিন।

সুলতান মাহমূদ একথা শুনে পুনরায় রাজা অর্জুনের কাছে বার্তা পাঠালেন, আপনার প্রস্তাব আমরা মানতে রাজি। তবে আমাদের পোষাক পরিধান করে, আমাদের দেয়া তরবারী কোমরে ঝুলিয়ে আপনার বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলের উর্ধ্বাংশ কেটে আমাদের কাছে অর্পণ করতে হবে। কারণ এটি আপনাদের রীতি। এটা করলেই আমরা মনে করবো আপনি পরাজয় মেনে নিয়েছেন। আমরা নিশ্চিত হতে চাই আপনি এরপর আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করবেন না।

ইতিহাসে পরিষ্কার লেখা আছে, এই সংবাদ নিয়ে যখন সুলতানের দূত রাজা অর্জুনের কাছে গেল, তখন অর্জুন একটি রূপার কুরসীতে সমাসীন ছিলেন। দূত বর্ণনা করল, 'আমি দেখলাম সুদর্শন একটি যুবককে রুপার কুরসীতে সমাসীন। আমি তাকে বললাম, আপনার জন্যে আমি পোষাক নিয়ে এসেছি তা পরিধান করে আঙুল কেটে দিতে হবে।

তিনি বললেন, আপনি গিয়ে বলুন এই কাপড় পরেই আঙুল কাটা হয়েছে।

আমি দুঃখিত। আমি সুলতানকে প্রতারিত করতে পারবো না। আমাদের পোষাকই পরতে হবে।

রাজা অর্জুন অনিচ্ছা সত্ত্বেও পোষাক পরে নিলেন এবং কোমরে গযনী বাহিনীর দেয়া তরবারী ঝুলিয়ে নিলেন। আমি তার এই করুণ অবস্থা দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। তখন আর তাকে আঙুল কাটার কথা বলতে পারলাম না। তিনি নিজেই একজনকে ডেকে বললেন, ছুরি নিয়ে এসো। ছুরি আনা হলে তিনি খুবই স্বাভাবিকভাবে ছুরিটি হাতে নিয়ে নিজের হাতেই বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলের অগ্রভাগ এক ঝটকায় কেটে ফেললেন এবং একটি কাপড়ে মুড়িয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। সেই সাথে তার কর্তিত আঙুলে ওষুধ মাখা পট্টি বেধে নিলেন। এ সময় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হলেও তার চেহারা ছিল সম্পূর্ণ ভাবান্তরহীন।

তিনি হিন্দুস্তানের রীতি অনুযায়ী আমাকে দামী কাপড়, রৌপ্য ও দু'টি ঘোড়া উপহার দিতে বললেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল জওযী অনুরূপ ঘটনা লিখে আরো যোগ করেছেন, সুলতান মাহমূদের কাছে এমন কনিষ্ঠ আঙুলের বহু অংশ সংরক্ষিত ছিলো। কারণ হিন্দুস্তানের বহু রাজা মহারাজা তার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে অবশেষে তাদেরই রীতি অনুযায়ী বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুল কেটে দিয়েছিলেন।

* * *

সুলতান মাহমূদ গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুনকে তার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করলেন এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার নিয়ে কালাঞ্জরের দিকে রওয়ানা হলেন। কালাঞ্জর দুর্গের আয়তন ছিল বিশাল। বলা হয়ে থাকে প্রায় লাখ খানেক লোক, বিশ হাজার গবাদি পশু এবং পাঁচশ হাতি সেখানে থাকতো। সুলতান মাহমূদের কাছে এই বিশাল এলাকাকে আক্ষরিক অর্থে অবরোধ করার মতো বিপুল সংখ্যক

সৈন্যের অভাব থাকায় তিনি দুর্গে প্রবেশের সবগুলো প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিয়ে কার্যত দুর্গবাসীকে অবরুদ্ধ করলেন। আসলে কালাঞ্জরের দুর্গকে সাধারণ দুর্গ না বলে মজবুত প্রাচীর ঘেরা একটি মহানগর বলাই সঙ্গত।

সুলতান মাহমূদ অবরোধ আরোপ করার পর মহারাজা গোবিন্দের কাছে পয়গাম পাঠালেন। পয়গামবাহী গযনী বাহিনীর বিশেষ ধরনের পোষাকে সজ্জিত হয়ে প্রধান ফটকের কাছে গিয়ে উচ্চ আওয়াজে রাজার উদ্দেশে বললো, 'গযনীর সুলতানের পক্ষ থেকে কালাঞ্জরের রাজা গোবিন্দকে হুশিয়ার করা হচ্ছে। গযনী বাহিনী দুর্গে প্রবেশ করলে কাউকে জীবিত রাখবে না। নিজ প্রজাদের গণহত্যা না করিয়ে রাজা ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন নয়তো আমাদের শর্ত মেনে নিয়ে পরাজয় স্বীকার করে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও কর আদায় করে আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারেন।'

কয়েক দিন এভাবেই চলে গেল। রাজা গোবিন্দ বশ্যতা স্বীকার করে নিতে চাচ্ছিলেন না কিন্তু গযনীর সৈন্যরা যখন আক্রমণ শুরু করলো, তখন কয়েকদিনের মধ্যে তার মনোবল ভেঙে গেল। দুর্গের হাজার হাজার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে মহাবিপর্যয়কর পরিস্থিতির জন্ম দিল। ফলে ইসলাম গ্রহণে সম্মত না হয়ে রাজা গোবিন্দ মৈত্রী চুক্তির জন্য পয়গাম পাঠালেন এবং ক্ষতিপূরণ ও বার্ষিক চাঁদা দেয়ার অঙ্গীকার করে একটি আপোস চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। বশ্যতা স্বীকারের প্রমাণস্বরূপ রাজা গোবিন্দও আঙুলের অগ্রভাগ কেটে সুলতানের কাছে পাঠালেন।

কিন্তু গোবিন্দ গযনী সুলতানের সাথে একটি নির্মম রসিকতাও করলেন। তিনি তিনশ হাতি উপহার হিসেবে দেয়ার কথা বলে সেগুলোকে দুর্গের বাইরে মাহুত ছাড়াই ছেড়ে দিয়ে সুলতানের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনার সৈন্যরা যদি সত্যিকার অর্থে সাহসী হয়ে থাকে তাহলে এগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে বলুন। সুলতান এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন।

গযনী বাহিনীতে তাতারী বা তুর্কী ইউনিট বলে একটি বিশেষ সেনা ইউনিট ছিল। এরা ছিল অত্যন্ত সাহসী, দৈহিক গঠনে বিশাল এবং লড়াকু। সুলতান তাতারী ও তুর্কী সৈন্যদের আহ্বান জানালেন, কারা আছো যে, এই হাতিগুলোকে কব্জা করতে পার?

হাতিগুলোকে মদ খাইয়ে মাতাল করে দুর্গের বাইরে এনে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। মাতাল হাতিগুলো বাঁধনমুক্ত হয়ে গযনী বাহিনীর উপর কেয়ামত বয়ে আনলো। তাঁবু, রসদসহ সবকিছু তছনছ করতে শুরু করলো।

সৈন্যদের মধ্যেও দেখা দিল আতঙ্ক। এ অবস্থায় তাতারী বা তুর্কী ইউনিটের যোদ্ধারা তাকবীর দিয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে হাতি নিয়ন্ত্রণে ঝাপিয়ে পড়ল এবং বহু কষ্টে সব কটা হাতিকেই তারা কব্জা করতে সমর্থ হলো। অবশ্য সুতলতান তাদেরকে নিদের্শ দিয়েছিলেন, তীর-বল্লম, তরবারী যেভাবে পারো এগুলোর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে সেনা শিবির হেফাযত করো। কিন্তু অসীম সাহসী যোদ্ধারা মাতাল হাতিগুলোর একটিকেও হত্যা না করে কাবু করতে সক্ষম হল। দুর্গ প্রাচীরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে কালাঞ্জরের হিন্দু অধিবাসীরা গযনী সেনাদের সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চিৎকার করতে থাকে– বলতে থাকে সাবাশ গযনীর যোদ্ধারা! সত্যিই তোমরা অজেয়, তোমরা সাহসী, তোমরা বীরের জাতি। আমরা তোমাদের প্রণাম করি। নমস্কার জানাই।

মহারাজা গোবিন্দের আত্মসমর্পণের পর সুলতান মাহমূদ গযনী বাহিনীকে লাহোরে নিয়ে গেলেন। সুলতানের লাহোর আগমনের খবর পেয়ে লাহোরের বর্তমান রাজা তরলোচনপাল লাহোর ছেড়ে আজমীর চলে গেল। সুলতান মাহমূদ পুনর্বার লাহোরে প্রবেশ করে লাহোরকে গযনী সালতানাতের অঙ্গ ঘোষণা করলেন এবং তার অত্যন্ত প্রিয় গোলাম ও সঙ্গী আয়াযকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। আয়ায ছিলেন সুলতান মাহমূদের একান্ত ভৃত্য। ভৃত্য হলেও সুলতান তাকে বন্ধুর মতোই সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। অস্বাভাবিক মেধা, বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার অধিকারী আয়াযের নাম সুলতান মাহমূদের সাথে সাথেই উচ্চারিত হয়।

লাহোরে বিপুল সংখ্যক সেনা রেখে সুলতান মাহমূদ ১০২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ এপ্রিলের দিকে গযনী ফিরে এলেন। এদিকে গযনীর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর শক্তি নিয়ে অপেক্ষা করছিল ইসরাঈল সেলজুকী।

সোমনাথের ফটকে

লাহোরকে গযনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে আয়াযকে গভর্নর নিযুক্ত করে সুলতান মাহমূদ যখন গযনী ফিরে এলেন তখন তাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বিনা যুদ্ধে তেমন কোন সংঘর্ষ ছাড়াই বিশাল শক্তির অধিকারী তিনটি রাজ্যকে জয় করে গযনী ফিরে এলেও সুলতানের মধ্যে অন্যান্য বারের মতো বিজয়ের উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছিল না। তিনি কেমন যেন বিমর্ষ চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। তাকে দেখে বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল।

এই অবস্থা দেখে সুলতানের ডান হাত বলে খ্যাত ইতিহাস বিখ্যাত সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ আলতাঈ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুলতান! এবার হিন্দুস্তান থেকে ফিরে আসার পর থেকেই আপনাকে কেমন যেন পেরেশান বলে মনে হচ্ছে। এর কারণ কি?

সেনাপতির জিজ্ঞাসার জবাবে একটা শুষ্ক হাসি দিয়ে সুলতান বললেন, বয়সতো আমার তেমন একটা হয় নি। কিন্তু কিছু দিন থেকেই অনুভব করছি শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে, ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে শরীর। সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি অনুভূত হচ্ছে।

সুলতানের বয়স তখন পঞ্চান্ন বছর। এটাকে তিনি মোটেও বেশি মনে করছিলেন না।

প্রধান সেনাপতি তখনই চিকিৎসককে ডেকে পাঠালেন। চিকিৎসক এসে সুলতানের স্নায়ু পরীক্ষা করলেন। শরীরের অবস্থা সম্পর্কে কিছু কথা জিজ্ঞেস করলেন। হৃদযন্ত্রের কম্পন পরিমাপ করে বললেন, সুলতানের এখন দীর্ঘ বিশ্রামের দরকার। তার স্নায়ু খুব দুর্বল। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে। সুলতান যদি পূর্ণ বিশ্রাম না নেন, তাহলে সামান্য অসুখও তাঁর জন্যে জীবনহানির কারণ হতে পারে।

আমি আরাম আয়াসের মধ্যে মরতে চাই না– বললেন সুলতান। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর সাথে আমি সাক্ষাত করতে চাই না। আমি নিজেকে বিলাসিতায় ডুবিয়ে দিতে পারি না। শরীরতো মাটির সাথে মিশে যাবে। দেহের শক্তি কমে গেলেও আমি আত্মার শক্তিতে আমার উপর আল্লাহর দেয়া কর্তব্য পালন করে যাবো। শায়খুল আসফান্দ! আপনি বলুন! আমার হৃদযন্ত্র ঠিক আছে তো?

হৃদযন্ত্র অবশ্য ঠিকই আছে– জবাব দিলেন চিকিৎসক শায়খুল আসফান্দ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আপনার শরীর কোন ধরনের অভিযান, অবরোধ ও যুদ্ধের জন্যে মোটেও উপযোগী নয়। মূলত আপনি এখন যা করছেন এর সবই সম্ভব হচ্ছে আপনার আত্মবলে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি। বললেন সুলতান মাহমূদ। আমার পীর ও মুর্শিদ শায়খ আবুল হাসান কিরখানী এটাকেই ঈমানী শক্তি বলে অভিহিত করতেন। শরীর মানুষের অনুভূতি অনুযায়ী দুর্বল হয়। দুর্বলতা এবং ব্যথা অনুভূতির দু'রকম বহি:প্রকাশ মাত্র। আপনি কোন ব্যথাকে যতটুকু তীব্র মনে করবেন, ব্যথাটা ঠিক ততটুকুই তীব্র হবে। হেকিম সাহেব! আপনাকে আমার ডেকে আনতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু আবু আব্দুল্লাহ্ ভয় পেয়ে আপনাকে ডেকে এনেছে।

সম্মানিত সুলতান! আপনি শারীরিক দুর্বলতার কথা বলেছিলেন, এজন্যই আমি হেকিম সাহেবকে ডেকে এনেছি– বললেন আবু আব্দুল্লাহ। শারীরিক দুর্বলতা ভালো লক্ষণ নয়।

তোমরা যাই বলো, আমি কিন্তু এটাকে অন্যরকম নির্দশন মনে করছি। আমি অনুভব করছি, আমাকে আমার 'রুহ' বলে দিচ্ছে, 'তোমার যা কিছু করণীয় তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। হিন্দুস্তানের মূর্তিগুলো আমাকে শান্তিতে ঘুমাতে দেয় না। আমার ভয় হয়, কর্তব্য কাজ সম্পন্ন করার আগেই না আবার আমার দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয়।

এই মুহূর্তে আমার বিপুল সমরশক্তির দরকার। অথচ মুসলিম শক্তিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন। যেসব সরদার, নেতা ও শাসকরা আমার অবর্তমানে গযনীর জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে তাদের সবাইকে আমার একত্রিত করতে হবে। আমার আশংকা হচ্ছে, আমার জীবন আর বেশি দিন নেই, আমি হয়তো কর্ত্তব্যকর্মগুলো সমাপ্ত করে যেতে পারবো না।

প্রধান সেনাপতি নানা কথায় সুলতানের আবেগকে প্রশমিত করে তাকে আশপাশের বৈরী মুসলিম শক্তিগুলোকে বাগে আনার কিংবা তাদের শক্তি নিঃশেষ করে দেয়ার কৌশল নিয়ে বাস্তবসম্মত উপায় নিয়ে কথা শুরু করলেন। অবশেষে তারা উভয়েই একমত হলেন, তারা তাদের সামরিক শক্তি প্রদর্শন করে প্রতিবেশী বৈরী শক্তিগুলোকে আনুগত্য স্বীকার করে নিতে বাধ্য করবেন। প্রতিবেশীদের মধ্যে সবচেয়ে আশংকাজনক অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল ইসরাঈল সেলজুকী।

* * *

১০২৪ সালের প্রথম দিকে সুলতান মাহমূদ এমন বিশাল সেনাদল দিয়ে বলখের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন যে, সেনাদের পায়ের চাপে যমীন প্রকম্পিত হচ্ছিল। এই সেনাদলের মধ্যে একজন সৈন্যও পদাতিক ছিলো না। সবাই ছিলো অশ্বারোহী। ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে– সেই সৈন্যদের মধ্যে চুয়ান্ন হাজার ছিল অশ্বারোহী, তাছাড়া তাদের সাথে তেরশ জঙ্গী হাতি ছিল। হাতির উপরে তীর বল্লমে সজ্জিত ছিল আরো প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্য।

সকল সৈন্য অত্যন্ত খোশমেজাজে ধীরস্থিরভ সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। সুসজ্জিত এই সেনাবহর দেখতে অত্যন্ত সুশীল ও সুন্দর হলেও শত্রুদের জন্যে তারা সৃষ্টি করেছিল মরণ আতংক। এই সৈন্যদল ছাড়াও সুলতান মাহমূদের আরো হাজার হাজার সেনা গযনী এবং হিন্দুস্তানের সীমান্ত ও বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন ছিল।

সেনাদের অগ্রভাগে ছিল সুলতানের সংবাদ বাহক দল। প্রতিটি ছোট্ট ছোট্ট রাজ্যে পৌঁছে অগ্রবর্তী দলের সংবাদবাহীরা শাসকদের কাছে গিয়ে বলতো–

গযনীর সুলতান চুয়ান্ন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও তেরোশ জঙ্গি হাতি নিয়ে আসছেন। আপনি যদি আল্লাহর নামে কাফেরদের বিরুদ্ধে সুলতানের অভিযানে শরীক হওয়ার জন্যে সুলতানের সাথে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার আনুগত্য করতে সম্মত হন তাহলে আপনার ক্ষমতা ও রাজত্ব অক্ষুণ্ন রাখা হবে। নয়তো আপনি গযনী সেনাদের সঙ্গে যেমন আচরণ করবেন সেরকমই আচরণ করা হবে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, বিশাল সেনাবহর ও সমরশক্তি দেখে গযনীর প্রতিবেশী এবং শত্রুতা পোষণকারী সকল শাসক ও ছোট ছোট রাজত্বের অধিকারী আমীর উমারা দামী দামী উপহার উপঢৌকন নিয়ে আগেভাগেই সুলতানের সামনে হাজির হয়ে তার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে নিচ্ছিল এবং তাদের রাজ্যে সুলতানকে স্বাগত জানাচ্ছিল। সুলতান তাদের উপহার গ্রহণ করে এবং তাদের সঙ্গে মৈত্রীত্বের ঘোষণা করে বলতেন, আপনাদের সবাইকে জিহোন নদীর তীরবর্তী কোন জায়গায় দাওয়াত দেয়া হবে। সেখানে আপনাদেরকে উপস্থিত থাকতে হবে। সেখানে আপনাদের সাথে আমার গুরুত্বপূর্ণ কথা হবে এবং আপনাদের সম্মানজনক আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

এক পর্যায়ে সুলতান জিহোন নদী পার হয়ে গেলেন। খুতুন নামের একটি রাজ্যের শাসক ছিলেন কাদের খান। তিনি ছিলেন সুলতান মাহমূদের ঘোরতর শত্রু। তাঁর কাছে যখন সুলতানের সমর শক্তির বর্ণনা দিয়ে সংবাদবাহীরা

সুলতানের আনুগত্যের দাওয়াত দিল, তখন কাদের খান কোনরূপ কথাবার্তা না বলে অনেকগুলো উট বোঝাই করে দামী দামী উপহার নিয়ে সুলতানের কাছে হাজির হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলেন।

সুলতান জিহোন নদীর তীরবর্তী একটি জায়গায় সেনাদের যাত্রা বিরতি দিয়ে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং সেই অঞ্চলের সকল আমীর ও শাসকদের দাওয়াত করলেন। সেসব অঞ্চলের মধ্যে সুলতান সবচেয়ে বেশি বৈরী মনে করেছিলেন বলখের শাসক আলাফতোগীন ও সেলজুকী নেতা ইসরাঈল সেলজুকীকে। এরা সম্মিলিতভাবে সুলতানের বিরুদ্ধে একবার যুদ্ধ করেছিল এবং শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছিল।

সুলতান মাহমূদ এদের কাছেও তার দূত পাঠিয়ে দাওয়াত দিলেন।

সুলতানের দূতেরা যখন আলাফতোগীনের কাছে তার পায়গাম পৌছাল, তখন আলাফতোগীন চরম অবজ্ঞা ভরে সুলতানের পয়গাম শুনলো। তার পাশে বসাছিল তার সুন্দরী স্ত্রী।

তোমার সুলতান কি তার দাওয়াত কবুল করার জন্যে আমাদের প্রতি অনুরোধ করেছে? দূতের উদ্দেশে বললো আলাফতোগীনের স্ত্রী।

সম্মানিত রানী! গযনীর সুলতান শুধু বলখ ও সমরকন্দের শাসককে তার মজলিসে দাওয়াত করেছেন। তিনি আপনার কথা উল্লেখ করেননি– বললো দূত।

তোমাদের সুলতানের এই দাওয়াতের উদ্দেশ্য কি? জানতে চাইলেন আলাফতোগীন।

দূত বললো, সুলতান চুয়ান্ন হাজার অশ্বারোহী ও তেরো'শ জঙ্গি হাতি নিয়ে এসেছেন। তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য বোঝা মোটেও কঠিন নয়। আপনার প্রিয় বন্ধু কাদের খান ইতোমধ্যে সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে তার রাজ্যে সুলতানকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। আমি আশা করবো, সুলতানের দাওয়াত গ্রহণ না করে আপনি আপনার সৈন্যদেরকে গণহত্যার শিকার করবেন না।

কাদের খান একটা কাপুরুষ। তোমাদের সুলতানের মোকাবেলা হবে একজন দুঃসাহসী বীরপুরুষ বাদশার সাথে– বললো আলাফতোগীনের স্ত্রী।

সম্মানিত রানী। লড়াই কোন নারীর কাজ নয়। আমি বলখের শাসকের সাথে কথা বলতে এসেছি, আপনার সাথে নয়। বলখের শাসককে পরিষ্কার ভাষায় বলতে হবে তিনি সুলতানের দাওয়াত কবুল করবেন কি-না। দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো দূত।

আমি যাবো! তবে এ ব্যাপারটি এখনই আমি বলে দিতে পারবো না, গযনীর আনুগত্য আমি গ্রহণ করবো কি-না?

অবশেষে আলাফতোগীনও সুলতান মাহমূদের দাওয়াতে হাজির হলেন। কিন্তু তার রানী তার সাথে আসেননি। আলাফতোগীন সাথে করে কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে এলেন।

আপ্যায়ন শেষে সুলতান মাহমূদ সকল সামন্ত শাসকদের একত্রিত করলেন। সুলতান শাসকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেয়ার সময় তার পাশে রাখলেন প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ ও অন্যতম সেনাপতি আরসালান জাযেবকে। আরসালান জাযেব ছিলেন খাওয়ারিজমের গভর্নর। আরসালান ছিলেন শত্রুদের ব্যাপারে অত্যন্ত আপসহীন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে দারুন পারদর্শী। তিনি মনে করতেন, শত্রুদের উপর দয়া করা নিজেকে বিপদে ফেলা ও পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করার নামান্তর।

ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর ও ইবনুল জওযীর ভাষ্যমতে, সেদিন সামন্ত শাসকদের উদ্দেশে সুলতান বললেন–বন্ধুগণ! আপনারা আমার সমরশক্তি প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি এখানে তেরো'শ জঙ্গি হাতি নিয়ে এসেছি। আরো বারো'শ জঙ্গি হাতি গযনীতে রয়ে গেছে। এখানে যে পরিমাণ অশ্বারোহী সৈন্য এসেছে এর চেয়ে ঢের বেশি গযনী সালতানাতের বিভিন্ন জায়গায় নিয়েজিত রয়েছে।

আপনারা দেখেছেন, আমি একজন পদাতিক সেনাকেও সাথে আনিনি। এসব সৈন্য কি আপনাদের নিরস্ত্র করতে সক্ষম নয়? কিন্তু আমি আপনাদেরকে সামরিক শক্তির ভয় দেখাতে আসিনি। আল্লাহর ভয় স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি। আমি আল্লাহর পথে জীবনের শুরু থেকেই জিহাদে লিপ্ত রয়েছি। এজন্য তিনি আমাকে এই বিপুল সৈন্যবল দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। এই বিপুল শক্তি অর্জনে আমার ব্যক্তিগত কোন কৃতিত্ব নেই। এসবই একমাত্র আল্লাহর দান।

আমি জানি, আপনারা আমাকে হিন্দুস্তানের লুটেরা এবং ধনসম্পদ ও অর্থ লোভী বলে গালিগালাজ করেন। সত্যিকার অর্থে যদি আমি ধনসম্পদের পূজারী হতাম, তাহলে যে পরিমাণ ধনসম্পদ আমার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সঞ্চিত আছে, এগুলো দিয়ে শুধু আমি কেন আমার ভবিষ্যত তিন পুরুষ আরাম আয়েশে জীবন-যাপন করতে পারতো।

আপনারা জানেন, আমি আপনাদের মতো বিলাসী জীবন-যাপন করি না। আমার গোটা জীবনটাই যুদ্ধে যুদ্ধে রণাঙ্গনে কেটেছে। আমি আরামের বিছানায়

শুয়ে শুয়ে মরতে চাই না। আমি চাই আমার মৃত্যু হোক রণাঙ্গনে। আর হিন্দুস্তানের মাটিতে আমার দেহ মিশে যাক।...

এখানে উপস্থিত আপনারা সবাই আমার ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু আমার বিরোধিতা করলেও আপনারা কিন্তু কখনো সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারেননি। কারণ আপনারা সবাই ক্ষমতার পূজারী। আপনারা কি বলতে পারবেন, খুব আরাম ও সুখের জীবন পেয়েছেন আপনারা? আপনারা দেশের সাধারণ মানুষকে গোলামে পরিণত করেছেন। এজন্য সবসময় গণ-বিদ্রোহের আতংকে থাকেন আপনারা।

বুখারা ও সমরকন্দের শাসক আলাফতোগীন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমি জানতে পেরেছি, তিনি সাধারণ মানুষকে খুব অত্যাচার- উৎপীড়ন করেন। কোন একজন নাগরিকও তার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। আমি জানি, শাসন ক্ষমতা মানুষের মনে দারুন সুখানুভূতি ও নেশার সৃষ্টি করে। আপনাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছেন যারা ইসলামের অপব্যাখ্যা করে ধোঁকা দিয়ে প্রজাদের শাসন করছেন। এমন শাসকরা নাগরিকদের সামনে নিজেকে ইসলামের প্রহরী বলে সাব্যস্ত করেন বটে; কিন্তু তারা বুঝতে চান না, তাদের চেয়ে বড় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তাআলা। তিনি ইচ্ছা করলে যেকোন সময় যে কারো ক্ষমতার মসনদ উল্টে দিতে পারেন।

জনসাধারণের উপর যুলুম করা, তাদেরকে সম্মান না করা এবং দেশের সাধারণ নাগরিকদের সাথে প্রতারণা করা, ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছাড়ানো কঠিন গোনাহর কাজ। আল্লাহ্ তাআলা এমন গোনাহ্ ক্ষমা করেন না। আপনাদের অপরাধের কারণেই হয়তো আজ আল্লাহ্ আপনাদের উপর আমাকে চাপিয়ে দিয়েছেন।

আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আপনাদের বলে দিচ্ছি, আমি আপনাদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে গোলাম বানাতে আসিনি। আমি আপনাদের রাজ্য দখল করতে আসিনি। আমি আপনাদের বলতে এসেছি, এই যমীনের মালিক আল্লাহ্! এই যমীনের উপর শাসক হিসাবে বসবাস করার আপনাদের যেমন অধিকার রয়েছে, একজন নগণ্য-নাগরিকেরও ততটুকুই অধিকার রয়েছে।

আমি আপনাদেরকে ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত করতে এসেছি। আমি আপনাদের কাউকেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার সাথে রণাঙ্গনে নিয়ে যেতে চাই না। রণাঙ্গনের ব্যাপারটি আমি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি। আমি হিন্দুস্তানকে ইসলামী সালতানাতে পরিণত করতে চাই। কারণ, হিন্দুস্তান একসময় ইসলামী

সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিন্দুস্তান তো সেইসব মুসলমানদের অর্জিত ভূমি যেসব মুজাহিদ মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে নিজেদের জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে বিক্ষুব্ধ সাগর পারি দিয়ে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন এবং এখানেই তারা জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

আজ সেই শহীদানের কবরের উপর মন্দির গড়ে উঠছে এবং পৌত্তলিকতার পূজা চলছে। বিন কাসিমের বিজিত এলাকার মসজিদগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে এবং মুসলমান তরুণীদের সম্ভ্রম নিয়ে হুলিখেলা চলছে। হিন্দুস্তানে ইসলামের বাতি এখন প্রায় নিভতে বসেছে।

বন্ধুগণ! আমি একটি ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াইয়ে নেমেছি। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করেন দেখুন, ক্রমবর্ধমান হিন্দুত্ববাদকে যদি আমরা স্তব্ধ করে না দেই, আমরা যদি পৌত্তলিকতার বিষ বৃক্ষ উপড়ে না ফেলি, তাহলে হিন্দুস্তান মুসলমানদের জন্যে কসাইখানায় পরিণত হবে।

আর সেখানকার মসজিদগুলো নোংরা আস্তাবলে পরিণত হবে। আমি আপনাদের কি বলতে চাচ্ছি, তা বুঝতে আপনাদের মোটেও কষ্ট হওয়ার কথা নয়। আপনারা সবসময় আপনাদের কান, চক্ষু ও বিবেককে সত্য উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অসাড় করে রেখেছেন। আপনাদের বদ্ধ চোখ, কান ও বিবেকের কপাট আমি খুলতে এসেছি।

এখন আপনাদের সামনে আমি দুটি নির্দেশনা পেশ করছি–

১. প্রথমতঃ আপনারা আপনাদের অর্ধেক সৈন্য আমাকে দিয়ে দেবেন। তাদেরকে আমি হিন্দুস্তানে নিয়ে যাবো। আপনারা সবাই একটি চুক্তিতে সই করবেন যে, আমার অবর্তমানে আপনারা গযনী আক্রমণ করবেন না; বরং গযনীর নিষ্ঠাবান প্রহরীর ভূমিকা পালন করবেন।

২. দ্বিতীয়তঃ নয়তো আমি আপনাদের সবাইকে গ্রেফতার করে আপনাদের শাসিত সবগুলো অঞ্চলকে গযনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেবো। আল্লাহর মেহেরবাণীতে আমার এই শক্তি আছে। ইচ্ছা করলে খুব সহজেই আমার এই কথা আমি বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম।

একথা বলে সুলতান মাহমূদ থেমে গেলেন। তিনি উপস্থিত সবার চেহারার দিকে তাকিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া যাচাই করলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি বললেন, আমার উপস্থাপিত এই দুই নির্দেশনা যদি কারো পছন্দ না হয় তিনি হাত তুলে তার আপত্তি জানাতে পারেন।

উপস্থিত কোন শাসকই তাদের হাত উপরে উঠানোর সাহস করলো না। সুলতান উপস্থিত সবাইকে মোরাবকবাদ জানিয়ে বললেন, আগামীকাল আপনাদের সামনে মৈত্রী চুক্তির দলিল পেশ করা হবে, সেখানে সবাইকে মোহরাঙ্কিত দস্তখত দিতে হবে।

* * *

পর দিন সকাল বেলায় ফজরের নামাযের পর সুলতান মাহমূদ চুক্তিপত্র লেখার জন্য সরকারী মুহরিরকে নির্দেশ দিলেন। চুক্তিনামা প্রস্তুত হওয়ার পর সুলতান সকল শাসককে তাঁর তাঁবুতে ডাকলেন। এ সময় সুলতানকে জানানো হলো, সমরকন্দ ও বলখের শাসক আলাফতোগীন অনুপস্থিত। তার তাঁবুও খালি। তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তল্লাশী করে জানা গেছে, ভোরের অন্ধকারেই কয়েকজন অশ্বারোহী বুখারার দিকে চলে গেছে।

সুলতানের নির্দেশে কিছুসংখ্যক অশ্বারোহীকে পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠানো হলো। দ্রুতগামী অশ্বারোহীরা পথিমধ্যেই আলাফতোগীনকে পেয়ে গেলো। আলাফতোগীন ছিল নিরাপত্তা প্রহরী বেষ্টিত। সে তার নিরাপত্তা-রক্ষীদেরকে প্রতিরোধের নির্দেশ দিল।

কিন্তু গযনী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল তার নিরাপত্তা রক্ষীর চেয়ে দ্বিগুণ। গযনীর সৈন্যরা নিরাপত্তা-রক্ষীদের চরম হুমকী দিলে তারা মোকাবেলার সাহস পেলো না। তারা সবাই আত্মসমর্পন করলো। ফলে সহজেই গ্রেফতার হলো আলাফতোগীন। গযনীর সৈন্যরা তাকে এনে সুলতানের সামনে হাজির করলো।

পলাতক আলাফতোগীনকে দেখে সুলতান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন– আমার আহবান উপেক্ষা করে তুমি পালিয়ে গেলে, কিন্তু আল্লাহর পাকড়াও থেকে কি তুমি নিজেকে সরিয়ে নিতে পারবে? আমি তো তোমার উপর আমার আনুগত্যের খড়গ চাপাতে আসিনি। আল্লাহর আনুগত্যের পয়গাম নিয়ে এসেছি। তোমার পালিয়ে যাওয়ার কারণ কি?

আমি গযনীর আনুগত্য স্বীকার করি না-জবাব দিলো আলাফতোগীন।

একে শিকলে বেঁধে এখনই হিন্দুস্তানে পাঠিয়ে দাও এবং মুলতানের কয়েদখানায় বন্দি করে রাখো। বাকী জীবনটা ওকে সেখানেই কাটাতে হবে।

বাস্তবেও আলাফতোগীনের বাকী জীবন মুলতানের কয়েদখানার একটি ছোট্ট কক্ষেই কাটাতে হয়েছে।

আলাফতোগীন ছাড়া সকল শাসকই চুক্তিনামায় দস্তখত করে তাদের আনুগত্যের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলো।

সুলতান মাহমূদ চুক্তিপত্র সম্পাদনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করতে যাবেন, ঠিক এই সময় তাকে জানানো হলো– ইসরাঈল সেলজুকীও হাজির হয়েছে।

ইসরাঈল সেলজুকী ইতোমধ্যে দু'বার সুলতানের সাথে টক্কর দিয়ে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এবার সুলতানের নিয়ে আসা সামরিক শক্তি দেখে সে বুঝতে পেরেছিল তার পক্ষে এদের মোকাবেলায় টিকে থাকা অসম্ভব। মূলত সে আনুগত্য প্রকাশ করতেই এসেছিল। অবশ্য সে সময়কার ঐতিহাসিক প্রামাণ্যগ্রন্থ তাবকাতে নাসেরীতে লেখা হয়েছে–

তুর্কমানী সেলজুকীদের নিয়ে গঠিত একটি সেনা ইউনিটের আগে আগে আসছিল ইসরাঈল সেলজুকী। সে মাথার টুপিটাকে বাঁকা করে রেখেছিল। এটা ছিল তার বীরত্ব ও শক্তির পরিচায়ক। সে তার ঘাড়টা উঁচিয়ে রেখেছিল, তাতে বুঝানো হচ্ছিল সে কাউকে পরোয়া করে না।

ইসরাঈল সেলজুকী যখন সুলতান মাহমূদের সাথে সাক্ষাত করলো, তখন ইসরাঈল সেলজুকীকেও তিনি সেই কথাই বললেন, যা অন্য শাসকদের বলেছিলেন। তাদের পরস্পর কথাবার্তার পর ইসরাঈল সেলজুকী সুলতানের আনুগত্যের ঘোষণা দিল। সুলতান যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাকে কতোজন সৈনিক দিতে পারবে?

সুলতানের প্রস্তাবে ইসরাঈল সেলজুকী যা বলেছিল তা অক্ষরে অক্ষরে ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়েছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন লিখেছেন–

ইসরাঈল সেলজুকী তার তীরদান থেকে একটি তীর বের করে সুলতানের হাতে দিয়ে বললো, এই তীরটি যদি আপনি উত্তর দিকে ছুড়েন তাহলে পঞ্চাশ হাজার তুর্কমানী সেনা আপনার ডাকে সাড়া দেবে। আপনার যদি আরো সৈন্যের প্রয়োজন হয় তাহলে আরেকটি তীর বলকানের দিকে ছুড়ে দেবেন তাহলে আরো পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী আপনার কাছে চলে আসবে।

সুলতান বললেন, তোমার সকল সৈন্যদেরই যদি আমার প্রয়োজন হয় তবে কি করবে?

তাহলে আমার ধনুক আপনি দূতের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। সে গোটা এলাকায় গিয়ে তা দেখিয়ে ফিরে আসবে। এরপর দেখবেন, দু'লাখ সৈন্য আপনার কাছে চলে আসবে– বললো ইসরাঈল।

ইসরাঈলের ভাবভঙ্গি এবং তার কথাবার্তা শুনে সুলতান মাহমুদ সংশয়ে পড়ে গেলেন। ইসরাঈলের কথার মধ্যে তার সন্দেহ হলো।

নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ 'মজমুআতুল আনসার' এ লেখা হয়েছে- সুলতান ইসরাঈলকে অতিথিদের জন্যে বরাদ্দকৃত তাঁবুতে পাঠিয়ে তার কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তার যথাযথ সম্মানও সেবাযত্ন করতে। ইসরাঈল চলে যাওয়ার পর সুলতান তার সম্পর্কে আরো খোঁজ-খবর নিলেন।

এর মধ্যে কাদের খান সুলতানকে জানালো, সেলজুকীরা সকলের জন্যেই একটা প্রকট সমস্যা হয়ে ওঠেছে। এদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি রক্ষার আশা করা ঠিক নয়।

সুলতানের বিশ্বস্ত ও প্রিয় সেলজুকী সেনাপতি আরসালান জাযেব সুলতানকে বললেন, সেলজুকীদের মধ্যে কোন নীতি নৈতিকতার বালাই নেই। এরা কোন নিয়ম নীতিকেই সম্মান করতে জানে না।

ইসরাঈল সেলজুকীর ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তায় সুলতান পূর্বেই সংশয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তদুপরি অন্যদের সাথে পরামর্শ করার পর ইসরাঈল সেলজুকীর প্রতি আস্থা না রাখার ব্যাপারেই চূড়ান্ত হিসাবে নেয়া হলো। এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন- ইসরাঈল সেলজুকীকে গ্রেফতার করে কালাঞ্জর দুর্গের বন্দিশালায় পাঠিয়ে দেয়া হোক।

তখনই ইসরাঈলের হাতে হাতকড়া ও পায়ে জিঞ্জির বেঁধে তাকে কাশ্মীরের পথে রওয়ানা করানো হলো। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন- সাত বছর ইসরাঈল কালাঞ্জর দুর্গের বন্দিশালায় আটক ছিল। একবার সে ফেরার হওয়ার চেষ্টা করে জেলখানা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, কিন্তু বরফের কারণে বেশি দূর যেতে পারেনি। ধরা পড়ে আবার কয়েদ হয়। সাত বছর জেলখানার ঘানি টেনে ইসরাঈল সেখানেই মৃত্যুবরণ করে।

ইসরাইলকে যখন গ্রেফতার করে হাতে হাতকড়া এবং পায়ে জিঞ্জির বেঁধে কাশ্মীরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তার সাথে আসা তুর্কমানী সৈন্যরা পাশেই দাঁড়ানো ছিল। তখন সে তুর্কমানীদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে নির্দেশ দেয়- তোমাদের এখন প্রধান কাজ হলো, গযনীর প্রতিটি ইট ধসিয়ে দেয়া। যাও তোমরা তাই করো।

সুলতান মাহমূদ সেলজুকী নেতাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাদের বসবাসের জন্য তিনি একটা স্বতন্ত্র এলাকা দান করবেন। ইসরাঈল সেলজুকীকে গ্রেফতারের পর তিনি ঘোষণা দিলেন, জিউন ও যরফাশা নদীর মধ্যবর্তী

এলাকাটা সেলজুকীদের বসবাসের জন্য বরাদ্দ করা হলো। তিনি তার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলন, সকল সেলজুকী গোত্রের লোকদেরকে এখনই এই এলাকায় নিয়ে আসা হোক।

সুলতানের নির্দেশ মতো চার হাজার সেলজুকী পরিবারকে জিউন ও যরফাশো নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় নিয়ে আসা হলো।

তাদেরকে নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি তুর্কীস্তানী ও তুর্কমানীদের আলাদা করে ফেললেন এবং বহু গযনী সেনা নিয়োগ করলেন। এই প্রথমবার তুর্কমানী ও তুর্কস্তানীরা সুলতান মাহমূদকে সরাসরি দেখার ও তার কথা শোনার সুযোগ পেলো। সুলতানের লোকেরা তাদের বুঝাতে লাগলো, সুলতান মাহমূদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ কি? তিনি কেমন শাসক? কেমন স্বভাবের মানুষ? সুলতানের লোকেরা তুর্কমানীও তুর্কীদের সাথে উঠাবসার কারণে গযনী বাহিনীর নীতি নৈতিকতা এবং সুলতান সম্পর্কে তাদের মনে ইতিবাচক ধারণা জন্মালো।

এরপর একদিন সুলতান তুর্কমানী ও তুর্কিস্তানী সেলজুকীদের উদ্দেশ্যে বললেন- তোমরা গযনী সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যাও। সুলতানের এই আহবান সফল হলো। খুশি মনে বহু তুর্কি ও তুর্কমানী গযনী বাহিনীতে ভর্তি হয়ে গেলো। ফলে সুলতানের এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্যই সফল হলো। তিনি এবার অনেকটা নিশ্চিন্তভাবে ভারতের দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগ পেলেন।

* * *

হিন্দুস্তানের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত গুজরাট রাজ্য। গুজরাট রাজ্যের একেবারে সমুদ্রতীরে অবস্থিত খাটায়ার শহর। সেখান থেকে সত্তর মাইল দক্ষিণের শহরের নাম সোমনাথ। সোমনাথ হলো একটি ঐতিহাসিক প্রাচীন মন্দিরের নাম। হিন্দুস্তানের বিখ্যাত ও প্রাচীন মন্দিরগুলোর মধ্যে সোমনাথ অন্যতম। সুলতান মাহমূদের সময় গুজরাটের গোটা সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় অসংখ্য মুসলমান বসবাস করতো। আজো গুজরাটের আহমদাবাদ এলাকা একটি মুসলিম প্রধান এলাকা।

আহমদাবাদে ১৯৪৭ এর পর থেকে কয়েকবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। এসব দাঙ্গায় হিন্দু সন্ত্রাসীদের হাতে বহু নিরীহ-নিরপরাধ মুসলমানের প্রাণ দিতে হয়েছে। কয়েকটি দাঙ্গায় সেখানকার হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন ও পুলিশের লোকেরা মুসলিম নিধনে হিন্দুদের সহায়তা করেছে বলে বিভিন্ন তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের কোন সরকারই মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে যথার্থ পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

সর্বশেষ ২০০০ সালের দাঙ্গায় বহু মুসলিম নারী ও শিশুকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অসংখ্য মুসলমানকে গৃহহীন করা হয়েছে। বাধ্য হয়ে সেখানকার হাজার হাজার মুসলমান এখন উদ্বাস্তু শিবিরে মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

সিন্ধু অববাহিকা থেকে নিয়ে আরব সাগর তীরবর্তী গোটা উপকূল অঞ্চলে ছিল অসংখ্য মুসলমানের বসবাস। এসব অঞ্চলে মুসলমানরাই ছিলো সংখ্যাগুরু। এ অঞ্চলের মুসলমানদের আদিপুরুষরা ছিলেন মূলতঃ আরব। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের সময় যে সকল মুসলিম যোদ্ধা হিন্দুস্তানে এসেছিলেন তাদের অধিকাংশই হিন্দুস্তানে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেছিলেন।

মুসলমানদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই সোমনাথ ছিল একটি বন্দর এলাকা। এখানে প্রাচীনকাল থেকেই আরব বণিকেরা আসা-যাওয়া করত। বিভিন্ন দেশের জাহাজ এখানে এসে নোঙর করতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর এক দু'জন করে মুসলমান এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভারত অভিযানের সময়েও সোমনাথ এলাকায় অনেক মুসলমান বসবাস করত।

সোমনাথ ছিল একটি বিশাল মন্দির। সারা ভারত থেকে হিন্দুরা এখানে পূজা দিতে আসতো। সোমনাথ এলাকার শাসক ছিল কুমার রায়। সে ছিল ভীষণ অত্যাচারী। মুসলমান প্রজাদের উপর খুবই অত্যাচার করতো। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, প্রতি চাঁদের পূর্ণিমাতে সোমনাথ মন্দিরের মূল বেদীতে একজন মুসলমানকে ধরে বলি দেয়া হতো এবং তার রক্ত দিয়ে মূর্তিগুলোর গা ধুইয়ে দেয়া হতো।

সোমনাথ মন্দিরের গোড়াপত্তন কবে কখন কে করেছিল, ইতিহাসে এর কোন সুনির্দিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে সোমনাথকেন্দ্রিক কিছু পৌরাণিক কাহিনী। যে কাহিনী খুবই অশ্লীল ও সভ্যতা বিবর্জিত।

বলা হয় চন্দ্র নামের এক দেবতা একবার এক ব্রাহ্মণ প্রজার কয়েকজন মেয়েকে একসাথে বিয়ে করে। এদের মধ্যে রুহানী নামের মেয়েটি ছিল সবচেয়ে সুন্দরী। চন্দ্রদেবতা রূহানীকেই সব সময় কাছাকাছি রাখতো। আর অন্যদের উপেক্ষা করতো। এই অবস্থা দেখে সেই ব্রাহ্মণ একদিন চন্দ্রদেবতাকে বললো সকল মেয়ের সাথেই সমান আচরণ করতে। কিন্তু চন্দ্র তা শুনলো না। ফলে ব্রাহ্মণ দেবতাকে অভিশাপ দিলো। তাতে চন্দ্রদেবতা কুষ্ঠরোগী হয়ে গেল।

এক পর্যায়ে ব্রাহ্মণ শর্ত দিলো, সে তার অভিশাপ তুলে নেবে; কিন্তু চন্দ্রদেবতাকে যমীনে মহাদেব এর কোন চিহ্ন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

হিন্দুদের ধর্মীয় বর্ণনা মতে– ব্রাহ্মণের শর্ত মেনে চন্দ্রদেবতা অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য সমুদ্রতীর ঘেষে একটি জায়গায় বিশাল একটি গোলাকার পাথরে শিবলিঙ্গের প্রতি মূর্তি স্থাপন করে এবং সেটিকে কেন্দ্র করে একটি বিশাল মন্দির গড়ে তোলে। যার নাম দেয়া হয় সোমনাথ। সোম অর্থ চন্দ্র আর নাথ অর্থ প্রভু। এ অর্থে সোমনাথের অর্থ হয় চন্দ্রের প্রভু।

প্রতি চাঁদের পূর্ণিমাতে সাগর কিছুটা উত্তাল হয় এবং সমুদ্র পিষ্ঠ উঁচু হয়ে জোয়ারের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। ফলে সমুদ্রের পানিতে ব্যাপক তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হয়। হিন্দু পুরোহিতরা এটাকে প্রচার করে, চন্দ্রদেবতা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রতিমাসেই সোমনাথ মন্দিরের পা ধুইয়ে দেয়। মজার ব্যাপার হলো, একেবারে সমুদ্রতীরে গড়ে উঠার কারণে সবসময়ই জোয়ারের পানিতে সোমনাথের দেয়াল গাত্র প্লাবিত হতো। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার সোমনাথ মন্দিরের পুরনো ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন করে বিশালাকারে মন্দির নির্মাণ করে।

সোমনাথকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের এমন সব পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত আছে যে, এগুলো গ্রন্থিত করলে বিশাল আকারের গ্রন্থ হয়ে যাবে।

বস্তুত সেকালের সোমনাথ মন্দির ছিল স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন। সমুদ্র তীর খনন করে অনেক গভীর থেকে মন্দিরের দেয়াল উঠানো হয়েছিল। মন্দিরে ৫৬টি স্তম্ভ ছিল। এগুলো ছিল সেগুন কাঠের। সুদূর আফ্রিকা থেকে জাহাজ বোঝাই করে বিশাল আকারের সেগুন গাছ আনা হয়েছিল। সেগুন গাছের ভেতরে লোহা ঢুকিয়ে স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছিল। মন্দিরে শিবের মূর্তিই ছিল প্রধান। এ ছাড়াও ছোট বড় আরো বহু মূর্তি ছিল। সব মূর্তির গায়েই ছিল দামী দামী হীরা ও মণিমুক্তার অলংকার। তাছাড়া সোনা ও রুপার তৈরি মূর্তিও ছিল।

যে কক্ষে মূর্তিগুলো স্থাপন করা হয়েছিল, সে কক্ষে কোন মশাল, প্রদীপ বা বাতি জ্বালানো হতো না। কিন্তু মূর্তির কক্ষ সব সময় আলোকিত থাকতো। আলোর ব্যবস্থার জন্যে কক্ষের উপরে এমনভাবে হীরা ও মুক্তা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল যে, অন্যান্য কক্ষের আলো হীরার মধ্যে পড়লে হীরায় প্রতিবিম্বিত হয়ে মূর্তির দেহ ও ঘর আলোকিত হয়ে যেতো। যেহেতু হীরা ও মুক্তার মধ্যে বিভিন্ন রঙের মিশ্রণ রয়েছে সেহেতু আলোর মধ্যেও বিভিন্ন রঙের প্রতিস্বরণ ঘটতো। তাতে সৃষ্টি হতো একটা অপার্থিব আবহ, যাকে পুরোহিতরা স্বর্গীয় পরিবেশ

বলতো। এই মোহনীয় আলোয় মূর্তিগুলোকে জীবন্ত মনে হতো। পূজারীরা এ কারণে আরো বেশি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়তো। পাথরের মূর্তিগুলোকেই তারা জীবন্ত দেবদেবী বলে বিশ্বাস করতো।

সোমনাথের মূর্তিগুলোর চারপাশে পাঁচ মন ওজনের একটি খাঁটি সোনার শিকল দিয়ে দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল।

মন্দিরের প্রতিটি কক্ষেই কম বেশি মূর্তি ছিল। এসব মূর্তির সবগুলোতেই ছিল দামী মণিমুক্তা হীরা জহরত। প্রতিটি কক্ষের দরজায় ছিল খুব দামী কাপড়ের পর্দা। আর তাতে জড়ানো ছিল নানা রকমের হীরা জহরতের জরি।

সোমনাথ মন্দিরের ব্যবস্থাপনা এতোটাই ব্যাপক ও বিশাল ছিল যে, প্রায় দশ হাজার পুরোহিত মন্দির এলাকায় অবস্থান করতো। তারা পর্যায়ক্রমে চব্বিশ ঘণ্টা পূজা-অর্চনায় লিপ্ত থাকতো। মন্দিরের জন্য এক হাজার গ্রাম দান করা হয়েছিল। এসব গ্রামের সকল আমদানী মন্দিরের প্রয়োজনে ব্যয় করা হতো। তাছাড়া হিন্দুস্তানের সকল রাজা মহারাজাই এই মন্দিরে মোটা অংকের অনুদান দিতেন। শুধু তাই না প্রতি চন্দ্র মাসের পূর্ণিমাতে লাখো পূজারী এখানে জমায়েত হতো। তারা মন্দিরে নিজেদের অর্জিত সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ দান করতো।

সোমনাথ থেকে গঙ্গা নদীর দূরত্ব ছিল অন্তত সাতশ মাইল। সেই সাত'শ মাইল দূর থেকে পানি এনে প্রতি দিন সোমনাথের মূর্তিকে ধৌত করা হতো। এজন্য বিশাল ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। সবসময় পানি আনা-নেয়ার কাজে অশ্বারোহী দল নিয়োজিত থাকতো। এভাবে একটা নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল গঙ্গা জলে মূর্তিদের পবিত্রকরণ কাজে।

সোমনাথ মন্দিরে গান-বাজনা ও নৃত্যগীতের জন্য সবসময় সুন্দরী তরুণীদের প্রস্তুত রাখা হতো। এরা হতো মন্দিরের জন্য উৎসর্গীত। বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এসব সুন্দরী মন্দিরে নৃত্য গীত করতো। তাদের সহায়তা করতো তিন'শ বাদক। বিভিন্ন রাজা মহারাজারাও মন্দিরে সুন্দরী নর্তকী দান করতো। অনেক হিন্দু মা-বাবা তাদের মেয়ে সন্তানকে মন্দিরের সেবাদাসী রূপে উৎসর্গ করে দিতো।

মন্দিরের পুরোহিতরাই ছিল এখানকার রাজা। পুরোহিতদের হুকুমেই চলতো মন্দির। সকল নর্তকী সেবাদাসী পুরোহিতদের দাসানুদাস ছিল। পুরোহিতদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করতো মন্দিরের এসব অবলা নারীদের ভাগ্য।

সোমনাথের প্রধান মূর্তিই হলো শিবের লিঙ্গ যা হিন্দু জাতির যৌনতার প্রতীক। সেবাদাসীরা নিজে থেকেই পুরোহিতদের যৌন লালসা মেটানোর জন্যে নিজেদের উপস্থাপন করতো। আর ভক্তদের দাবী পূরণে প্রকাশ্যেই পুরোহিতরা নারীদের উপভোগ করতো। সোমনাথ ছিল ধর্মীয়ভাবেই একটি অবাধ যৌনতার উন্মুক্ত কেন্দ্র।

তখন পর্যন্ত সোমনাথ সম্পর্কে সুলতান মাহমূদ তেমন কিছু জানতেন না। শুধু সোমনাথের খবরটি তার কানে পৌঁছে ছিল মাত্র। কোন দিন সোমনাথ আক্রমণের চিন্তাও তার মাথায় আসেনি। কারণ গযনী থেকে সোমনাথের দূরত্ব অন্তত সাত'শ মাইল। এই বিশাল এলাকা পাড়ি দিয়ে সোমনাথে আক্রমণ চালানোর ব্যাপারটি আজকাল সহজ মনে হলেও সেই যুগে এত সহজ ছিল না।

* * *

যে সময় সুলতান মাহমূদ তার প্রতিবেশি মুসলিম শাসকদের একত্রিত করে তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা ও আনুগত্যের অঙ্গীকার নিচ্ছিলেন সেই দিনগুলোতে গোয়ালিয়রের রাজা অর্জুন বিভিন্ন মন্দিরে ঋষি ও পুরোহিতদের কাছে ধর্না দিয়ে তাদের অনুকম্পা পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। অর্জুন সুলতান মাহমূদের কাছে চরম পরাজয়ের শিকার হয়েছিলেন। ফলে তার রাজ্যের লোকেরাও তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। এজন্য এক ঋষি তাকে পরামর্শ দিলো, তিনি যেন দামী উপহার উপঢৌকন নিয়ে সোমনাথ মন্দিরে গিয়ে সেখানকার পুরোহিতদের পায়ে পড়ে আবেদন-নিবেদন করে এই বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেন। ঋষি তাকে আরো জানালো, সোমনাথের পুরোহিতদের সবচেয়ে পছন্দের উপহার হলো সুন্দরী তরুণী। তরুণী ছাড়াও তিনি যেন একজন সুদর্শন যুবক মুসলমানকে সাথে নিয়ে গিয়ে সোমনাথের বেদীতে বলিদান করেন।

পণ্ডিত ও ঋষিদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা অর্জুন সুন্দরী তরুণী ও এবং যুবক মুসলমানের তল্লাশী করতে লাগলেন। যে কোন রাজার জন্যে দু'চারজন তরুণী সংগ্রহ করা আর কোন একজন যুবক মুসলমানকে অপহরণ করা মোটেও কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু অর্জুন তখন নামে মাত্র রাজা। বাস্তবে সে রাজ্যহারা ভবঘুরে। তাছাড়া গোয়ালিয়র ও আশেপাশের রাজ্যগুলোতে মুসলিম জনবসতি খুব কম ছিল। অধিকাংশ মুসলমান বসবাস করতো ভেরা, মুলতানও লাহোরে। যুবতী ও সুন্দরী তরুণী এবং একজন সুদর্শন যুবক মুসলমানের ব্যাপারটিও তার জন্যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

একদিন গোয়ালিয়রের এক পুরোহিতের সাথে রাজা অর্জুনের সাক্ষাত হলো। গোয়ালিয়রে তখন মুসলমানদের রাজত্ব। মন্দিরের অবকাঠামো ঠিক থাকলেও সেখানে কোন মূর্তি ও পূজারী ছিল না। বরং সেখানে মুসলমানরা পাঁচ ওয়াক্ত আযান দিয়ে নামায আদায় করতো। রাজা অর্জুন পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখন কোথায় থাকেন?

জঙ্গলে থাকি- জবাব দিলো পণ্ডিত। মন্দির উজাড় হয়ে গেলেও দেবতার পূজা থেকে তো আর আমাদের কেউ বিরত রাখতে পারবে না। গভীর জঙ্গলে গিয়ে আমরা ক'জন মিলে একটি ঝোপের মধ্যে মন্দির বানিয়ে নিয়েছি। আপনি দেখবেন মহারাজ মুসলমানদের উপর কঠিন বিপদ আসবে। অপবিত্র ম্লেচগুলো সামরিক শক্তিবলে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। এরা হরেকৃষ্ণ মহাদেব ও বিষ্ণুদেবকে পরাজিত করতে এসেছে, দেখবেন এরা জীবন্ত পুড়ে ছাই ভষ্মে পরিণত হবে।

ওরা আর জ্বলবে কখন, আমরাইতো জ্বলে ভষ্ম হয়ে যাচ্ছি, পণ্ডিত মহারাজ!

আপনি কি এখনো বুঝতে পারেননি মহারাজ হরিদেব মহাদেব ও কৃষ্ণদেব আমাদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট? এটা আপনাদের পাপের ফসল। আপনাদের মতো যাদের হাতে সৈন্যসামন্ত ছিল তাদের পাপের কারণেই আজ হিন্দুজাতির এই দুরবস্থা।

রাজা গোবিন্দ আর রাজা তরলোচনপাল আমাকে ধোকা দিয়েছে পণ্ডিতজী! নয়তো গযনীর একটি সৈনিকও জীবন নিয়ে পালানোর সুযোগ পেতো না। আর সুলতান মাহমুদ আমাদের হাতে বন্দি হতো।

আমি শপথ করেছিলাম গযনীর সুলতানকে জীবন্ত পাকড়াও করবো, আর তাকে দিয়ে প্রতিদিন মন্দির ঝাড়ু দেয়াবো। আর সে মন্দিরে আসা পূজারীদের জুতা সোজা করবে.. যাক সেসব কথা। এখন আর এসব বলে লাভ নেই। আমাকে বলা হয়েছে, একটি সুন্দরী তরুণী ও একজন সুদর্শন যুবক মুসলমানকে নিয়ে সোমনাথ গিয়ে তরুণীকে মন্দিরে উপহার দিতে আর যুবককে সোমনাথের বেদীতে বলি দিতে। আর শিবদেবের পায়ে মাথা রেখে রাজত্ব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য প্রার্থনা করতে। যাতে শিবদেব আমার রাজত্ব ফিরিয়ে দেন।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আপনি। আমার মনের কথাটিই আপনি বলে দিয়েছেন। কিন্তু আমার তো মনে হয় না আপনি একাজ করতে পারবেন, বললো পণ্ডিত।

করতে পারবো- বললো রাজা অর্জুন। কিন্তু সুন্দরী তরুণী আর মুসলমান যুবক কোথায় পাবো?

কেন, আপনি কি একেবারে কাঙাল হয়ে গেছেন? রাজা হিসেবে আপনার কাছে নিশ্চয়ই এখনো অনেক ধন-সম্পদ আছে। আপনি চেষ্টা করে যান, শিকারের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।

আছে, আছে পণ্ডিতজী! আমি কেবল রাজ্য হারা হয়ে গেছি। তাছাড়া বাকী সবই আমার আছে। মেহেরবানী করে আপনি আমাকে বলুন, শিকার কোথায় কখন কিভাবে পাওয়া যাবে?

আপনার রাজকুমারীরা কি মাঝে মধ্যে নদীতে স্নান করতে যেতো না? অনুরূপ মুসলিম শাসকদের ছেলেমেয়েরাও প্রায়ই নদীতে গোসল করতে যায়।

গযনীর শাহজাদীরা যায় নদীতে গোলস করতে? কি বলছেন এসব? সুলতান মাহমূদ তো থাকে গযনীতে। এখানে শাহজাদী আসবে কোত্থেকে?

আমি গযনীর শাহজাদীদের কথা বলছি না। আমি বলছি সেসব কর্মকর্তাদের বিবি-কন্যাদের কথা যারা এখানকার দুর্গে বসবাস করে। এদের তরুণীরা প্রহরী সাথে নিয়ে প্রায়ই নদীতে নৌবিহার করতে আসে। আপনি কিছু উপহার উপঢৌকনক দিন, আমি এগুলো আমার বিশ্বস্ত লোকজনকে দিয়ে দু'একজন তরুণী ও দু'একজন যুবক প্রহরীকে অপহরণ করিয়ে নিয়ে আসবো। গোয়ালিয়র এখান থেকে বহু দূর। অপহরণের খবর যতোক্ষণে গোয়ালিয়র পৌঁছাবে ততোক্ষণে আমরা বহু দূর চলে যাবো।

আপনি কি সোমনাথের পথ জানেন? পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলো রাজা অর্জুন।

আপনি কোথায় রাজত্ব করেন মহারাজ? প্রতিদিনই এ পথ দিয়ে সোমনাথের স্নানের পানি বহনকারী কাফেলা যাতায়াত করে। তারা খুব দ্রুত যাতায়াত করে। আপনি কি কয়েকটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন? অন্তত ছয়টি দ্রুতগামী ঘোড়ার প্রয়োজন হবে।

ঘোড়া যে কয়টা দরকার জোগাড় করা যাবে। আমাকে ঠিক সময় মতো খবর দেবেন তাহলেই হবে– বললো অর্জুন।

গোয়ালিয়র দুর্গে বহু উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মকর্তাদের পরিবার পরিজন বসবাস করতো। তাদের স্ত্রী কন্যারা প্রায়ই দশ পনেরো মাইল দূরে অবস্থিত পদ্মা নদীতে নৌবিহারের জন্য আসতো। একদিন কয়েকজন প্রহরীসহ চার যুবতী নৌবিহারে এলো। তাদের মধ্যে একজন ছিল খুবই সুন্দরী কিশোরী। সে ছিল একজন প্রবীন সেনা কমান্ডারের মেয়ে। তার নাম ছিল শেগুপ্তা। শেগুপ্তার তখনো বিয়ে হয়নি। বিয়ের কথাবার্তা চলছে। তাদের দলে ছিলো পাচঁজন নারী এবং চারজন সেনা প্রহরী।

নদীর তীরবর্তী একটি জায়গা ঘন ঝোপ ঝাড় এবং ঘন গাছ-গাছালীতে পূর্ণ। নদীর তীরটা এখানে ঢালু ও বালুকাময়। মেয়েরা জায়গাটি উপযুক্ত মনে করে এখানেই নেমে পড়লো এবং ঝোপের আড়ালে নদীতে জলকেলীতে মেতে উঠলো। তাদের প্রহরীরা সেখান থেকে একটু দূরে বসে গল্পগুজব করতে লাগলো।

এসময় গেয়ো পোষাকের একটি লোক ভীত বিহ্বল অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে প্রহরীদের কাছে গিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো– তিনজন লোক আমার স্ত্রীকে জোর করে নিয়ে গেছে। তারা আমাকে মারপিট করে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার স্ত্রীকে বিবস্ত্র করে তার সম্ভ্রম হানির চেষ্টা করছে। এরা এখান থেকে বেশি দূরে নয় কাছেই আছে।

আপনারা মুসলমান! আপনারাই মহারাজ! আমাদের জীবন সম্ভ্রমের মালিক আপনারা! আতংকিত কণ্ঠে বললো লোকটি।

সাহায্যপ্রার্থী লোকটির কথা শুনে চার প্রহরী তার দেখানো পথে ছুটতে লাগলো। এরা যখন যথেষ্ট দূরে চলে গেলো তখন গোসলরত মেয়েদের উপর অতর্কিতে হামলে পড়লো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রাজা অর্জুনের লোকেরা। তারা সেনা কমাণ্ডারের মেয়ে শেগুপ্তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল। অন্য মেয়েরা আতংকিত হয়ে আর্তচিৎকার শুরু করে দিল। গযনীর মেয়েদের চিৎকার শুনে প্রহরীরা যখন বিভ্রান্ত হয়ে তাদের দিকে ফিরে এলো, তখন ঝোপের আড়াল থেকে তাদের তিনজনের পাঁজরে বর্শা বিদ্ধ করলো হিন্দুরা। সাথে সাথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো তিন প্রহরী। আর একজনের উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে ঝাপটে ধরে কাবু করে ফেললো।

শেগুপ্তাকে একটি ঘোড়ার পিঠে তোলে এবং বেঁচে থাকা একমাত্র প্রহরী নাসিরুদ্দৌলাকে বেঁধে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে আটটি ঘোড়া এক সাথে ঘনঝোপ ঝাড়ের মধ্যে দ্রুত ছুটতে লাগলো।

এই অশ্বারোহীদের মধ্যে শেগুপ্তাকে নিজের ঘোড়ায় তুলে ধরে রেখেছিল রাজা অর্জুন নিজে। আর নাসিরুদ্দৌলাকে একটি ঘোড়ার পিঠে ধরে রেখেছিল এক শক্ত-সামর্থ জোয়ান। একটি ঘোড়াতে সওয়ার ছিল পণ্ডিত। আর অন্যরা তাদের ভারাটে খুনী। ভাড়াটে খুনীদেরকে রাজা অর্জুন নগদ মুদ্রা দিতে চাইলে তারা বলে– আমাদের কোন নগদ টাকা-পয়সা দেয়ার দরকার নেই, আমরা আপনার খরচে আপনার সাথে সোমনাথ সফর করবো।

শেগুপ্তা ও প্রহরীদের হারিয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে শেগুপ্তার সঙ্গীনীরা যখন গোয়ালিয়র দুর্গে পৌঁছে, ততোক্ষণে রাজা অর্জুনের দল অনেক দূরে চলে গেছে। গোয়ালিয়র দুর্গে কর্তব্যরত গযনীর কর্মকর্তাদের কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, রাজ্য হারা ভবঘুরে রাজা অর্জুন এমন ভয়ংকর কিছু একটা ঘটাতে পারে।

দুই দিন আগে দুর্গপতি মুসলিম শাসককে রাজা অর্জুন জানিয়েছিল, সে সোমনাথ যেতে চায়। তাকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক। দুর্গপতি তাকে সোমনাথ যাওয়ার অনুমতি দিলে রাজা অর্জুন দু'দিন আগে সোমনাথের উদ্দেশে দুর্গ ত্যাগ করে।

সন্ধ্যার আগেই পণ্ডিতের দেখানো পথে অর্জুনের দল সেই পথের সন্ধান পেয়ে গেল, যে পথ দিয়ে সোমনাথের পানি বহণকারীরা যাতায়াত করে। এক পর্যায়ে পানি বহনকারী দলকে তারা পেয়ে গেল। পরদিন শেগুপ্তা ও নাসিরুদ্দৌলার বাঁধন খুলে দিয়ে রাজা অর্জুন তাদেরকে বললো– তোমরা যদি মুক্তির চিন্তা ও চেষ্টা করো তাহলে তা হবে অর্থহীন। এর চেয়ে বরং শান্তভাবে আমাদের সাথে থাকো। এটাই হবে তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। নাসিরুদ্দৌলার জিজ্ঞাসার পরও তাদেরকে জানানো হয়নি, কোথায় তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

টানা বিশ দিন পথ চলার পর অর্জুনের দল সোমনাথে পৌঁছলো। অর্জুন ও পণ্ডিত নাসিরুদ্দৌলাকে সোমনাথের প্রধান পুরোহিতের সামনে দাঁড় করিয়ে তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললো– এই তরুণীকে মন্দিরের জন্যে এবং এই যুবককে শিব দেবের নামে বলি দেয়ার জন্যে আপনার চরণে পেশ করছি।

নাসির পণ্ডিত ও অর্জুনের ভাষা বুঝতো কিন্তু শেগুপ্তা তাদের ভাষা বুঝতো না। শেগুপ্তা ফারসী ভাষায় নাসিরকে জিজ্ঞেস করলো– এরা কি বলাবলি করছে? নাসির শেগুপ্তাকে এদের কথাবার্তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে দিল। নাসিরের কথা শুনে শেগুপ্তা ভীত হওয়ার পরিবর্তে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও রুদ্ররোষে তার ভাষায় হিন্দুদের গালমন্দ করতে শুরু করলো।

শেগুপ্তাকে এভাবে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে দেখে প্রধান পুরোহিত নাসিরকে জিজ্ঞেস করলো– মেয়েটি কি বলছে?

সে বলছে– আমি তোমাদের শিবদেবের উপর আল্লাহর লা'নত দিচ্ছি। পুরোহিতকে বললো নাসির। আরো জানালো, শেগুপ্তা বলছে, আমরা তোমাদের বহু দেবতাকে পায়ে পিষ্ট করে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ঘোড দৌড়ের ম.ঠে ছড়িয়ে দিয়েছি। তোমাদের এসব দেবদেবীকে মন্দিরে রাখা অশোভনীয়।

মেয়েটিকে বলো, আমাদের ধর্মকে সে যেন অপমান না করে। ধর্মের অবমাননা আমরা সহ্য করি না- বললো প্রধান পুরোহিত। দেখবে, আমাদের ধর্মের অবমাননার জবাবে শিবদেব গযনীকে ধ্বংস করে দেবেন।

হু! তোমাদের এসব পাথুরে দেবতা আমাদের আল্লাহর মোকাবেলা করবে? আমরা এখন অসহায়, তোমাদের হাতে বন্দি, কিন্তু আমাদের আল্লাহ কোন জড় পদার্থ নন, তাকে কোন প্রকার অসহায়ত্ব স্পর্শ করে না। আমাদের আল্লাহর প্রতিশোধের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করো পণ্ডিত! বললো নাসির।

শেগুপ্তা অস্থির হয়ে নাসিরকে জিজ্ঞেস করছিল এরা কি বলছে? শেগুপ্তাকে পুরোহিতের কথাবার্তা জানিয়ে দিলো নাসির। নাসিরের কণ্ঠে পুরোহিতের কথা শুনে শেগুপ্তা এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো যে চিৎকার করে কথা বলতে লাগল সে। তার মুখের থুথু ছিটকে গিয়ে প্রাধন পুরোহিতের গায়ে পড়তে লাগল। শেগুপ্তা অনবরত হিন্দুদের উপর অভিশাপ দিচ্ছিল।

অর্জুন মহারাজ! এরা তো ভয় পাওয়ার পরিবর্তে আমাদের গালমন্দ করছে- অর্জুনের উদ্দেশ্যে বললো প্রধান পুরোহিত। এরা কি ভাবছে, আমরা এদের গালমন্দে ভীত হয়ে তাদের ছেড়ে দেবো?

আমরা শুধু আল্লাহকে ভয় করি পণ্ডিত! পুরোহিতের উদ্দেশ্যে বললো নাসিরুদ্দৌলা। মৃত্যুকে যদি আমরা ভয় করতাম তাহলে গযনীতেই বসে থাকতাম। আমরা আল্লাহর পয়গাম এখানকার মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে এবং রসূলুল্লাহর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় জীবন দেয়ার জন্যেই হিন্দুস্তানে এসেছি। আমরা জানি, এ মূহূর্তে আমরা অসহায় কিন্তু আমরা এজন্য খুশি যে, আমরা আল্লাহর পথে কুরবান হতে চলেছি। আমার কুরবানীতে তোমাদের কোনই উপকার হবে না, কিন্তু আমি পৌঁছে যাবো সরাসরি আল্লাহর দরবারে।

ওদের বলে দাও, এই মন্দিরেও সেই ধরনের ভয়াবহ বিপদ আসবে যে বিপদ হিন্দুস্তানের অন্যান্য মন্দিরে এসেছে। এদের এটাও বলে দাও, আমার পবিত্র দেহে যদি কোন পৌত্তলিক হাত তোলে তবে আমার আল্লাহ অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেবেন- বললো শেগুপ্তা।'

শেগুপ্তার কথা নাসির পণ্ডিতকে জানালো। নাসিরের কথা শুনে পণ্ডিত একটি বাঁকা হাসি দিয়ে বললো— তোমরা এমন জিনিসের পূজা করো, যা তোমরা দেখতে পাও না। তোমরা আসলে অন্ধ। অন্ধকারে বসবাস করছো তোমরা। তোমরা জানো না, এই মন্দির কার তৈরি? যাকে তোমরা পাথর বলছো, তিনি

শিবদেব। এখানে তোমাদের দেহ থেকে যেমন প্রাণ ছিনিয়ে নেয়া যাবে আবার তোমাদের মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার করা যাবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি যা বলছো, এই কথা তোমরা পাথরের মূর্তির মাধ্যমে বাস্তবে ঘটিয়ে দেখাতে পারবে না- পণ্ডিতের উদ্দেশ্যে বললো নাসির। আমি বিশ্বাস করি, মজলুম ও অসহায় এই তরুণী যে ভবিষ্যতবাণী করছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

মহারাজ! এদের সাথে এতো কথা বলা কি খুব জরুরী? না আপনি এদের ধর্ম বদলাতে পারবেন, না ওরা আপনার ধর্ম বদলাতে পারবে? সোমনাথের প্রধান পুরোহিতের উদ্দেশ্যে বললো গোয়ালিয়রের পণ্ডিত।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো! এদের সাথে এতো কথা অর্থহীন। তবে এই যুবককে বলে দেয়া দরকার মনে করি, আগামী চাঁদের পূর্ণিমার দিন তাকে বলি দেয়া হবে। এবং তার রক্ত শিবদেবের পায়ে অর্পণ করা হবে। তাকে আমরা একথা বলে দিতে চাই কারণ আমরা কাউকে ধোঁকায় ফেলে বলি দিতে চাই না। তার জানা থাকা দরকার তাকে যে সোমনাথ কুরবানীর জন্য পছন্দ করেছে এটা যে কোন মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই যুবক খুবই ভাগ্যবান।

শুধু শুধুই নিজেকে ও তোমার দেবতাদেরকে তোমরা ধোকা দিচ্ছো পণ্ডিত! বললো নাসির। তোমাদের শিবদেব কি জানে না, আমাদেরকে ধোকা দিয়ে অপহরণ করা হয়েছে? ধোঁকা দিয়ে আমাদের তিন সাথীকে হত্যা করা হয়েছে? তোমাদের ধর্ম এমন জঘন্য যে, নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে সমর্থন করে?

এ সময় প্রধান পুরোহিত তার একান্ত সেবকদের ডেকে বললো, এদের দু'জনকে নিয়ে যাও।

নাসিরকে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে দ্রুততার সাথে শেগুপ্তাকে নাসির বললো- শেগুপ্তা! গযনীর আত্মাভিমানী মেয়েদের মতো ইজ্জত রক্ষার জন্যে জীবন দিয়ে দেবে তবু ইজ্জত দেবে না। আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো।

নাসির ও শেগুপ্তাকে মন্দিরের একটি খোলা জায়গায় নিয়ে গেলো মন্দিরের সেবকরা। এক সময় নাসিরকে শেগুপ্তার কাছ থেকে ভিন্ন করে ফেলা হলো। প্রত্যেকের সাথে ছিল দু'জন করে প্রহরী।

হঠাৎ শেগুপ্তার উচ্চ কণ্ঠস্বর 'খোদা হাফেজ নাসির!' ভেসে এলো নাসিরের কানে। পর মুহূর্তেই শোনা গেল, ধরে ফেলো, ধরে ফেলো, চিৎকার।

ভেসে আসা আওয়াজের দিকে তাকিয়ে নাসির দেখতে পেলো, সেখানে একটি বড় কূপের উঁচু বেদিতে দাঁড়িয়ে আছে শেগুপ্তা এবং পলকের মধ্যেই সেই কূয়ার মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ল শেগুপ্তা।

এ অবস্থা দেখে নাসিরকে ধরে রাখা দুই প্রহরীও কূপের দিকে দৌড়ালো এবং তাদের চেচাঁমেচিতে আরো বহু লোক জমা হয়ে গেলো। ততোক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। বিশাল আঙিনায় একপাশে একটি মাত্র মশাল জ্বলছে। সমবেত সকল লোক কূপের ভেতর থেকে শেগুপ্তাকে উদ্ধারের জন্যে দৌড়াদৌড়ি করছে।

এক পর্যায়ে একটি দীর্ঘ দড়ি কূপের ভেতর ফেলা হলো এবং সেই দড়ি বেয়ে এক লোক কূপে নেমে গেলো। কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, মরে গেছে!

এমন হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে নাসিরের প্রতি নজর রাখার ব্যাপারটি সবাই ভুলে গেলো। কিছুক্ষণ পর নাসিরের পাহারায় নিয়োজিত লোক দু'জন ভীত বিহবল অবস্থায় এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো, তারা নাসিরকে কোথাও দেখতে পেলো না।

ততোক্ষণে নাসির মন্দিরের চৌহদ্দি পেরিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। মন্দিরের লোকজন যখন শেগুপ্তাকে উদ্ধারের ব্যাপারে ব্যস্ত তখন নাসির চতুর্দিকে তাকিয়ে একদিকে একটা দরজার মতো দেখতে পেলো। ভাগ্যক্রমে সেটি দিয়ে সে বেরিয়ে দেখলো, সামনে খোলা মাঠ। সে দ্রুত খোলা মাঠ পেরুতে দৌড়াতে লাগলো এবং দৌড়ে সে অনেকটা দূরে চলে এলো।

নাসির মন্দির থেকে বেরিয়েই দেখতে পেয়েছিল সামনে সাগর। সাগর দেখে ঠিক এর উল্টো দিকে অগ্রসর হলো। দৌড়াতে দৌড়াতে এক পর্যায়ে তার সামনে পরলো একটি ছোট্ট নদী। এলাকাটি ছিল নাসিরের সম্পূর্ণ অচেনা অজানা। হিন্দু অধ্যুষিত এই এলাকায় কোন মুসলমানের বাড়িতেই কেবল তার জন্যে আশ্রয় হতে পারে। কিন্তু নাসিরের পক্ষে এটা জানার কোন উপায় ছিলো না যে এই এলাকায় কোথায় মুসলিম বসতি রয়েছে। আর সেটাইবা কোন দিকে। আল্লাহর নাম নিয়ে কাল বিলম্ব না করে নাসির নদী পার হয়ে গেলো। নদীতে তেমন পানি ছিলো না।

নদী পার হয়ে নাসির বিরতিহীন পথ চলতে লাগলো। নাসির ভাবছিল সারা রাত যতটুকুই যাওয়া যায় সে পথ চলবে। দিনের আলোয় যা হওয়ার হবে। কিন্তু

দীর্ঘক্ষণ চলার পর তার চোখে পড়লো একটু আলো। আলো লক্ষ্য করে সে অগ্রসর হতে লাগলো। আলোর কাছাকাছি পৌঁছে নাসির দেখতে পেলো, মসজিদের মতো একটি মিনার সম্বলিত ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। ঘরটি সম্পূর্ণ নির্জন এলাকায়। পাশে আর কোন ঘর নেই। তবে একটু দূরেই একটি বসতির মতো দেখা যাচ্ছে। নাসির পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো সেই বাতি ঘরের দিকে।

নাসিরের মনে হচ্ছিল এটি হয়তো মসজিদ হবে, কিন্তু সে নিশ্চিত হতে পারছিলো না, হিন্দুস্তানের এতোটা ভেতরেও কোন মসজিদ থাকতে পারে। পায়ে পায়ে ঘরটির আঙিনায় এগিয়ে গেল নাসির। গিয়ে দেখে ঘরের ভেতরে প্রদীপের সামনে বসে একজন সাদা শশ্রুধারী লোক কি যেন পড়ছে।

ভেতরে না গিয়ে দরজার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়াল নাসির। এমন সময় তার কানে ভেসে এলো– আসসালামু আলাইকুম.... নাসির জবাব দিলো– 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম...। সালামের পর লোকটি আরো যে কয়টি কথা বললো তার কিছুই নাসিরের পক্ষে বুঝা সম্ভব হলো না। কিন্তু লোকটির মধ্যে ইসলামের অনুশীলন দেখে নাসিরের মধ্যকার সকল ভয়ভীতি দূর হয়ে গেল এবং অনেকটাই নিরাপদবোধ করছিল নাসির।

গযনী..... গযনী। বলে ইশারা-ইঙ্গিতে নিজেকে সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীর লোক বলে পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করল নাসির। শশ্রুধারী লোকটি তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ঘরটি ছিল প্রকৃত পক্ষেই একটি মসজিদ এবং তিনি ছিলেন সেই মসজিদের ইমাম। তিনি নামাযের পূর্বে নীরবে কোন কিতাব পাঠ করছিলেন। তিনি এই এলাকাতেই থাকতেন। তবে তার কথাবার্তায় নাসির বুঝতে পারলো তিনি প্রকৃতপক্ষে এই এলাকার লোক নন।

ইশারা ইঙ্গিতে ইমাম সাহেবকে নাসির বুঝাতে সক্ষম হলো, সোমনাথের লোকেরা তাকে বন্দি করেছিলো, সেখান থেকে সে পালিয়ে এসেছে। এই মুহূর্তে তার একটি নিরাপদ আশ্রয় দরকার। ইমাম সাহেব আরেকজন লোককে ডেকে আনলেন। সেই লোকটি হিন্দুস্তানের বিভিন্ন ভাষা জানতো। নাসির হিন্দুস্তানের যে ভাষা বুঝতো এবং কথা বলতে পারতো সেই লোকটির কাছে সেই ভাষায় তার অবস্থা বললো। ফলে ইমাম সাহেব বুঝতে পারলেন, নাসিরের উপর দিয়ে কি অত্যাচার বয়ে গেছে এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে তাকে এখন কি করতে হবে?

বস্তুত এখানকার মুসলমানরা সুলতান মাহমুদ সম্পর্কে তেমন কিছু জানতো না। তারা লোক মুখে উড়ো উড়ো কিছু কথা শুনেছে– উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে

এক শক্তিশালী লুটেরা বাদশাহ প্রতি বছর হিন্দুস্তানের বিভিন্ন মন্দিরে হামলা করে সেখানকার মূর্তিগুলোকে ভেঙে চুড়ে সোনা দানা লুট করে নিয়ে যায়। হিন্দুস্তানের পশ্চিমাঞ্চল থেকে যারা সোমনাথে পূজা করতে আসে তাদের মুখে তারা এসব কথাবার্তা শুনে আসছে।

নাসির তাদেরকে জানালো, সুলতান মাহমূদ কোন লুটেরা বাদশা নন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান সুলতান। তিনি হিন্দুস্তানে মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সালতানাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান। তিনি এখানকার মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি ও মুসলমানদের জীবন নিরাপদ করার জন্যে মন্দির ও মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করেন এবং সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

আমরা আরব বংশোদ্ভূত লোক। আমাদের পূর্ব পুরুষরা ছিলেন আরব। তাঁরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে এ দেশে এসেছিলেন, বললেন ইমাম। তিনি আরো বললেন, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ডাবেল থেকে ফুল আদম পর্যন্ত গোটা উপকূলীয় এলাকায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই সোমনাথের তখন কোন গুরুত্বই ছিল না। মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রভাব কমে যাওয়ার পর সোমনাথ এতোটা প্রচার পেয়েছে। ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতেরা সোমনাথকে ঘিরে এমনসব কাহিনী ছড়িয়ে দিয়েছে যে, বড় বড় রাজা মহারাজারাও এখন সোমনাথে পূজা দিতে আসে।

সুলতান মাহমূদ যদি সত্যিকার অর্থেই মূর্তি সংহারী হয়ে থাকেন এবং ইসলামের পতাকাবাহী হয়ে থাকেন তবে তার জানা দরকার, এখানে সোমনাথ নামের একটি মন্দিরও আছে এবং হিন্দুরা দাবী করে তাদের দেবদেবীরা এই মন্দির বানিয়েছে।

আপনারা যদি আমাকে একটি ঘোড়া দিতে পারেন, তাহলে আমি গোয়ালিয়র ফিরে না গিয়ে সোজা গযনী চলে যাবো এবং সোমনাথ আক্রমণ করার জন্যে সুলতানকে অনুরোধ করবো।

তুমি হয়তো তোমার উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সোমনাথ আক্রমণের কথা বলছো, বললেন ইমাম। সেই সাথে তিনি বললেন, তোমার সঙ্গীনী যে মেয়েটি কূপে ঝাপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, হয়ত তারও মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছো তুমি।

ইমাম নাসিরের উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি তো এই মন্দিরের প্রকৃত অবস্থা জানো না। এখানে কি ধরনের জঘন্য কর্মকাণ্ড ঘটে তা তোমাকে সবিস্তারে

জানাবো এবং দ্রুত গযনী পৌঁছার জন্য ঘোড়াসহ সংক্ষিপ্ত পথও বলে দেবো। তোমার সুলতানকে জানাবে, সোমনাথ ইসলামের তৌহিদী ঝাণ্ডাকে উপড়ে ফেলার হুমকি দিচ্ছে এবং এখানে অসংখ্য নিরপরাধ মুসলিম তরুণীকে হত্যা করা হয়েছে। জানা নেই, কতোজন মুসলিম তরুণীকে এই মন্দিরে এনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে নাচতে বাধ্য করা হয়েছে এবং মূর্তির সামনে তাদের বলি দেয়া হয়েছে।

আমাদের ঘরে কোন সুশ্রী মেয়ে শিশু জন্মালে সেই শিশুকে কিংবা গোটা পরিবারকেই আমরা নিরাপদ দূরত্বে পাঠিয়ে দেই। তোমাদেরকে যে ভাবে এখানে অপহরণ করে নিয়ে আসা হয়েছে, হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গা থেকে সুন্দরী মুসলিম তরুণীদের অপহরণ করে এখানে এনে জবাই করা হয়। এই মন্দিরটি একটি বিকৃত যৌন-অপকর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এখানকার পুরোহিত ও পণ্ডিতেরা রাত দিন অশ্লীল অপকর্মে লিপ্ত থাকে।

ইমাম সাহেব দুভাষীর মাধ্যমে নাসিরকে সোমনাথের পুরো ইতিহাস, এই মন্দির ঘিরে যেসব অপকর্ম ও কর্মকাণ্ড হয় সবিস্তারে জানালেন। তিনি বললেন তুমি তোমার সুলতানকে বলো, হিন্দুস্তানের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে ইসলামের আলো পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া মোমের মতোই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

ইমাম সাহেব আরো বললেন, হিন্দুস্তানের মুসলমানরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে। তারা সবসময় ভয় ও আতংকে দিন কাটাচ্ছে। এখানকার অধিকাংশ মুসলমান হিন্দুদের অত্যাচারে এ এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ আরব দেশে ফিরে যাচ্ছে এবং হিন্দুরা ক্রমশ পরাক্রমশালী হয়ে উঠছে।

ইনশাআল্লাহ আমরা আসবো, সুলতানও আশা করি এখানে অভিযান চালাবেন– ইমামকে আশ্বস্ত করতে বললো নাসির। তখন আপনি দেখবেন, হিন্দুদের কথিত এসব শক্তিধর দেবদেবী টুকরো টুকরো হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে। দয়া করে আমাকে আপনারা একটি ঘোড়া দিন এবং পথের কিছু পাথেয় দিয়ে পথটা বলে দিন।

এদিকে মন্দির জুড়ে শুরু হলো নাসিরের খোঁজাখুঁজি। নাসিরের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিতে সোমনাথের প্রধান পুরোহিতের কোন উদ্বেগ ছিল না। কিন্তু নাসিরের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটি রাজা অর্জুন ও তার সঙ্গী পণ্ডিতকে খুবই দুশ্চিন্তায় ফেলে দিলো। কারণ তাদের উভয় শিকারই হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

মন্দির ও আশেপাশের এলাকায় রাজা অর্জুন ও তার সঙ্গীরা যখন নাসিরকে হন্যে হয়ে খুঁজছে, তখন নাসির সোমনাথ থেকে দশ বারো মাইল দূরে ইমামের

সামনে বসা। ইমাম সাহেব তাকে পেট ভরে খাওয়ালেন। এরপর গ্রামের একজন প্রবীন লোককে ডেকে আনা হলো। এই প্রবীণ এলাকার পথঘাট ও চলাচলের গতিপথ সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ।

তাকে ঘোড়া না দিয়ে উট দাও– বললেন প্রবীণ। কারণ তাকে অনেক বড় মরুভূমি ও পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করতে হবে। ঘোড়া এতো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে পারবে না, পথিমধ্যেই মারা যাবে। যাত্রীও মারা যাবে। প্রবীণ নাসিরকে পথ বুঝাতে বুঝাতে বললেন, দুপুর পর্যন্ত তুমি সূর্যকে হাতের ডানে রেখে অগ্রসর হবে এবং দুপুরের পর সূর্যকে বামে রেখে যেতে থাকবে। রাতের বেলায় ধ্রুবতারাকে নাক ও কাঁধের মাঝখানে রেখে পথ চলবে।

পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছানোর পর তোমাকে পাহাড় ঘুরে যেতে হবে। তবে যতোটাই মোড় নিতে হোক না কেন দিনের বেলায় তুমি সূর্য এবং রাতের বেলায় ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে যেভাবে চলতে বলা হয়েছে সেভাবে পথ চলবে। পর দিন রাতের অন্ধকারে নাসির একটি তরতাজা শক্তিশালী উটের পিঠে সওয়ার হয়ে সাথে পর্যাপ্ত রসদ নিয়ে গযনীর উদ্দেশ্য রওয়ানা হলো। কারণ, তাকে যথাসম্ভব দ্রুত গযনী পৌঁছাতে হবে।

* * *

নাসির উটের পিঠে সওয়ার হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। দিন রাত বিরতিহীনভাবে পথ চলছিল নাসির। উঠের পিঠে বসেই কিছুটা ঘুমিয়ে নিতো। খুব সামান্য সময় সে উটকে বিশ্রাম দিতো।

এদিকে সুলতান মাহমূদ তার সকল প্রতিবেশি রাজ্যের একই চুক্তিতে আবদ্ধ করে প্রত্যেক শাসক ও সরদারের কাছ থেকে কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে গযনী ফিরে এসেছেন। এর ঠিক তিন চার দিন পরের এক বিকেলে তার কাছে খবর পাঠানো হলো, হিন্দুস্তানে নিয়োজিত নাসিরুদ্দৌলা নামের এক সৈনিক এসেছে। সে এখনই সুলতানের সাথে সাক্ষাত করতে চায়।

সুলতান সাথে সাথে তাকে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। নাসিরকে সুলতানের সামনে হাজির করা হলো। তাকে দু'জন প্রহরী ধরে রেখেছিল। কারণ, নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়ানোর মতো শক্তি তার ছিলো না। তার মাথা দুলছিল এবং শরীর মৃতদেহের মতো অসাড় হয়ে পড়েছিল।

নাসিরকে সুলতানের চৌকিতে শুইয়ে দেয়া হলো। সাথে সাথে চিকিৎসক ডাকা হলো। চিকিৎসক নাসিরকে দেখে বললো, রোগী অনেকটা অচেতন এবং তার ঘুমের প্রচণ্ড ঘাটতি রয়েছে। এই মুহূর্তে তার সাথে কোন কথা বলা যাবে না, তাকে বিশ্রাম দিতে হবে। চিকিৎসক তার পাশে বসে মুখের মধ্যে একটু একটু করে মুধ দিতে লাগলেন।

এভাবে কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর নাসিরের চেতনা ফিরে এলো এবং সে ধীরে ধীরে চোখ মেললো। তখন তাকে উপযুক্ত খাবার ও পানীয় দেয়া হলো। পানাহারের পর সে কথা বলার শক্তি ফিরে পেলো। কথা বলার শক্তি ফিরে এলে সে সুলতানকে জানালো– কিভাবে তাকে এবং শেগুপ্তাকে হিন্দুরা অপহরণ করেছে এবং সে সোমনাথে কি দেখেছে এবং সোমনাথ সম্পর্কে কি শুনেছে। তা ছাড়া পালিয়ে এসে ইমামের সহযোগিতায় কিভাবে সে গযনী পৌঁছেছে তার সবই সুলতানকে সবিস্তারে জানালো নাসির। নাসির আরো জানালো, ওখানকার মুসলমানরা সুলতানের আগমন প্রত্যাশায় প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। নাসির সেখানকার ইমাম সাহেবের পাগামও পেশ করলো।

আমার মন অনেক দিন থেকেই এমন একটা কঠিন অভিযানের কথা ভাবছিল। নাসিরের পয়গাম শোনার পর হিন্দুস্তানের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন সুলতার মাহমূদ। হিন্দুস্তানের মানচিত্রে ডাভেলের উপর আঙুল রেখে সুলতান বললেন, মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রথম এই জায়গাতেই লড়াই করেছিলেন। আর এই হলো... সোমনাথ।

তখনই প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈকে ডেকে পাঠালেন সুলতান মাহমুদ।

আলতাঈ! আমার মনে হচ্ছে এটা হবে আমার জীবনের শেষ অভিযান! মানচিত্র দেখো... খুবই লম্বা সফর এবং মারাত্মক কষ্টকর। আমি যদি সেখানে পৌঁছতে পারি, তাহলে ইতিহাসে আমি নতুন এক অধ্যায় সংযোজন করবো। আর এই যুদ্ধ হবে আমার জীবনের সকল যুদ্ধের চেয়ে কঠিনতম যুদ্ধ। ভবিষ্যতের লোকেরা সোমনাথের সাথে আমার নামও উচ্চারণ করবে।

আলতাঈ গভীরভাবে মানচিত্র দেখছিলেন। তিনি ইতিহাসের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ সেনাপতি। জলে স্থলে পাহাড়ে মরুভূমিতে সব ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে যুদ্ধ করার বিরল অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। কিন্তু এতো দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে তিনি সেখানে তার সেনাদের নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন কি-না এ বিষয়টি তাকে ভাবিয়ে

তুললো। আলতাঈর চিন্তায় ছেদ ঘটিয়ে সুলতান বললেন, জানো আলতাঈ! মুহাম্মদ বিন কাসিম কতদূর থেকে এসেছিলেন? আমি তার সেই ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাই।

লাহোর আমাদের নিয়ন্ত্রণে। আমরা সেখান থেকে প্রয়োজনীয় রসদ সামগ্রী নিতে পারবো। মুলতানও আমাদের দখলে। সেখান থেকে আমাদেরকে বিপুলসংখ্যক উট সংগ্রহ করতে হবে। কারণ, পথি মধ্যে বিশাল মরু এলাকা রয়েছে। উট ছাড়া এই দুর্গম পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে না।

চিন্তা করছো কি? ঘাবড়াবার কিছু নেই। সবই আছে আমাদের। প্রধান সেনাপতিকে আশ্বস্ত করতে বললেন সুলতান। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শক্তিশালী ঈমান ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি। দৃঢ় ইচ্ছা ও ঈমানী শক্তি থাকলে সবকিছুই সহজ হয়ে যায়।

সুলতান মাহমূদ ও আলতাঈ উভয়েই মানচিত্রের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং অভিযানের পরিকল্পনা তৈরি করতে লাগলেন।

সুলতান মাহমুদ হয়তো তখনো বুঝতে পারেননি, তিনি এমন এক অভিযান শুরু করতে যাচ্ছেন যাতে তিনি বিজয়ী হলে এটা হবে হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় এবং এই বিজয় সাধিত হলে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে অনুসারীদের সংশয় সৃষ্টি হবে।

১০২৫ সালের ১৮ অক্টোবর মোতাবেক ৪১৬ হিজরী সনের ২২ শাবান সোমনাথের উদ্দেশ্যে রওয়ান হলেন সুলতান মাহমুদ। এসময় তার সাথে কতো জন সৈনিক ছিলো একথা কোন ঐতিহাসিক সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। কেউ বলেছেন, সোমনাথ অভিযানে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে তিনি গযনী থেকে রওয়ানা করেছিলেন। কেউ বলেছেন, সোমনাথ অভিযানে রওয়ানা করার সময় গযনী থেকে তার সফর সঙ্গী হয়ে ছিলো ত্রিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী।

হিন্দুস্তানের সীমানায় প্রবেশ করে সুলতান মাহমুদ লাহোরের দিকে না গিয়ে সোজা মুলতানের দিকে অগ্রসর হলেন। বিশাল সেনাবাহিনী দেখে মুলতানের লোকজনের মধ্যে কৌতুল সৃষ্টি হলো। সুলতান এমন বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে কোথায় যাবেন?

১০২৫ সালের ২৫ নভেম্বর মোতাবেক ১৫ রমযান সুলতান মুলতান পৌছেন। নাসিরুদ্দৌলার বক্তব্য শুনে সুলতান মাহমূদ সাথে সাথেই সোমনাথ অভিযানে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন, দুই কারণে–

১. যে কোন বিষয়ে কালক্ষেপণ ছিলো সুলতানের স্বভাব বিরোধী।

২. তখন ছিলো শীতকাল। গরম চলে এলে এই দীর্ঘ সফর তার সেনাদের জন্যে কষ্টকর হয়ে উঠবে, এজন্য তিনি কাল বিলম্ব না করে সোমনাথের উদ্দেশ্যে অভিযানের নির্দেশ দেন।

সুলতানের মুলতান আগমন ছিল খুবই দ্রুত। তিনি মুলতানে পৌছেই সেখানে নিয়োজিত গযনীর সরকারী কর্মকর্তাদের একত্রিত করে বললেন, আমাকে খুব তাড়াতাড়ি সোমনাথ পৌঁছার ব্যবস্থা করতে হবে।

সেই সাথে তিনি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলেন, তার এই অভিযানের কথা যেনো বাইরের কেউ জানতে না পারে? আর পথের সব বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

বাস্তবে এতো বিশাল সেনাবাহিনীর আগমন ও তাদের গতিবিধি গোপন রাখার ব্যাপারটি সহজ ছিল না। কারণ সুলতানের শত্রুপক্ষের গোয়েন্দারাও সক্রিয় ছিল। সেখানে হিন্দুরাও বসবাস করতো। বাস্তবে মুলতানে তখনো হিন্দু বসতির সংখ্যাই ছিলো বেশি।

গযনী সালতানাতের যেসব কর্মকর্তা মুলতানে নিয়োজিত ছিলো, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুদের সুন্দরী নারী ও বিপুল টাকা পয়সার লোভে পড়ে ঈমান বিরোধী এবং রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে সুলতান মাহমূদ মুলতান পৌঁছার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই শীর্ষ হিন্দুরা জেনে ফেলেছিল সুলতান মাহমূদ সোমনাথ আক্রমণ করতে যাচ্ছেন।

সোমনাথ মন্দিরের সবচেয়ে বড় শিবমূর্তিটি ছিল তখনকার হিন্দুদের অন্যতম প্রধান দেবতা পুরো হিন্দু জাতির প্রাণ। কারণ শিব ছিল দেবতাদেরও দেবতা। সোমনাথের ধ্বংস তো দূরের কথা সোমনাথের এতটুকু অবমাননাও সহ্য করতে রাজী নয় হিন্দু সম্প্রদায়। মুলতানের হিন্দুরা যখন জানতে পারলো, সুলতান মাহমূদ সোমনাথ যাচ্ছেন, তখন তাদের আত্মা কেঁপে উঠলো। তারা সুন্দরী যুবতীদের ইজ্জত ও সোনার থলের বিনিময়ে সুলতানের সোমনাথ অভিযানের পরিকল্পনা জেনে নিলো। সাথে সাথেই সোমনাথ কর্তৃপক্ষের কাছে এই খবর পৌঁছানোর জন্য দূত পাঠিয়ে দিলো।

শুধু তাই নয়, যেসব ছোট্ট ছোট্ট রাজ্যের হিন্দু রাজাও বড় বড় মহারাজাদের সাথে তখনো পর্যন্ত সুলতান মাহমূদের সংঘর্ষ হয়নি, মুলতানের হিন্দুরা তাদের

কাছেও খবর পৌঁছে দিলো। হিন্দুরা সোমনাথ রাজ্যের শাসক রায় কুমারের কাছে এই বলে খবর পৌঁছালো– তিনি যেনো সোমনাথের বাইরে সুলতান মাহমূদকে ঠেকানোর ব্যবস্থা করেন।

মুলতান পৌঁছে সুলতান মাহমূদ সোমনাথ অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উট ও পানির ব্যবস্থায় মনোযোগ দিলেন। মুলতানে সুলতানের এক বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলো।

বুযুর্গ সুলতানকে বললেন, সম্মানিত সুলতান! আপনি সোমনাথকে সেসব মন্দিরের মতো মনে করবেন না, যেসব মন্দির ইতোমধ্যে আপনি ধ্বংস করেছেন। সোমনাথ দুর্গকেও আপনি সেসব দুর্গের মতো মনে করবেন না, এরই মধ্যে যেসব দুর্গ আপনার বিজিত হয়েছে। আমাদের কা'বার উপর যদি আক্রমণ হয়, কা'বাকে বাঁচানোর জন্যে কি দুনিয়ার সকল মুসলমান জীবন বাজী রাখবে না? সোমনাথের জন্যও হিন্দুস্তানের সকল হিন্দু জীবনবাজী রাখবে। সোমনাথে আপনার কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। এটাকে শুধু একটি মন্দির বা দুর্গ ভাবার কোন অবকাশ নেই। এখানে ইসলাম ও পৌত্তলিকতা মুখোমুখি হবে। আপনি এখানে পরাজিত হলে সেটিকে ইসলামের পরাজয় ভাবা হবে। আর হিন্দুরা আরো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে তাদের শিব দেবতাই সত্য। তারা এটাও প্রচার করবে, শিবদেবের সামনে কেউ টিকতে পারবে না। এর পরিণতি হবে, উপকূল এলাকার দুর্বল মুসলমানরা হিন্দুত্বকে গ্রহণ করবে অথবা তাদেরকে হিন্দুত্ব গ্রহণে বাধ্য করা হবে।

মনে হচ্ছে আমি মারাত্মক ঝুকির মধ্যে পড়তে যাচ্ছি– বললেন সুলতান মাহমূদ।

অবশ্যই, এটা হবে আপনার জীবন ও ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক ঝুকি– বললেন বুযুর্গ। যুদ্ধ সম্পর্কে আপনি ভালো জানেন সুলতান! এ ব্যাপারে আমার তেমন অভিজ্ঞতা নেই। আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, শত্রুরা কিন্তু আপনার ব্যাপারে বেখবর নয়। আপনি গোপনে নিজের চৌকির তল্লাশী নিন এবং নিজের আস্তীনেরও খবর নিন। আপনার নিজের ঘরের শত্রুরাই আপনার জন্যে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

এ ব্যাপারে আপনি কি আমাকে সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারেন? বুযুর্গকে অনুরোধের স্বরে বললেন সুলতান।

হ্যাঁ, আমার শিষ্যরা আপনার এক কর্মকর্তা সম্পর্কে বলেছে, সে নাকি হিন্দুদের কাছে ঈমান বিক্রি করে দিয়েছে। এই কর্মকর্তা শুরু থেকেই মুলতানে দায়িত্ব পালন করছে। আজ তার ঘরের দিকে আপনি একটু নজর রাখবেন। হয় তার কাছে কেউ আসবে, নয়তো সে কোন জায়গায় যাবে।

* * *

সুলতান মাহমূদ তখনি একজন ডেপুটি সেনাপতিকে সন্দেহভাজন কর্মকর্তার গতিবিধির উপর চোখ রাখার দায়িত্ব দিলেন। ডেপুটি সেনাপতি মধ্য রাতে সুলতানকে খবর দিলো, সন্দেহভাজন কর্মকর্তা একটি লম্বা আলখেল্লা পরে মাথা কাপড়ে ঢেকে এক হিন্দু প্রতাপশালী ব্যক্তির হাবেলীতে প্রবেশ করেছে।

সুলতান নির্দেশ দিলেন, সেই হাবেলীকে ঘেরাও করে প্রাচীর ডিঙিয়ে বাড়ির কেউ বুঝে উঠার আগেই অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করবে। যাতে অভিযোগ অস্বীকার করার সুযোগ না থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে সুলতানের নির্দেশ পালিত হলো। প্রভাবশালী হিন্দুর হাবেলীর মূল ফটকের কড়া না নেড়ে পার্শ্ববর্তী বাড়ির ফটকের কড়া নাড়লো সুলতানের গোয়েন্দা বাহিনী। আর সেই হাবেলীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলা হলো। পার্শ্ববর্তী বাড়ির গেট খুলে দিতেই দ্রুতগতিতে সেই বাড়িতে কয়েকজন সৈন্য প্রবেশ করে তাদের কাছ থেকে জেনে নিলো, পাশের বাড়িতে উপর দিয়ে প্রবেশের পথ কোনটা? তারা জানালো, এদিক থেকে ওই বাড়িতে যাওয়ার কোন পথ নেই। ছাদ থেকে রশি বেয়ে নিচে নামতে হবে।

নির্দেশনা মতো কয়েকজন সৈনিক পাশের বাড়ির ছাদে রশি বেঁধে নিচে রশি ফেলে দিলো এবং একের পর একজন করে দ্রুততার সাথে কয়েকজন সৈনিক বাড়ির উঠানে নেমে পড়লো। প্রথম সৈনিক হাবেলীর উঠানে নামার সাথে সাথেই বাড়ির মধ্য থেকে কেউ তাকে দেখে হুশিয়ারী উচ্চারণ করলো– সাবধান! এখান থেকে চলে যাও, নয়তো প্রাণে বাঁচবে না।

সাথে সাথে হুশিয়ারী উচ্চারণকারীর উদ্দেশ্যে পাল্টা হুমকি এলো– সাবধান! যেখানে আছো সেখানেই থাকো। একটু নড়াচড়া করলেই তীর ছোড়া হবে। আমরা কোন ডাকাত নই, সরকারী লোক।

ততোক্ষণে দশ বারোজন সৈনিক রশি বেয়ে সেই বাড়ির উঠানে নেমে পড়েছে। তারা হুশিয়ারি উচ্চারণকারী ব্যক্তির বুকে তরবারী ঠেকিয়ে বললো, গযনী সরকারের অমুক কর্মকর্তা কোন কক্ষে অবস্থান করছে?

ঠিক সে সময় এক সাথে দু'টি কক্ষের দরজা খুলে গেল, এবং বিষ্ময় ও আতংকগ্রস্ত চেহারা নিয়ে তিন জন লোক বাইরের অবস্থা দেখে আবার ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিতে চাইলো।

কিন্তু এরই ফাঁকে কয়েকজন সৈনিক দরজা ঠেলে কক্ষে ঢুকে পড়লো। অভিযুক্ত গযনীর কর্মকর্তা একটি পালংকের উপরে বসা ছিল। সে সৈন্যদের দেখে ঘরের এক কোণার দিকে লুকাতে চাচ্ছিল। কিন্তু সৈন্যদের একজন অভিযুক্ত কর্মকর্তার পাঁজরে তরবারী ঠেকিয়ে বললো- হাত উপরে উঠিয়ে ফেলো, কোন নড়াচড়া করবে না।

সেই কক্ষের মেঝেতে একটি কাগজ পড়েছিল। সৈন্যরা সেই কাগজটি উঠিয়ে দেখলো, তাতে পেন্সিল দিয়ে একটা নক্সা আঁকা হয়েছে এবং কিছু সাংকেতিক চিহ্ন দেখানো হয়েছে। কাগজের গুরুত্ব বুঝে সৈন্যরা সেটি তোলে সংরক্ষণ করলো।

সেই কক্ষে আরো ছিলো দু'জন সুন্দরী তরুণী। তারা প্রায় অর্ধ নগ্ন। অসম্ভব সুন্দর তাদের দেহাবয়ব। পাশের কক্ষে ছিল চারজন অভিজাত হিন্দু। এরা সবাই মদ পানে লিপ্ত ছিলো। এরা সুলতান মাহমূদের কর্মকর্তার কাছ থেকে তার সফর সূচী জেনে নিয়ে সুলতানের অভিযান ভণ্ডুলের পরিকল্পনা তৈরি করছিলো। আর সুন্দরী তরুণী দু'জন তাদের দেহ ও রূপ দিয়ে গযনীর ঈমান বিক্রেতাকে জাহান্নামের আয়াসে পরিতৃপ্ত করার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলো।

অভিজাত এই হিন্দুরা অভিযানকারী সৈন্যদের সামনে থলে ভরা স্বর্ণমুদ্রা রেখে বললো- আপনারা আমাদেরকে ছেড়ে দিন, যতো স্বর্ণমুদ্রা দরকার আমরা তাই দেবো। প্রত্যেককে একজন করে সুন্দরী নারীও দেবো। এছাড়াও সাত পুরুষ পর্যন্ত নিশ্চিন্তে থাকার মতো ব্যবস্থা আমরা আপনাদের জন্য করে দেবো। বাকী জীবনটাকে সুখে কাটানোর জন্যে আমাদেরকে ছেড়ে দিন। নগদ উপহার নিয়ে জীবনটাকে ভোগ করুন।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও গুরুত্ব তখন আর গ্রেফতারকৃত কর্মকর্তার বুঝতে বাকী রইলো না। অবস্থার আকষ্মিকতায় সে হতবাক হয়ে গেলো। তার মুখে

কোন কথাই উচ্চারিত হলো না। গযনীর সৈন্যদেরকে হিন্দুদের কোন লোভ লালসাই দমাতে পারলো না। তারা সবাইকে গ্রেফতার করে সুলতানের কাছে নিয়ে এলো। সুলতান তখনো জেগে জেগে গোয়েন্দা অভিযানের রিপোর্ট পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

* * *

অভিযানকারীরা অপরাধের আলামত স্বরূপ শরাবের সুরাহী, মুদ্রাভর্তি থলে এবং অর্ধ নগ্ন দুই তরুণীসহ গ্রেফতারকৃত হিন্দুদেরকে সুলতানের সামনে পেশ করলো। সুলতান মদের সুরাহী, থলে ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা, দুই তরুণীর দিকে চোখ বুলালেন। তারপর ছয় বছর ধরে মুলতানে কর্মরত কর্মকর্তার প্রতি তাকালেন। তার মুখ থেকে তখনো শরাবের গন্ধ বেরুচ্ছিলো। অভিযানকারীরা নক্সা আঁকা কাগজটি সুলতানের হাতে তোলে দিলো।

তুমি যদি আনাড়ি হতে, বয়স কম হতো, মূর্খ হতে তাহলে আমাকে বলতে হতো, তুমি কি অপরাধ করেছো– ধৃত কর্মকর্তাকে বললেন সুলতান।

তুমি কি করেছো এবং কি কাজে লিপ্ত হয়েছিলে এর পরিণতি কি হতে পারে এটা তুমি জানো। আমি আশা করবো, তুমি সবকিছু খোলাখুলি বলে দেবে। তোমার অপরাধ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তুমি অমার্জনীয় অপরাধ করেছো। তুমি শুধু সালতানাতে গযনীর বিরুদ্ধাচরণ করোনি, আমার বিরোধিতা করোনি, তুমি ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করেছো। এই অপরাধের কি শাস্তি হতে পারে সে সম্পর্কেও তুমি ওয়াকিবহাল। এখন তুমি ঈমানকে নিলাম করে যা কিছু অর্জন করেছো, তা সবিস্তারে বলে ফেলো। আল্লাহ্ হয়তো তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

যদি না বলো, তাহলে তোমাদের মতো লোকদের কাছ থেকে কিভাবে কথা বের করতে হয় তা যে আমাদের জানা আছে তা তুমি ভালোই জানো। তুমি যাদের সাথে আঁতাত করেছো, আমার হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর ক্ষমতা তাদের নেই। এসব সুন্দরী নারী, মুদ্রার থলে আর শরাবের সূরাহী আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে পারবে না।... বলো ।

সুলতানের কথা শেষ হতে না হতেই সেই বেঈমান কর্মকর্তা সুলতানের পায়ে পড়ে মাথা তার পায়ে রেখে দিলো।

সুলতান দ্রুত তার পা সরিয়ে নিয়ে বললেন– সরে যাও, তোমার নাপাক শরীর আমার পায়ে লাগাবে না। আমি অযু অবস্থায় থাকি, আগামীকাল রোযা রাখবো।

ধৃত হিন্দুদের দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুলতান বললেন– তোমরা কি করছিলে? দেরি না করে দ্রুত বলতে থাকো। এটাই হবে তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। তরুণীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি কক্ষে আটকে রাখো।

হিন্দুদের একজন হাত জোড় করে আবেদন করলো– মহারাজ সুলতান! এই তরুণীদের একজন আমার মেয়ে। আর অন্যজন একজন সম্মাণিত ব্যক্তির কন্যা। এদের কোন অন্যায় নেই।

তোমাদের কি জোর করে সেই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো? তরুণীদের জিজ্ঞেস করলেন সুলতান। তোমরা কি জানতে কি করতে হবে তোমাদের?

হ্যাঁ, জানতাম আমরা। দৃঢ়কণ্ঠে বললো এক তরুণী। আমাদেরকে জোর করে সেখানে নেয়া হয়নি। এতে আপনি মনে করবেন না, দেহব্যবসা আমাদের পেশা। আমরা অভিজাত ঘরের মেয়ে। আমরা ধর্মের সেবিকা। আমরা যা করেছি, ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেছি। আমরা আমাদের সেইসব ধ্বংস প্রাপ্ত মন্দিরগুলোর প্রতিশোধ নেয়ার শপথ নিয়েছি, যেসব মন্দির আপনি ধ্বংস করেছেন।

তরুণীর কথা শুনে সুলতানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি সেই কর্মকর্তার দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা মাখা কণ্ঠে বললেন– আমি অধিকাংশ হিন্দুস্তান জয় করেছি, বহু রাজা মহারাজাকে পরাজিত করেছি, হিন্দুদের দেবদেবীদের ভেঙেচুড়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছি। আমার যোদ্ধারা এদের কথিত দেবতাদেরকে পরাজিত করে পদদলিত করেছে; কিন্তু এই অবলা তরুণীদের কাছে তুমি আত্মসমর্পন করে গোটা জাতিকে পরাজিত করার চক্রান্ত করেছো? ছি: তোমার মতো নরাধমকে মাটিতে মিশিয়ে দিলেও উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে না।

আমরা এমন জাতির নারী যে জাতির মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুতে নিজেদের স্বতীত্ব প্রমাণ করতে জ্বলন্ত চিতায় আত্মহুতি দেয়। নিজের ধর্ম, জাতি ও দেশের প্রয়োজনে আমরা দেহ বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না, বরং দেশ, জাতি ও

ধর্মের জন্য নিজের দেহ ব্যবহারকে আমরা গর্বের বিষয় মনে করি। বললো অপর তরুণী।

এই পৃথিবীতে ইসলাম থাকতে পারবে না, থাকবেও না। এটাই আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ধর্মীয় পুরোহিতরা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন– তোমাদের শরীরটাকে একটি লোভনীয় বিষ মনে করে তা দিয়ে শত্রুদের ঘায়েল করো । আপনার কাছে আমাদের একটাই আবেদন, যত দ্রুত সম্ভব আমাদেরকে হত্যা করে ফেলুন, আমাদের কষ্ট দিয়ে হত্যা করবেন না।

আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি, নিজ ধর্মের প্রতি ও নিজ জাতির প্রতি তোমাদের প্রতিশ্রুতি ও দায়বদ্ধতার জন্যে। তোমরা সত্যিই তোমাদের জাতি ও ধর্মের জন্যে আত্মনিবেদিতা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অশ্লীলতা ও অনৈতিকতার উপর যে ধর্মের ভিত্তি গড়ে উঠেছে এমন ধর্মের মেয়েরা অশ্লীলতা ও সম্ভ্রম বিক্রি করাকে গর্বের বিষয় মনে করবে এটাই স্বাভাবিক। আমি কথা দিচ্ছি– তোমাদের আবেদন রক্ষা করবো...।

* * *

গ্রেফতারকৃত কর্মকর্তা ও ধৃত হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীরা সুলতানের কাছে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার করল। গযনীর কর্মকর্তাকে চক্রান্তকারীরা হাত করে নিয়েছিলো। ফলে এই কর্মকর্তা হিন্দুদের জানিয়ে দিয়েছিলো, সুলতান মাহমূদ সোমনাথ আক্রমণ করতে যাচ্ছেন এবং তার নির্দেশে গযনীর সেনারা গতিপথ নির্ধারণের জন্যে সেদিকে গেছে।

* * *

চক্রান্তকারী এই গোষ্ঠির হিন্দু নেতারা বিভিন্ন রাজা মহারাজা ও সোমনাথ কর্তৃপক্ষের কাছে আগাম প্রস্তুতির খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। ঈমান বিক্রেতা সেনাকর্মকর্তা হিন্দুদের জানিয়ে দিয়েছে, গযনী বাহিনী যখন ভাওয়ালপুর, অতিক্রম করে বিকানির ময়দানে পৌঁছবে তখন তাদের উপর রাতের অন্ধকারে যেনো গেরিলা আক্রমণ করা হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

কর্মকর্তা হিন্দুদের আরো পরামর্শ দিয়েছিলো, হিন্দুরা যেনো সবসময় গযনী সেনাদের হয়রানীর মধ্যে রাখে এবং উটগুলোকে মেরে ফেলতে বেশি করে তাঁর

ছুঁড়ে। গযনী বাহিনী আরো কিছুটা অগ্রসর হলে স্থানীয় অধিবাসীর পরিচয় দিয়ে সুলতানের কাছে অনুরোধ করবে, তারা গযনী বাহিনীকে সংক্ষিপ্ত পথে সোমনাথ নিয়ে যেতে সহযোগিতা করতে চায়। এটি ছিলো সুলতানকে বিভ্রান্ত করার ভয়াবহ চক্রান্ত যা ইতোপূর্বে হাভেলীর অভিযানে ঘটেছিলো।

সুলতান চক্রান্তকারীদের মুখ থেকে সকল চক্রান্তের কথা শুনে, তার স্থানীয় কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলেন, এই চক্রান্তের সাথে যারা জড়িত, তাদেরকে খোঁজে বের করে একটি ঘরে আমৃত্যু আটকে রাখবে। মৃত্যু হলে তাদের মরদেহগুলো বাইরে ফেলে দেবে। এগুলোকে সম্মানে দাফন করার প্রয়োজন নেই। এদেরকে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন এসব কাফেরেদের সাথেই উঠাবেন।

গাদ্দার কর্মকর্তা সম্পর্কে সুলতান নির্দেশ দিলেন, সেনবাহিনী সোমনাথ রওয়ানা হওয়ার সময় একে একটি শক্তিশালী ঘোড়র সাথে হাত পা বেঁধে রশিতে আটকে দেবে। হেঁচড়ে হেঁচড়ে বেঈমানটা যখন মরে যাবে তখন ফেলে দেবে।

ফরখী ছিলেন সুলতান মাহমূদের সময়ের রাজ কবি। এই কবি সুলতান মাহমূদের সোমনাথ অভিযানের সঙ্গী ছিলেন এবং গোটা অভিযান সম্পর্কে তিনি একটি দীর্ঘ কাব্য রচনা করেছিলেন। তার সেই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে সুলতান মাহমূদের কাছে যখন এই ভয়াবহ চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেলো তখন ছিলো রমযান মাস।

সেই রাতে তারাবিহ'র নামাযের পর দীর্ঘ সময় তিনি নফল ইবাদতে মগ্ন রইলেন। সকাল বেলা তার একান্ত সঙ্গীদের বললেন, আল্লাহ হয়তো আমার দ্বারা বড় কোন কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করাতে চান। এজন্যই তিনি রাতের অন্ধকারে আমাকে আলোর দিশা দেখিয়েছেন, নয়তো রাতের আঁধারে এই কেউটে সাপগুলো আমাকে ছোবল দিতো।

পরিস্থিতি ও পথ পর্যবেক্ষণকারী অগ্রবর্তী দল পোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এসে সুলতানকে জানালো– পথিমধ্যে সবচেয়ে বেশি সংকট তৈরি করবে পানি। দীর্ঘ পথের মধ্যে পানি খুবই দুষ্প্রাপ্য।

পানির সংকট মোকাবেলা করতে সুলতান মাহমূদ সোমনাথ রওয়ানা হওয়ার আগে ত্রিশ হাজার উট সংগ্রহ করে সবগুলোতে পানি বোঝাই করেছিলেন। কারণ পথিমধ্যে শুধু সেনাবাহিনী নয় মাল বহনকারী উট ও ঘোড়াগুলোকেও পানি পান করাতে হবে। এজন্য প্রত্যেক অশ্বারোহীর জন্যেই একটি করে পানি বোঝাই উট

বরাদ্ধ করা হয়েছিলো। পানি বোঝাই উট ছাড়াও প্রত্যেক সৈন্যের প্রতি নির্দেশ ছিলো, তারা প্রত্যেকেই যেনো যথাসাধ্য পানি নিয়ে নেয়।

সুলতান মাহমূদ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। কারণ, পথিমধ্যে হিন্দু রাজা মহারাজারা তার বাহিনীর ক্ষতিসাধন করবে এ খবরটি তিনি আগাম জানতে পেরে আগেই সতর্ক প্রস্তুতি নিতে পেরেছেন তিনি।

হিন্দুদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে সুলতান আরো বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে গতিপথ আগেই নির্ধারণ করে নিলেন এবং সেনাবাহিনীকে নতুন ভাবে বিন্যাস করলেন।

তিনি অগ্রবর্তী বাহিনীকেও বিভিন্ন অংশে ভাগ কর দিলেন। অগ্রবর্তী বাহিনীকে পাহারা দিয়ে নেয়ার জন্যে তাদের দু'পাশে নিয়োগ করলেন ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট। এরপর রাখলেন ঝটিকা বাহিনী। যারা থাকবে মূল বাহিনী ও অগ্রবর্তী বাহিনীর মাঝখানে। তবে তারা ডানে বামে মূল সেনাবাহিনী থেকে অনেক দূরে থাকবে। যাতে শত্রু বাহিনীকে মূল বাহিনীর ধারে কাছে আসার অনেক আগেই আটকে দেয়া যায়। রসদ ও পানিবাহী ইউনিটকে অগ্র পশ্চাত ডানে বামে শক্ত পাহারা দিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। রাতের বেলায় চলন্ত অবস্থায় বা যাত্রা বিরতিতে গোটা রাত ব্যাপী চতুর্দিকে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করা হলো।

গযনী বাহিনীর তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিলো। প্রথমত এই বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন স্বয়ং সুলতান মাহমূদ। যার সামরিক দূরদর্শিতা ছিলো বিশ্বখ্যাত। দ্বিতীয়তঃ গযনী বাহিনীর ঝটিকা ইউনিটের সদস্যরা ছিলো সত্যিকার অর্থেই জানবাজ এবং মেধাবী। তৃতীয়ত: প্রতিটি সৈনিক তাদের নেতার জন্যে নয়, ইসলামের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে যুদ্ধ করতো। তাদের সামরিক সাফল্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট ছিলো নিষ্ঠা। খুব দ্রুত এবং নিষ্ঠার সাথে প্রতিটি নির্দেশ পালিত হতো।

৪১৬ হিজরী সনের ১২ই শাওয়াল মোতাবেক ১০২৫ সালের ২৬ নভেম্বর। ঈদুল ফিতরের দু'দিন পর সুলতান মাহমূদ মুলতান থেকে সোমনাথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযে মূল খুতবার আগে সুলতান সকল সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, প্রিয় ভাইয়েরা! তোমাদের সবাইকে আমি ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মন থেকে তোমরা এ ভাবনা দূর করে দাও নিজ

মাতৃভূমি থেকে বহু দূরের এক দেশে আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করছি। যে যমীনে মুজাহিদদের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে সেই যমীন সকল মুসলমানের। যে যমীনে মুজাহিদের আযান ধ্বনিত হয়েছে সেই জায়গা মুসলমানের আপন ভূমি। এই হিন্দুস্তান কাফেরদের তালুক নয় এতে আমাদেরও অধিকার আছে। হয়তো বা এই ঈদ আমাদের কারো কারো জীবনের শেষ ঈদ। আমরা এমন এক অভিযানে যাচ্ছি যা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্যে অন্তিম পরীক্ষা। হিন্দুরা বলাবলি করছে, মুসলমানরা ধ্বংস হওয়ার জন্যই সোমনাথ যাচ্ছে। তোমাদেরকে এখন এমন এক মূর্তি ধ্বংস করতে হবে হিন্দুরা যেটিকে শক্তি দেবতা হিসেবে পূজা করে। তোমাদেরকে সেখানে প্রমাণ করতে হবে, শক্তির মালিক আল্লাহ! পাথরের মূর্তি কাঠামোগতভাবে শক্ত হতে পারে। কিন্তু এর নিজস্ব কোন শক্তি নেই। হিন্দুদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করতে হবে।

সুলতান মাহমূদ তার ভাষণে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলেন–বিন কাসিমের কথা। তিনি বললেন, মুহাম্মদ বিন কাসিম কতো দূর থেকে কতো কষ্টকর পথ পাড়ি দিয়ে হিন্দুস্তান এসেছিলেন। সুলতান বললেন, সোমনাথ মন্দিরে তোমাদের মতো মুসলমানদের ধরে এনে নর বলি দেয়া হয়। মুসলমান তরুণীদের অপহরণ করে সম্ভ্রম লুটে নেয় হিন্দু পণ্ডিতেরা। তাদেরকে সেখানে নগ্ন করে নাচতে বাধ্য করা হয়। মুসলিম তরুণীদের ধরে এনে হিন্দুরা সব ধরনের পাশবিকতার চর্চা করে। এসবের কথা শোনার পরও তোমাদের মনে কি স্বজাতির কন্যা জায়াদের সম্ভ্রম ও জীবন হানির এই পৈশাচিক আখড়া নির্মূল করতে কোন প্রকার দ্বিধা থাকবে? তোমাদের ঈমানী চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধ কি এসব কাণ্ডে সায় দেবে?

সুলতান-নাসিরও শেগুপ্তার ঘটনা সৈন্যদের শুনিয়ে বললেন, সেই নিরপরাধ কুমারী মেয়েটি হায়েনাদের আক্রমণ থেকে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাতে কূপে ঝাপ দিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। সেই মেয়েটির আত্মা আমাকে রাতে ঘুমাতে দেয় না। আমি এই নিরপরাধ মুসলিম তরণীর জীবনহানির প্রতিশোধ নিতে চাই।

সুলতান মাহমূদের বক্তৃতা এতোটাই আবেগঘন ও অনুপ্রেরণামূলক ছিলো যে, গোটা সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রতিশোধের আগুন ছড়িয়ে পড়লো, তাকবীরের পর তাকবীর ধবনিতে গোটা ময়দান কেঁপে উঠলো। সৈন্যদের উজ্জীবিত করাই ছিলো সুলতানের উদ্দেশ্য। তাতে তিনি সফল হলেন। পথের দুর্গমতা, কষ্ট ও সম্ভাব্য বাধা প্রতিবন্ধকতার কথা জানিয়ে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সোনাদের তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নিলেন।

* * *

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ তার সেনাদের এভাবে রওয়ানা করালেন যে, তার প্রথম সৈনিক থেকে সর্বশেষ সৈন্যের অবস্থানের দূরত্ব ছিলো প্রায় একশো মাইল। যখন তিনি মরু এলাকায় প্রবেশ করলেন তখন বুঝতে পারলেন, তিনি যাত্রাপথ সম্পর্কে এর আগে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করলেও তাকে যে ধারণা দেয়া হয়েছিলো বাস্তব অবস্থা এর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুলতান অনুভব করলেন, প্রকৃতপক্ষে তার লোকেরা যাত্রাপথের বিপদসংকুল অবস্থার কথা মোটেও বুঝে উঠতে পারেনি।

গযনী সেনারা যখন বিকানীর মরুভূমিতে পৌঁছলো, তখন রিজার্ভ সৈন্যদের পাহারা দেয়ার জন্যে ডানে বামে যে সৈন্যরা ছিলো, রাতের বেলায় তাদের উপর শত্রু সেনারা গেরিলা আক্রমণ চালালো। কিন্তু হিন্দুরা জানতো না গযনী বাহিনীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা আগে থেকেই নিয়ে রেখেছেন সুলতান মাহমূদ। বিভিন্ন দলে বিভক্ত গযনী বাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান ছিলো। কোন এক ফাঁকে বিশাল এলাকা নিয়ে অগ্রসরমান গযনী বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়লো শত্রু বাহিনী এবং তারা উট ইউনিটে আক্রমণের প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু এর আগেই এদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললো সুলতানের অশ্বারোহী বাহিনীর নিরাপত্তা দল। সকল শত্রু সেনাকে হামলার আগেই হত্যা করলো গযনীর ঝটিকা বাহিনী।

গযনী বাহিনী যখন পাহাড় ও ঘন টিলাময় এলাকায় পৌঁছলো তখন দিনের বেলায় হিন্দুদের তীরন্দাজ বাহিনীর তীব্র আক্রমণের শিকার হলো। হিন্দুরা টিলার আড়াল থেকে একযোগে তীরবৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলো। তাতে গযনী বাহিনীর বেশ কিছু সওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

উটের গায়ে তীরবিদ্ধ হলে উটগুলো নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে এলোপাথাড়ী দৌড়াতে লাগলো। হিন্দুরা মনে করছিলো, তাদের পেছন থেকে আক্রমণের আশংকা নেই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে হিন্দুরা পিছন দিক থেকে আক্রমণের শিকার হলো। সংঘর্ষে কিছু হিন্দু মারা গেলো আর কিছু ধরা পড়লো। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সুলতান জেনে নিলেন, পথিমধ্যে আর কোন কোন জায়গায় হিন্দুরা ফাঁদ পেতে রেখেছে? এদের কথামতো তিনি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

তৎকালীন ঐতিহাসিকদের ধারণা মতে, সুলতান মাহমূদকে তখন অন্তত পাঁচশ মাইল মরু এলাকা পাড়ি দিতে হয়েছিলো এর মধ্যে কয়েকটি ছোট বড় নদীও ছিলো। দীর্ঘ মরু এলাকার কোথাও সবুজের কোন চিহ্ন ছিলো না। ঘোড়াগুলোকে সচল রাখতে দানাদার শুকনো খাবার ও শুকনো ঘাস খাওয়াতে

হতো। ফলে ঘোড়াগুলোর জন্যে অনেক বেশি পানির প্রয়োজন হতো। আর মরুভূমির তপ্ত হাওয়ায় অল্পতেই ঘোড়া তৃষ্ণার্ত হয়ে দুর্বল হয়ে যেতো। কিন্তু উটের কোন সমস্যা হতো না। বেশি সমস্যা হচ্ছিল পদাতিক বাহিনীর। তারা এগুতে পারতো না। বালুতে পা দেবে যেতো। মরুভূমি অতিক্রমের পর সর্বপ্রথম লুধোরাওয়া শহরে গযনী বাহিনীকে শত্রু বাহিনীর মুখোমুখি হতে হলো। হিন্দুরা পূর্বেই খবর পাওয়ায় তারা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলো। মরু পাড়ের এই শহর ছিলো বিশাল এবং বারো ফটক বিশিষ্ট। সুলতান শহর অবরোধ করে এমন তীব্র আক্রমণ চালালেন যে, শহরের লোকেরা ঘাবড়ে গেল। বশ্যতা স্বীকার করে সাদা পতাকা উড়িয়ে শহরের দরজা খুলে দিল।

সুলতান বিজিত শহর থেকে তার প্রয়োজনীয় পানি ও অন্যান্য রসদের ঘাটতি পূরণ করে নিয়ে আবার সোমনাথের দিকে রওয়ানা হলেন। অবশ্য মরু এলাকায় বেশ কয়েকটি জায়গায় গযনী বাহিনী শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে সবগুলোতেই শত্রুবাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে পরাজিত হয়েছে। অবশ্য গযনী বাহিনীরও অল্পবিস্তর ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে।

দীর্ঘ একমাসে মরু এলাকা অতিক্রম করে ডিসেম্বরের শেষ দিকে গযনী বাহিনী পাটনা এলাকায় পৌঁছলো। এখানে প্রায় বিশ হাজার হিন্দু বাহিনী গযনী বাহিনীর পথ রোধ করে দাঁড়াল। হিন্দুরা গযনী বাহিনীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানতো, তাই তাদের পুণ্য ভূমিকে বাঁচানোর জন্যে তারা জীবনবাজি রেখে লড়াই করলো। কিন্তু অবশেষে হিন্দুদেরই পতন ঘটলো।

এরপর বর্তমানে যে এলাকাটি আহমদাবাদ নামে পরিচিত সুলতান মাহমূদ সেখানে পৌঁছলেন। সুলতানকে তার অগ্রবর্তী দল ও গোয়েন্দারা খবর দিলো— পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, সোমনাথের রাজার পক্ষে চতুর্দিক থেকে সাহায্যকারী দল আসছে। ফলে সোমনাথ পৌঁছানোর ব্যাপারটি সহজ হবে না।

গযনীর সৈন্যদের অবস্থা তখন খুবই করুণ। দীর্ঘ মরুভূমির কষ্টকর যাত্রাপথেও বার বার তাদের শত্রু বাহিনীর মোকাবেলা করতে হয়েছে। যাত্রাপথের প্রতিটি মুহূর্তেই তাদেরকে থাকতে হয়েছে সতর্ক। কষ্টকর দীর্ঘ পথ বিরামহীনভাবে কম খেয়ে কম ঘুমিয়ে অতিক্রম করায় গযনীর সৈন্যরা ভীষণ ক্লান্ত-অবসন্ন। কারো শরীরই যেনো আর চলতে চায় না। অপর দিকে হিন্দু সৈন্যরা তাজাদম। সতেজ উজ্জীবিত। তারা তাদের ধর্মও স্বাধীনতা রক্ষায় মরণত্যাগী। এ এলাকার মাটি মানুষ সবই তাদের সহযোগী। আর গযনী

বাহিনীর জন্যে এখানকার মাটি মানুষ পরিবেশ পরিস্থিতি সবই বৈরী। তাছাড়া তারা জানে না কোথায় কি আছে?

অবস্থার ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে সুলতান মাহমূদও তার ইতিহাসখ্যাত প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ আলতাঈ ছিলেন দারুন উৎকণ্ঠিত। তাদের শরীর জানান দিচ্ছিল কাজটি ঠিক হয়নি। আর যে পারা যাচ্ছে না। তারা নিজেরাও তো যোদ্ধা। অন্যান্য যোদ্ধাদের অবস্থা কি তা তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন। ফলে তাদের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। ঐতিহাসিক ফরখী কাব্য করে তখনকার অবস্থা বলেছিলেন– গযনীর বিখ্যাত বীর বাহাদুর সৈন্যটিও তখন নিজের দুরবস্থা চেপে রাখতে অন্যকে উজ্জীবিত,ও সাহস যোগাচ্ছিল, আর একে অন্যকে সাহায্য করছিলো। দৃশ্যত তাদের শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলো কিন্তু লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তারা ছিলো বিদ্যুতের মতো গতিময় আর বাঘের মতো ক্ষিপ্র।

সুলতান যখন জানতে পারলেন হিন্দুস্তানের বিভিন্ন এলাকা থেকে সোমনাথ রাজার সাহায্যে সামরিক সাহায্য আসতে শুরু করেছে, তখন তিনি সাহায্য আসার সম্ভাব্য পথগুলো আটকে দিয়ে সৈন্যদেরকে সোমনাথের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। অবশ্য মরুভূমি পেরিয়ে আসার কারণে অশ্বারোহীরা কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলো। সময়টা তখন ছিলো শীতকাল।

* * *

১০২৬ সালের ৬ জানুয়ারি মোতাবেক ৪১৬ হিজরী সনের ৪ যিলকদ সুলতান মাহমূদ সোমনাথের নিকটবর্তী এলাকায় পৌঁছেন। সেখান থেকেই তাকে সোমনাথ অবরোধের প্রস্তুতি নিতে হলো। কিন্তু হিন্দুরা তাকে সোমনাথ অবরোধের সুযোগ না দিয়ে অবরোধ আরোপের আগেই প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর ছিলো। সুলতান মাহমূদ যথাসম্ভব নিজে এবং গোয়েন্দাদের সাহায্যে সার্বিক পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করলেন। সোমনাথ ছিলো বিশাল এক দুর্গ-বন্দী শহর। সোমনাথের তিন দিক বেষ্টন করে রেখেছিল সাগর। আর স্থলভাগের দিকে খনন করা ছিলো গভীর প্রতিরক্ষা খাল।

সুলতান খবর পেলেন, ইতোমধ্যে সোমনাথ রক্ষার জন্যে সোমনাথের বাইরের দুই হিন্দু রাজার সৈন্যরা এসে দুর্গের বাইরে যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান নিয়েছে। দুর্গের ভেতরে সৈন্যরা ছাড়াও সাধারণ লোকেরাও তীর, ধনুক ও বর্শা নিয়ে দুর্গ প্রাচীরের উপরে অবস্থান নিয়েছে।

শহরের অধিবাসীরা গযনীর সৈন্যদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। শহরে হিন্দু পুরোহিত ও পণ্ডিতেরা প্রচার করলো, গযনীর সুলতান অন্যান্য হিন্দু রাজা-মহারাজাদের পরাস্ত করতে পেরেছে তাদের প্রতি শিবদেব অসন্তোষ ছিলো বলে। এখন শিবদেব মুসলমানদেরকে টেনে হেঁচড়ে তার কোলে নিয়ে এসেছেন। তিনি এখন মূর্তিসংহারীদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। সোমনাথ দুর্গ অবরোধকালে গযনীর সেনাদের উদ্দেশ্যে প্রাচীরের উপর থেকে শহরের লোকেরা বলছিলো, গযনীর পাপীরা! তোমরা মরতে এসেছো! সোমনাথ তোমাদের পাপের প্রতিশোধ নেবে।

বিরামহীন ভাবে মন্দিরের ঘণ্টা বাজছিল। দশ হাজার পণ্ডিত পালাক্রমে পূজায় লিপ্ত ছিলো। সুন্দরী যুবতী সেবাদাসীরা ভজন গাইছিল এবং নর্তকীরা উদ্দাম নৃত্যে মেতে উঠেছিল। শহরের সব মহিলা জড়ো হয়েছিলো মন্দিরে। সোমনাথের রাজা রায় কুমার কখনো দুর্গ প্রাচীরে আবার কখনো রাস্তায় নেমে শহরবাসীকে প্রতিরোধ যুদ্ধে উজ্জীবিত করছিলো। সোমনাথের নিকটবর্তী রাজ্যের রাজা পরমদেব তার সকল সৈন্য সামন্ত নিয়ে সোমনাথ রক্ষার জন্যে অনেক আগেই সেখানে এসেছিল।

হিন্দুদের উত্তেজনা, উৎসাহ ও উজ্জীবিত শক্তি দেখে সুলতান মাহমূদ গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি অনুভব করলেন, নিজেকে এবং গোটা গযনী বাহিনীকে তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে ফেলেছেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি যথা সম্ভব দ্রুত দুর্গ জয়ের পরিকল্পনা করতে লাগলেন।

তিনি প্রধান সেনাপতিকে বললেন, আবু আব্দুল্লাহ! আগামীকাল জুমআর দিন। আমি সকাল বেলায়ই আক্রমণ শুরু করতে চাই। সেনারা যাতে প্রস্তুত থাকে। তিনি আক্রমণের পরিকল্পনা সবিস্তারে প্রধান সেনাপতিকে বুঝিয়ে দিলেন। আলতাঈও চিন্তাগ্রস্ত। তার চেহারাই বলে দিচ্ছিলো, পরিস্থিতি মোটেও তাদের অনুকূলে নয়।

তারকার পতন ধ্বনি

আজ থেকে প্রায় এগারো'শ বছর আগে তৌহিদী মুসলিম ও পৌত্তলিকতাবাদী মূর্তিপূজারীদের মুখোমুখি সংঘর্ষে সোমনাথ দুর্গের প্রাচীরগুলো কাঁপছিলো। দুর্গের ভেতরে ছিলো হরি-হরিদেবের পূজারীদের ঔদ্ধত্য হুংকার। আর দুর্গের বাইরে ছিলো তৌহিদের জন্য আত্মনিবেদিত গযনী যোদ্ধাদের তাকবীর ধবনি। অবস্থা এতোটাই উত্তেজনাপূর্ণ ছিলো যে, গোটা হিন্দুস্তানই যেন পৌত্তলিকদের জয়ধ্বনি আর তৌহিদের তাকবীর ধ্বনীতে কেঁপে ওঠছিলো। সেদিন সন্ধ্যার পর সুলতান মাহমূদ তার সকল সেনাপতি ও কমান্ডারদের জড়ো করলেন। তিনি সবার চেহারার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন–

তোমাদের চেহারা দেখে আমি যা অনুভব করছি এবং তোমরা যা ভাবছো, সম্ভবত আমার ভাবনাও তোমাদের চেয়ে ভিন্ন নয়। তোমরা কি বলতে পারো কেন আমাদের সবার কাছে মনে হচ্ছে, এই যুদ্ধই আমাদের জীবনের শেষ যুদ্ধ? কারণ হলো, এর আগে আমরা যেসব দুর্গ ও রাজ্য জয় করেছি, তাতে প্রতিপক্ষ ছিলো বিভিন্ন রাজা ও মহারাজারা।

কিন্তু সোমনাথ সেসব রাজা মহারাজাদের কোন রাজ্য বা দুর্গ নয়। এখানে হবে একটি ধর্মের সাথে আরেকটি ধর্মের মোকাবেলা। এখানে তোমরা একটি বাতিল ধর্মমতকে পরাজিত করে সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করতে এসেছো। হিন্দু ধর্ম আমাদের দৃষ্টিতে বাতিল হলেও সেই ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্ম রক্ষায় জীবন বিলিয়ে দিতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করে না। সোমনাথ সারা ভারতের হিন্দুদের জন্যে কা'বার মতো। তোমরা দেখতে পাচ্ছো হিন্দুরা খুবই উজ্জীবিত ও উত্তেজিত। তারা সোমনাথ রক্ষায় জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

আমাদের সমস্যা হচ্ছে এখানকার শহরের ভেতরের কোন খবর আমাদের গোয়েন্দাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। দুর্গের ভেতরের কোন খবরই আমরা জানি না। আল্লাহর দয়ায় আমরা যদি দুর্গে প্রবেশ করতে পারি তখনো আমরা বলতে পারবো না দুর্গের কোথায় কি রয়েছে? আমাদের কেউ বলার নেই, ভেতরে কোন দিক থেকে আমাদের উপর আক্রমণ আসতে পারে? কোন দিক নিরাপদ? আর কোন জায়গা বেশি ঝুকিপূর্ণ? বাইরের কিছু খবর এবং তথ্য আমরা পেতে পারি এবং পাচ্ছি। এরই মধ্যে দুই মহারাজা তাদের সৈন্য সামন্ত নিয়ে

সোমনাথের রাজাকে সাহায্য করতে আসছে। এরা পেছন থেকে আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। আমাদের সেনাদের বিন্যাস সম্পর্কে আমি আগেই তোমাদের অবহিত করেছি। এবার আমি অন্যান্য ঝুঁকি ও আশংকা সম্পর্কে তোমাদের সৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তোমরা অনভিজ্ঞ ও আনাড়ী নও। তোমরা নিশ্চয় জানো, নিজ দেশ থেকে এতোটা দূরে এসে যুদ্ধে আগ্রহী যেকোন বাহিনীকে প্রতিপক্ষ ইচ্ছা করলে অনাহারেই পরাস্ত করতে পারে। এখানকার মাটি, মানুষ সবকিছুই আমাদের বৈরী। এখানে কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা কিংবা রসদ পাওয়ার সম্ভাবনা আমাদের নেই। যে তীরটা আমাদের কামান থেকে একবার বেরিয়ে যাবে, সেটির ঘাটতি পূরণের আর কোন ব্যবস্থা আমাদের নেই....।

এই সংঘর্ষ ও যুদ্ধ যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে রসদ ও জনবলের ঘাটতিতে পড়ে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হবো। আমি তোমাদের সতর্ক করে দিতে চাই, ব্যর্থ হয়ে যদি আমাদের পিছু হটতে হয় তাহলে আমাদের সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেলবে আর শত্রু বাহিনী আমাদের পিছপা হতে দেবে না। পিছু হটলে আমাদের কারো পক্ষেই জীবন নিয়ে গযনী পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

পেরিয়ে আসা মরুভূমির কথা তোমরা ভুলে যেও না। প্রায় দুই মাস লেগেছে আমাদের এই দূরত্ব অতিক্রম করতে। তাই ব্যর্থ হয়ে পিছু হটা সৈন্যদের পক্ষে এই বিশাল মরু পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে না।

আমি জানি, তোমরা অনেকেই ভাবছো, গযনী থেকে এতোটা দূরে এসে এই দুর্গম শহরে যুদ্ধে নামা আমাদের উচিত হয়নি। এ ব্যাপারে আমি তোমাদের সাথে একমত। কিন্তু আশা করি আমার মতের সাথেও তোমরা একমত হবে। দীর্ঘ দিনের সাফল্য ও জীবনহানির পরও এই অভিযান ছাড়া আমাদের মিশন অসম্পূর্ণ থাকত। আমাদের কারো জীবনই তো আর সীমাহীন নয়? তোমরা জানো, আমি পৌত্তলিকতার এই বেদীমূলকে ভেঙে সাগরে নিক্ষেপ করতে চাই।

ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন সুলতান! আমি কি জানতে পারি, আমরা গোটা হিন্দুস্তানের সব মূর্তি কি ধ্বংস করে দিয়েছি যে, শুধু সোমনাথের মূর্তি রয়ে গেছে? এটাকে ভেঙে ফেললেই সব মূর্তি শেষ হয়ে যাবে? প্রশ্ন তুললো এক ডেপুটি সেনাপতি।

সোমনাথের মূর্তি ভেঙে ফেললে এবং সোমনাথ ধ্বংস করে দিলে কি হিন্দুদের মূর্তিপূজা শেষ হয়ে যাবে? হিন্দুস্তানের সকল হিন্দু কি মুসলমান হয়ে যাবে? এত দূরে আসার ঝুঁকি আমাদের নেয়া উচিত হয়নি সুলতান!

ডেপুটি সেনাপতির জবাবে প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ গর্জে উঠলেন। তিনি বললেন– আশা করি ডেপুটি সেনাপতি শত্রুদের ভয়ে ভীত হয়ে এসব কথা উত্থাপন করেননি।

সম্মানিত সেনাপতি! আমরা শত্রুদের সংখ্যা দেখে মোটেও ভীত নই। তারেক বিন যিয়াদ সম্পূর্ণ অজানা দেশে পাড়ি দিয়ে পিছু হটার সকল পথ বন্ধ করে দিতে সকল জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের কেউ শত্রুদের ভয়ে পিছু হটার চিন্তা করে বলে মনে হয় না।

আমি আমার হিন্দুস্তান অভিযানের শেষ পর্যায়ে এসে মাত্র কিছুদিন আগে জানতে পারি, সোমনাথের মূর্তিকে ভারতের হিন্দুরা সকল দেবদেবীর নেতা বলে বিশ্বাস করে– বললেন সুলতান। আমি যদি ভারত অভিযানের শুরুতে সোমনাথের এই অবস্থার কথা জানতে পারতাম তাহলে আমার অভিযান সোমনাথ থেকেই শুরু হতো।

এ পর্যায়ে সুলতান মাহমূদ সোমনাথের অভ্যন্তরে কি কি অপকর্ম ঘটে এবং সোমনাথের হিন্দুরা সোমনাথকে কেমন পবিত্র স্থান মনে করে তা সবিস্তারে কমান্ডারদের জানালেন।

অবশেষে তিনি জানালেন, আমরা আজ এমন জায়গায় পৌঁছে গেছি, যেখান থেকে পিছু হটা সম্ভব নয়। আমরা যদি আমাদের উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব ভুলে যাই, তাহলে আমাদের লড়তে হবে জীবন বাঁচানোর জন্য। তোমরা লড়াইয়ে অভ্যস্ত এবং অভিজ্ঞ। তোমরা জানো, যে সৈনিক জীবনের জন্যে লড়াই করে সে এগিয়ে যাওয়ার দিকে দেখে না, তার নজর থাকে পেছনের দিকে। আর স্বাভাবিক ভাবেই এমন যোদ্ধারা কখনো জীবন বাঁচাতে পারে না।

আমরা সোমনাথকে ধ্বংস করে এটা প্রমাণ করতে চাই, সত্যের পতাকাবাহী, রসূলে আরাবী স.-এর পয়গামবাহী সৈনিকদের জন্যে কোন যুদ্ধক্ষেত্রই অনতিক্রম্য নয় এবং আল্লাহর পথের সৈনিকদের পথে কোন দুর্গমতাই বাধা হয়ে উঠতে পারে না। যেকোন বাধা তারা নিমিষেই জয় করে নেয়। হতে পারে আমার পর কোন মাহমূদ আমাদের প্রজ্জলিত আলো গোটা হিন্দুস্তানে

ছড়িয়ে দেবে। আর যদি এমনটি সম্ভব না হয়, তাহলে হিন্দুস্তানে মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে সংঘাত লেগেই থাকবে, আর হিন্দুরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের আক্রমণের প্রতিশোধ নেবে এখানকার মুসলমানদের হত্যা করে।

আগামীকাল জুমআর দিন। আমি আশা করবো, আগামীকালের সূর্য উঠার আগেই অবরোধের কাজ সমাপ্ত হবে। তোমরা জানো, যথার্থ অর্থে এখানে অবরোধ আরোপ সম্ভব নয়। কারণ, সোমনাথের তিন দিকেই সমুদ্র, মাত্র একদিকে স্থল। এই স্থলভাগেও রয়েছে গভীর পরিখা। আমাদেরকে দুর্গে আঘাত করতে হবে। তাই আমাদেরকে পরিখা পেরিয়ে যেতে হবে। অবশ্য তা আমরা করতে পারবো ইনশা আল্লাহ। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে তীরন্দাজদের। দুর্গপ্রাচীর ও বুরুজের উপর যেসব হিন্দু রয়েছে তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। দুর্গ প্রাচীরের উপরে উঠার জন্য সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। অবশ্য আমি জানি, আমাদের এসব আয়োজন অনেকটাই আত্মহননের মতোই মনে হবে; কিন্তু এই দুর্গবন্দী শহর জয় করার জন্যে এছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই।

১০২৬ সনের ৬ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার পেরিয়ে পর দিন শুক্রবার রাত। এ রাতে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম করেননি সুলতান মাহমূদ। রাতভর তিনি সৈন্যদের কার্যক্রম তদারকি করলেন। সৈন্যরাও রাতের মধ্যেই নিজ নিজ অবস্থানে ঠাঁই নেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিলো।

সুলতান মাহমূদ বারবার সৈন্য ও কমান্ডারদের মনে করিয়ে দিলেন, হিন্দুরা তাদের বিজয়ের জন্যে সুন্দর যুবতী মেয়েদের ব্যবহার করতে পারে। সাবধান! সবাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

* * *

যে সময় সুলতান মাহমূদ তার কমান্ডারদের দিক-নির্দেশনা ও উজ্জীবিত করছিলেন, তখন সোমনাথ দুর্গের ভেতরে শিব মূর্তির সামনে দশ হাজার হিন্দু পুরোহিত নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়ে পূজা করছিলো। এরা মাথা শিবদেবের পায়ে ঠেকিয়ে আর্তনাদ করছিলো। আর মন্দিরের উন্মুক্ত ময়দানে হাজারো যুবতী, নর্তকী নগ্ন বা অর্ধ নগ্ন হয়ে উন্মাতাল নৃত্য করছিলো। নাচতে নাচতে একদল ক্লান্ত হয়ে গেলে এদের জায়গা অন্যেরা দখল করে নিচ্ছিলো। শহরের নারী পুরুষ সবাই শিব মূর্তির বেদীতে মাথা ঠেকিয়ে মুসলমানদের প্রতি শিবদেবের ক্ষোভকে

উস্কে দেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিলো। তাদের বিশ্বাস ছিলো, তাদের শিবদেব একবার ক্ষুব্ধ হয়ে গেলে গযনী বাহিনীকে নিমিষেই ধ্বংস করে ফেলবে।

হিন্দুদের এই আর্তনাদের মধ্যে কোন ধরনের আতঙ্ক ও ভীতির ছাপ ছিলো না। তাদের মধ্যে বিরাজ করছিল চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনা। আবেগ, উত্তেজনা ও ক্ষোভে প্রায় পাগল হয়ে পড়ে ছিলো হিন্দু জনতা। সবাই শিব মূর্তির পায়ে মাথা রেখে পণ করেছিলো মুসলিম সৈন্যদের ধ্বংস করে দিতে। তারা এতোটাই পাগল প্রায় হয়ে পড়েছিলো যে, ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ছিলো। তাদের ক্ষোভ এতোটাই আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছিলো যে, দেখে মনে হচ্ছিলো, কোন মুসলমান পেলে তারা জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।

হিন্দু পুরোহিতরা জনতাকে এই বিশ্বাস দিয়েছিলো, তাদের শিবদেব মুসলমানদেরকে টেনে এখানে নিয়ে এসেছে। এবার মুসলমানদের ধ্বংস অনিবার্য।

হিন্দুদের মধ্যে এমনই উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিলো যে, এক নর্তকী নাচের আসর থেকে দৌড়ে এসে শিবমূর্তির সামনে দাঁড়ালো। তার হাতে ছিলো ছুরি। সে উন্মাদ কণ্ঠে ঘোষণা করলো, আমি শিবদেবের চরণে আমার হৃদয় নজরানা দিচ্ছি। সে এমনিতেই স্বল্পবসনা ছিলো, এবার এক টানে পরনের রেশমী কাপড়টি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গেলো। নর্তকীর এ অবস্থা দেখে মন্দিরের সকল পূজা অর্চনা মুহূর্তের মধ্যেই থেমে গেলো।

নর্তকী হাতের ছুরিটি হঠাৎ তার বাম পাঁজরের নীচে সজোরে দাবিয়ে দিয়ে ডানে টান দিলো, মুহূর্তের মধ্যে তার পেট ফেঁড়ে গেলো এবং রক্তে নীচের দেহ ভেসে গেলো। কিন্তু কেউ তাকে বাধা দিলো না এবং মেয়েটিও পড়লো না। সে তার দু'হাত কাটা পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বললো– কোথায় আমার হৃদয়? আমার হৃদয় তোমরা দেখিয়ে দাও।

এক পুরোহিত দৌড়ে নর্তকীর কাছে পৌছলো। আর তখন নর্তকীর মাথা পুরোহিতের গায়ে ঢলে পড়লো। পুরোহিত নর্তকীর কাটা পেট ধরে তার মাথা নিজের কাঁধে নিয়ে নিলো। নর্তকীর হাত থেকে পড়ে যাওয়া ছুরিটি অন্য এক পুরোহিত নিজ হাতে নিয়ে নর্তকীর হৃদযন্ত্র কেটে হাত উপড়ে তুলে সমবেত জনতাকে দেখালো। পুরোহিত নর্তকীর হৃদপিণ্ডটি মূর্তির বুকে স্পর্শ করে শিবমূর্তির পায়ের কাছে রেখে ঘোষণা করলো, কেউ মনে করো না, সে সামান্য

নর্তকী ছিলো। নর্তকী হলেও তাকে শিবদেব কবুল করেছেন। সে মরেনি, তাকে শিবদেব পূনর্জন্ম দেবেন।

অন্য এক পুরোহিত নর্তকীর মরদেহ তুলে নিয়ে মন্দিরের একটি গোপন কক্ষে রেখে দিলো। আরেক নর্তকী পর মুহূর্তেই দৌড়ে মন্দিরের মূল বেদীতে এসে দাঁড়িয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ফেললো। পুরোহিত তখনো ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলো। নর্তকী এক ঝটকায় পুরোহিতের হাত থেকে ছুরিটি ছিনিয়ে নিয়ে আগের নর্তকীর মতোই এক টানে পেট চিরে পুরোহিতের কাছে আবেদন করলো, তার হৃদপিণ্ডও যেন শিবদেবের পায়ে রেখে দেয়া হয়। এই বলে নর্তকী ঢলে পড়ে ছটফট করতে লাগলো। এই অবস্থাতেই পুরোহিত নর্তকীর হৃদপিণ্ড কেটে শিবমূর্তির পায়ের কাছে রেখে দিল।

দুই নর্তকীর আত্মহুতির পর অন্য নর্তকীরা যে উত্তাল নাচ শুরু করলো, সেই নাচের মধ্যে নাচের তাল, লয়, মাত্রা ঠিক থাকলেও তা ছিল উন্মাদনা। দেখে মনে হচ্ছিল এটাই হবে এদের জীবনের শেষ নাচ। মনে হচ্ছিল নর্তকীদের মধ্যে জিন ভর করেছে। নয়তো কোন মানুষ এতো দীর্ঘ সময় এমন উত্তাল নাচে লিপ্ত থাকতে পারে না। অবশ্য এই নাচের আসরে নাচতে নাচতে কতোজন নর্তকী শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিলো সেই পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। কিন্তু অনেকেই যে নিজেদেরকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছিলো তা নিশ্চিত।

একদিকে মন্দিরের উন্মুক্ত মঞ্চে ছিলো নর্তকীদের উন্মাত্তাল নাচ, বাদকদলের বিরামহীন বাজনা, অবিরাম মন্দিরের ঘণ্টার আর্তনাদ, অপরদিকে মন্দিরের মূলবেদীতে মূর্তির সামনে ছিলো দশ হাজার পুরোহিতের সমবেত ভজন। বস্তুত সব মিলিয়ে সোমনাথের সেই রাতটিকে ভক্ত পূজারী, পুরোহিত, সৈন্য আর শহরের অধিবাসীরা এক ভয়ঙ্কর কালো রাতে রূপান্তরিত করেছিলো।

মুহূর্তের মধ্যে গোটা শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো, দুই নর্তকী নিজ হাতে পেট চিরে তাদের হৃদপিণ্ড শিবদেবের পায়ে নজরানা দিয়েছে। শোনামাত্র গোটা শহরের নারীরা মন্দিরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো এবং ঘাতিনী দুই নর্তকীর দেহ থেকে ঝড়ে পড়া রক্ত আঙুলে নিয়ে নিজেদের কপালে তিলক দেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো।

সোমনাথ শহরের পুরুষেরা যখন তাদের স্ত্রী কন্যা-মাতাদের কপালে রক্তের তিলক দেখলো তখন তাদের উন্মাদনা ও ক্ষোভ আরো উস্কে উঠলো। যুদ্ধের খবর

সরকারি নির্দেশেই সারা শহরে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল। বারবার প্রচার করা হচ্ছিল, মুসলমানদেরকে শিবদেব নিশ্চিহ্ন করা জন্য এখানে টেনে নিয়ে এসেছেন। ভারত মাতার বুকে কোন ম্লেচ বেঁচে থাকতে পারবে না। শিবদেবের পূজারীগণ! ম্লেচদের টুকরো টুকরো করে সাগরে ভাসিয়ে দাও। খবরদার! হুশিয়ার! লড়াই করে যারা মারা যাবে, শিবদেব তাদের পুনর্জন্ম দেবেন।

* * *

উপমহাদেশে ইংরেজ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার পর এখানকার স্কুল কলেজ ও পাঠশালায় ইংরেজদের অনুমোদিত হিন্দুদের লেখা মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ ইতিহাস পাঠ্য করা হয়। সেসব ইতিহাসে বলা হয়, সুলতান মাহমূদ সতেরো বার হিন্দুস্তানে অভিযান চালিয়ে ছিলেন এবং তার সর্বশেষ অভিযান ছিলো সোমনাথ। সোমনাথ মন্দিরের বড় বড় মূর্তিগুলো ছিলো ভেতরে ফাঁপা এবং ফাঁপা জায়গাগুলো বহু মূল্যবান হিরে জহরত ও মণিমুক্তায় ঠাসা ছিলো। সুলতান মাহমূদ বহু মূল্যবান মণিমুক্তা ও হিরে জহরতের জন্যেই সোমনাথ আক্রমণ করেছিলেন।

বস্তুত ইংরেজ ও হিন্দুরা সুলতান মাহমূদের ঈমানী চেতনা, দ্বীনের দাওয়াত ও জুলুমের অবসান ঘটিয়ে ভারতের অগণিত মানুষকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মর্যাদা ও সম্মানপূর্ণ জীবন উপহার দেয়ার, হিন্দু কুচক্রীদের মুসলিম বিদ্বেষ ও প্রজাপীড়ন উৎখাত, জুলুম অত্যাচার এবং সাধারণ মানুষকে পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে বাঁচানো এবং শাসকদের গোলামীর উৎসভূমি মন্দিরগুলোকে ধ্বংস করার জন্যে বারবার তিনি হিন্দুস্তানে এসেছিলেন, ধনরত্ন লুটতরাজের জন্য নয়। কারণ এসব মন্দিরের পুরোহিত ও পণ্ডিতেরাই ছিল পৌত্তলিকতার উৎস এবং প্রজাপীড়নের নিকৃষ্ট হাতিয়ার।

ইংরেজ ও হিন্দুরা মুসলিম বীরপুরুষদের বীরত্ব, আদর্শ ও গৌরব গাঁথাকে ম্লান করার জন্যে মুসলিম শাসক ও বীরপুরুষদের চরিত্রে নানাভাবে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা করেছে। ইংরেজ ও হিন্দুরা আজো মুসলমানদের তৌহিদী চেতনা ও পৌত্তলিকতা বিরোধী ঈমানী শক্তিকে ভয় করে।

এদেশে ইংরেজরা আসার সাথে সাথে হিন্দুরা তাদের কর্তৃত্বকে মানসিকভাবে মেনে নেয়, অপরদিকে মুসলমানদের তুলনায় ইংরেজরা

হিন্দুদেরকেই বেশী সহায়ক মনে করে। আর মুসলমানদেরকে বৈরী শক্তি বলেই বিশ্বাস করতো। একারণেই হিন্দু ও ইংরেজরা মিলে সর্বশক্তি দিয়ে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের কৃষ্টিকালচার, ঐতিহ্য, ইতিহাস, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুতেই নিষ্ঠুর হাতে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং বিকৃতি সাধনে লিপ্ত হয়।

সুলতান মাহমূদের সময়কার মুসলিম ইতিহাসবিদগণ বিশেষ করে আলবিরুনী, ফারিশ্তা প্রমুখ যে ইতিহাস লিখেছেন, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, তখনকার পরিবেশ, পরিস্থিতি, গযনী থেকে হিন্দুস্তানের দূরত্ব ও পথের দুর্গমতা বিচার করলে কোন অর্থ লোভী, যুদ্ধবাজ লড়াকুর পক্ষে কোন অবস্থাতেই এমন দুরূহ অভিযানে বের হওয়ার কথা নয়। কারণ সার্বিক পরিস্থিতি বিচার করলে গযনী থেকে সোমনাথে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত কোন বিবেকবান সেনানায়কের নেয়ার কথা নয়। এমন অভিযানে বের হতে পারে সেই যে হয়তো মানসিক ভাবে বিকারগ্রস্ত, উন্মাদ, বাস্তবজ্ঞানহীন অথবা অব্যাহত বিজয়ে আত্মহারা কোন আগ্রাসী শাসক, নয়তো সমরবিদ্যায় অতুলনীয় যোগ্যতার অধিকারী কোন দূরদর্শী জেনারেল।

সমর বিশেষজ্ঞরা সুলতান মাহমূদের সোমনাথ অভিযানকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের রুশ অভিযানের সাথে তুলনা করেন। অতি মাত্রায় আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে নেপোলিয়ন রাশিয়া গিয়ে ফাঁদে আটকে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন। সুলতান মাহমূদও দৃশ্যত সোমনাথ অভিযানে নিশ্চিত পরাজয় এবং সৈন্যদেরকে আত্মহুতির দিকেই ঠেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার অস্বাভাবিক দূরদর্শিতা, আদর্শিক দৃঢ়তা এবং সত্যিকারের বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্বের কারণে সেদিন গযনী বাহিনীকে নিশ্চিত নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে বিজয়ীর আসনে সমাসীন করেছিলেন কিংবদন্তী সুলতান মাহমুদ।

সুলতান মাহমূদ সোমনাথের ঐতিহাসিক মূর্তিকে ধ্বংস করে হিন্দুদের মিথ্যা চন্দ্রদেবতার কাহিনীকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করে তাওহীদের বাণী উচ্চকিত করা জন্যেই এই ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে বেরিয়েছিলেন।

মূলত সোমনাথের যুদ্ধ ছিল হিন্দুবাদ ও তাওহীদের মধ্যকার একটি চূড়ান্ত লড়াই। দুইটি জাতির আদর্শিক লড়াই। আদর্শিক লড়াই না হলে উভয় পক্ষ বিজয়ের জন্যে এভাবে জীবন বিলিয়ে দিতে পারতো না।

১০২৬ সালের ৭ জানুয়ারি মোতাবেক ৪১৬ হিজরী সনের ৫ যিলকদ শুক্রবার। রীতি অনুযায়ী অন্যান্য দিনের মতো ফজরের আযান ধ্বনীত হলো। গযনীর সেনারা নামাযের জন্য জামাতে শরীক হলো। সুলতান মাহমূদ নিজেও সেনাদের সাথেই এক ফাঁকে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন।

ইমাম সাহেব আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে গযনী বাহিনীর বিজয়ের জন্যে দুআ করলেন। নামাযের পর গযনীর সৈন্যরা সোমনাথের মন্দির কেন্দ্রিক দুর্গ অবরোধ করলো। এই অবরোধের মধ্যে ঐতিহাসিকদের মতো চমক সৃষ্টি করেছিলো গযনী সেনাদের সমন্বিত তাকবীর ধ্বনি। তাকবীর এতোটাই প্রাণবন্ত ও উচ্চকণ্ঠ ছিলো যে, গযনীর সেনাদের তাকবীর ধ্বনি সোমনাথ দুর্গে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিলো। গযনী সেনাদের প্রচণ্ড তাকবীর ধ্বনি শুনে দুর্গ প্রাচীরে হাজার হাজার হিন্দু এসে সমবেত হলো। হিন্দুরাও মুসলিম সেনাদের বিপরীতে জয়হিন্দু, জয় সোমনাথ, জয় শিবদেব বলে চিৎকার শুরু করলো।

সুলতান মাহ্মূদ এদিন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে নির্দেশ করার পরিবর্তে অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে গোটা এলাকা পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং সেনাদের নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। তার একান্ত বার্তা বাহকদল তাকে অনুসরণ করছিলো এবং তার প্রতিটি নির্দেশ যথাযথভাবে উদ্দিষ্ট কমান্ডারের কাছে পৌছে দিচ্ছিলো।

অবরোধ আরোপের পর প্রথম সমস্যা দেখা দিল খাল। সোমনাথকে তিন দিকে ঘিরে রেখেছিলো সাগর আর এক দিকে ছিল স্থল। সেদিকে আবার গভীর খাল খনন করে একটি মাত্র পথ রেখে সোমনাথ দুর্গকে অজেয় করে রেখেছিল হিন্দুরা। এই খালই গযনী সেনাদের জন্যে কাল হয়ে দেখা দিল। কারণ দুর্গ প্রাচীর ও বুরুজের উপর থেকে গযনী বাহিনীর উপর তীরবৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল যাতে তারা একটি মাত্র স্থান দিয়ে খাল পার হতে না পারে।

সুলতান মাহমূদ খালের পাড়ে গযনী বাহিনীর হাজার হাজার তীরন্দাজকে দাঁড় করিয়ে দুর্গ প্রাচীরে অবস্থানরত হিন্দুদের প্রতি বিরামহীন তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। গযনী বাহিনীর কামানগুলো ছিল হিন্দুদের কামান অপেক্ষা বেশী শক্ত। তাদের নিক্ষিপ্ত তীর হিন্দুদের নিক্ষিপ্ত তীরের চেয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়তো।

গযনী সেনাদের আকস্মিক তীব্র তীরবৃষ্টিতে দুর্গপ্রাচীরের হিন্দুরা জীবন বাঁচাতে মাথা নীচু করতে বাধ্য হলো। ফলে তাদের তীরের তীব্রতা হ্রাস পেলো।

এই সুযোগে গযনীর সেনারা উটের পিঠে করে নিয়ে আসা পাথরগুলো খালের মধ্যে নিক্ষেপ করছিল। এই ব্যাপারটি ছিল অনেকটা এক জায়গা থেকে মাটি এনে অন্য জায়গার নদী ভরাট করার মতো।

হিন্দুরা যখন দেখলো, তাদের প্রতিরক্ষা খাল গযনীর সেনারা ভরাট করতে শুরু করেছে, তারা জীবন উৎসর্গ করে গযনী বাহিনীর তীরের আঘাতের তোয়াক্কা না করে দুর্গ প্রাচীর থেকে গযনীর তীরন্দাজ ও পাথরবাহী সেনাদের উপর তীর নিক্ষেপের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। অবস্থা এমন হলো যে, মুসলিম তীরন্দাজদের তীর বিদ্ধ হয়ে শতে শতে হিন্দু দেয়ালের উপর থেকে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু তাতেও হিন্দুদের তীর আক্রমণে কোন ভাটা পরিলক্ষিত হচ্ছিল না, মুহূর্তের মধ্যে সেই শূন্যস্থান অপর হিন্দুরা দখল করে নিচ্ছিল। হিন্দুরা মুসলমানদের ঠেকাতে জীবনের কোন পরোয়াই করছিল না। তারা গযনী বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হলো।

প্রতিরক্ষা খাল তখনো অর্ধেক ভরাট হয়েছে মাত্র। এমন সময় গযনীর তীরন্দাজ সেনারা লক্ষ্য করলো, হিন্দুদের বেপরোয়া তীরাঘাতে তাদের সহযোদ্ধা ভাইয়েরা নিহত হচ্ছে। তখন তাদের রক্ত টগবগিয়ে উঠলো এবং গযনীর তীরন্দাজরা প্রতিরক্ষা খালে ঝাপিয়ে পড়ে একে অন্যের হাত ধরে খালের অপর পাড়ে ঠাঁই করে নিলো। তারা জীবন বাজি রেখে একেবারে দুর্গপ্রাচীরের এতোটাই কাছে চলে গেলো যে দুর্গপ্রাচীরের উপরে দাঁড়ানো প্রতিটি ব্যক্তিকে আলাদা আলাদা ভাবে তারা সনাক্ত করতে সক্ষম। এমতাবস্থায় তারা জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে হিন্দুদের প্রতি তীর নিক্ষেপ শুরু করলো।

গযনীর তীরন্দাজদের এই দুঃসাহসী ভূমিকায় শক্তি সঞ্চার করেছিল গযনী সেনাদের সম্মিলিত তকবীর ধ্বনি। গযনীর তীরন্দাজদের উপর ঠিক মাথার উপর থেকে শিলা বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল কিন্তু তারা তীরবিদ্ধ হয়েও প্রতিপক্ষের প্রতি বিরামহীন তীর নিক্ষেপ করেই যাচ্ছিল। মূলত তখন উভয় পক্ষের মধ্যে তীরযুদ্ধই হয়ে উঠেছিল মূল। হিন্দুরা চাচ্ছিল প্রতিরক্ষা খালকে কার্যকর রাখতে আর গযনী সেনারা চাচ্ছিল প্রতিরক্ষা খালটি ভরাট করে দুর্গে আক্রমণ ব্যবস্থাকে অবারিত ও সাচ্ছন্দময় করতে। যাতে তারা সহজে দুর্গ প্রাচীর পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারে, খালের প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

এক পর্যায়ে খালের কিছুটা অংশ ভরাট হয়ে গেল। যাতে চারটি ঘোড়া একসাথে সমান্তরাল ভাবে খাল ডিঙাতে পারবে। ঠিক সেই সময় চারজন যোদ্ধা

হাতে কুড়াল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে খাল পেরিয়ে দুর্গ প্রাচীরের দিকে ঘোড়া হাঁকাল। তাদের লক্ষ দুর্গ প্রাচীরের একটি ছোট ফটক।

তারা চাচ্ছিল দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেলে কুড়াল দিয়ে দরজা তারা ভেঙে ফেলতে পারবে। কিন্তু দু'জন দরজা পর্যন্ত যাওয়ার আগেই তীরবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল আর অপর দু'জন দরজা পর্যন্ত পৌঁছলো বটে কিন্তু দরজায় কুঠারাঘাত করার আগেই দুর্গ প্রাচীরের উপরে অবস্থানরত দ্বাররক্ষীদের বর্শার আঘাতে ধরাশায়ী হলো।

প্রতিরক্ষা খাল কিছুটা ভরাট ও ঘোড়া দৌড়ে যাওয়ার উপযোগী হওয়ায় বাধভাঙ্গা বানের মতো গযনীর সেনারা দুর্গ প্রাচীরের দিকে ধাবিত হলো। তাদের কারো কারো হাতে ছিলো দীর্ঘ মই। দেয়ালে মই ঠেকিয়ে যাতে দ্রুত গযনীর সেনারা দুর্গ প্রাচীরের উপর ওঠে যেতে পারে এজন্য তারা দুর্গ প্রাচীরের উচ্চতার সমান মই নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। আর এই মই বহনকারীদেরকে শত্রুসেনাদের তীরাঘাত থেকে রক্ষার জন্যে পেছন দিক থেকে গযনীর তীরন্দাজ সেনারা দুর্গপ্রাচীরে অবস্থানরত শত্রুসেনাদের প্রতি তীব্র তীর নিক্ষেপ করছিল যাতে তীর নিক্ষেপরত হিন্দুরা জীবন বাঁচাতে মাথা নীচু করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তীরন্দাজ হিন্দুরা মাথা নীচু করে তীর নিক্ষেপ বন্ধ করেনি। তারা একের পর এক তীর বিদ্ধ হচ্ছিল বটে কিন্তু গযনীর মইবাহী সেনাদের অগ্রগতি রোধ করার চেষ্টায় মোটেও ত্রুটি করেনি।

দৃশ্যত দুর্গ ফটক পর্যন্ত পৌঁছার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু এমতাবস্থায়ও কয়েকজন জানবাজ গযনী সেনা দুর্গফটকের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তারা দুর্গ ফটকের ফাঁক দিয়ে বুরুজে অবস্থানরত তীরন্দাজ ও দ্বাররক্ষীদের দিকে তীর নিক্ষেপ করার সুযোগও পেয়েছিল। এই সুযোগে কয়েকজন দেয়ালে মই দাঁড় করাতে সক্ষম হলো কিন্তু বিধি বাম। যেই মই বেয়ে দুর্গপ্রাচীরের উপরে উঠতে যাচ্ছে তাকেই তীর ও বর্শাবিদ্ধ হয়ে গড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।

এদিকে যখন দুর্গপ্রাচীরে চড়ার চেষ্টা চলছিল, অপরদিকে সমুদ্রের পানিপথেও তখন গযনীর সেনারা দুর্গপ্রাচীরে চড়াও হওয়ার চেষ্টা করছিল। সমুদ্রের পানিপথেও চলছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। কারণ সোমনাথ দুর্গের দুই-তৃতীয়াংশই ছিল পানিবেষ্টিত। গযনীর একজন ডেপুটি সেনাপতি পানিপথের সুযোগ নিয়ে দুর্গ প্রাচীরের উপরে উঠার দুঃসাহসী উদ্যোগ নিয়েছিল। গযনী

সেনাদের কোন নৌকা ছিল না। কিন্তু দুর্গের পাশের সমুদ্র তীরে জেলেও সেনাদের শত শত নৌকা সারি সারি বাধা ছিল। গযনীর এক ডেপুটি সেনাপতি তার ইউনিট নিয়ে কিছু সংখ্যক মই নৌকায় তুলে জেলে মাল্লাদেরকে দুর্গ প্রাচীরের দিকে নৌকা চালানোর নির্দেশ দিল। কিন্তু গযনী সেনাদের এই উদ্যোগও দুর্গপ্রাচীরে পাহারারত হিন্দুসেনাদের চোখে পড়ে গেল। ফলে তারা আগুয়ান গযনী সেনাদের প্রতি দুর্গপ্রাচীরের উপর থেকে তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। তীর আসতে দেখে হিন্দু মাঝি মাল্লারা প্রাণ বাঁচাতে সাগরে ঝাপিয়ে পড়তে লাগলো। ফলে গযনী সেনাদের অনভ্যস্ততা সত্ত্বেও নৌকার হাল ধরতে হলো। সাগরেও শুরু হয়ে গেলো তীব্র লড়াই।

সেদিন ছিল জুমআর দিন। জুমুআর সময় প্রায় হয়ে যাচ্ছে। তখনও চলছে খাল ভরাটের কাজ। কারণ খাল যতোটা বেশী ভরাট করা যাবে, আক্রমণও পশ্চাৎপসারণের কাজটা ততোটাই সহজ হবে। এ সময় উভয় বাহিনীর সৈন্যরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছিল। ঠিক জুমআর সময়ের আগে আগে সুলতান মাহমূদ হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে বিশেষ মোনাজাত করলেন এবং মোনাজাত শেষ করে ঘোড়ায় চড়ে চিৎকার করে করে আক্রমণ আরো তীব্র করার জন্য সেনাদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তিনি তার অবস্থান থেকে অনেক সামনে অগ্রসর হয়ে সেনাদেরকে উজ্জীবিত করার জন্যে চিৎকার করে সঙ্গ দিচ্ছিলেন।

এমন সময় হিন্দুরা দুঃসাহসের পরিচয় দিল। তারা একটি ফটক খুলে দিল। দুর্গের ভেতর থেকে অশ্বারোহীরা বর্শা হাতে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে গযনী সেনাদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানলো। তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলো বটে কিন্তু মুসলমানদেরকে দুর্গপ্রাচীর থেকে দূরে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলো।

সুলতান মাহমূদ তার সেনাদের নির্দেশ দিলেন, খোলা ফটক দিয়ে দুর্গের ভেতরে ঢুকে যাও। নির্দেশ পেয়েই বহু যোদ্ধা এক সাথে দুর্গ ফটকের দিকে ঘোড়া হাঁকালো কিন্তু ভেতর থেকে এতো বিপুল পরিমাণ হিন্দু সেনা গযনী সেনাদের ঠেকানোর জন্য ফটক আগলে দাঁড়ালো যে তাদের পক্ষে ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব হলো না। দুর্গ ফটকের সামনেই দুই বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বেধে গেল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, অবস্থা এমন ছিলো যে, উভয় পক্ষের যোদ্ধারাই ছিলো মরা ও মারার জন্যে মরিয়া। গযনীর সেনারা শপথ করেছিলো 'হয় মৃত্যু

নয়তো বিজয়'। মুসলমানদের এই শপথের অগ্নিবাণ হিন্দুরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে রোধ করছিলো।

দুর্গের ভেতরে খবর ছড়িয়ে পড়লো, গযনীর সেনারা দুর্গের প্রধান ফটক খুলে ফেলেছে। খবর পেয়ে দুর্গ প্রাচীরে ছড়িয়ে থাকা তীরন্দাজ হিন্দুরা প্রধান ফটকের উপরে এসে সমবেত হয়ে নীচে মুসলমানদের লক্ষ্য করে তীরবৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করলো।

দুর্গপ্রাচীরে এ খবরও ছড়িয়ে পড়েছিলো, মুসলিম যোদ্ধারা দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। খবর শুনে দুর্গপ্রাচীরের উপরে থাকা সৈন্যরা নীচে নেমে এলো মুসলমানদের প্রতিরোধ করতে। অপর দিকে দুর্গ প্রাচীর খালি দেখে গযনী সেনারা দেয়ালে ঠেকিয়ে একের পর এক দুর্গপ্রাচীরে উঠতে শুরু করলো। এক পর্যায়ে দুর্গ প্রাচীরেও শুরু হয়ে গেলো দুই বাহিনীর মধ্যে হাতাহাতি লড়াই।

এদিকে মন্দিরেও খবর পৌঁছে গেলো, মুসলিম সেনারা দুর্গে ঢুকে পড়েছে। একথা শুনে যেসব পুরোহিত, ঠাকুর ও পণ্ডিত স্বাভাবিক পূজা-অর্চনা করছিলো, এরা সবাই মূর্তির পায়ে মাথা রেখে গড়াগড়ি করে রোদন করতে লাগলো। মন্দিরের প্রধান ফটক খোলা থাকার কারণে মুসলমানদের নারায়ে তাকবীর ধ্বনি মন্দিরের পূজারীদের কানে পৌঁছে গেল। পণ্ডিত পুরোহিতরা ছিলো ধর্মের কাণ্ডারী। এরা লড়াই করতে জানতো না। সুলতান মাহমূদ মন্দির ও মন্দিরের মূর্তি ধ্বংস করতেন কিন্তু কোন পূজারী বা পুরোহিতের গায়ে হাত তুলতেন না।

সোমনাথ মন্দিরের পণ্ডিত পুরোহিতদের কানে যখন গযনী সেনাদের তকবীর ধ্বনিত হতে লাগলো, তখন তাদের পূজার ধ্যান ছুটে গেলো। তখন হাজারো পুরোহিতের কিছু সংখ্যক পূজা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালো। তারা দেখলো নৃত্যরত নর্তকীদের নাচ থেমে গেছে। তাদের চেহারা ফ্যাকাসে তারা ভীত সন্ত্রস্থ। পণ্ডিতেরা যখন দেখলো তাদের জীবনের শেষ সময় এসে গেছে তখন নৃত্যত্যাগী সুন্দরীদের সাথে করে প্রত্যেকেই মন্দিরের গোপন প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়লো এবং তাদের সাথে আদিম উল্লাসে মেতে উঠলো। কিন্তু দুর্গের সাধারণ হিন্দুদের অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা পণ্ডিতদের এই পৈশাচিকতার বিন্দু বিসর্গও জানতো না।

সোমনাত দুর্গের সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে তেমন ভয়-ভীতি ছিলো না। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহিলারাও মুসলিম যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিলো। বৃদ্ধা মহিলারা সমবেত হয়েছিলো মন্দিরে। তারা মূর্তির

বেদিতে মাথা ঠেকিয়ে রোনাজারী করছিলো। তারা মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে দেবদেবীদের সাহায্য প্রার্থনা করছিলো।

* * *

দুর্গফটক খুলে দেয়ার চালটি ছিলো সোমনাথ দুর্গের রাজা রায়কুমারের। রাজা রায়কুমার ইতোমধ্যে অনেকটাই সফল হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, দুর্গফটক খুলে দিয়ে তিনি গযনী বাহিনীকে আরো বেশী পর্যুদস্ত করতে পারবেন। কিন্তু রায় কুমারের প্রতিপক্ষ ছিলেন তার চেয়েও আরো বেশী দূরদর্শী জেনারেল। যে কোন বিপর্যয় থেকেও শিক্ষা নিয়ে তাৎক্ষণিক বিপর্যয় ঠেকিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনার মতো পারদর্শী ছিলেন গযনীর সুলতান।

গযনীর সুলতান ও তার প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ দুর্গফটক খুলে দেয়ার সাথে সাথেই কিছু সেনাকে দুর্গফটকের উপরের বুরুজ ও মরিচায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারা সেখান থেকে কার্যকর ভাবে তীর নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয় তাদের সহায়তায় অন্য সেনারা মই বেয়ে দুর্গপ্রাচীরে উঠতে থাকে।

মহারাজা রায়কুমার এই অবস্থা দেখে বিপুল সংখ্যক সেনাকে দুর্গফটকের দিকে ঠেলে দিলেন। সংখ্যাধিক্য হওয়ায় তারা মানবঢাল তৈরী করে মুসলিম সেনাদেরকে দুর্গফটকের বাইরে ঠেলে নিয়ে গেলো। আর এ দিকে রাজার নির্দেশে দুর্গ ফটক বন্ধ হয়ে গেলো। এবার হিন্দু সৈন্যদের আর ভেতরে ফেরার কোন পথ থাকলো না। তারা সোমনাথের জন্য আত্মবিসর্জন দিতে লাগলো। একে একে সবাই মুসলিম যোদ্ধাদের হাতে নিঃশেষ হয়ে গেল।

দুর্গফটক বন্ধ করে দিয়ে সকল হিন্দু যেসব মুসলিম যোদ্ধা দুর্গ ফটকের উপরের বুরুজে অবস্থান নিয়েছিলো তাদের উপর হামলে পড়লো। এমতাবস্থায় প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গযনীর যোদ্ধারা লড়াই করে জীবন বিসর্জন দিলো। বুরুজ দখলকারী মুসলমানদের কাবু করার পর হিন্দুরা মই বেয়ে দুর্গ প্রাচীরে উঠে আসা বন্ধ করতে গযনী সেনাদের প্রতিরোধে লিপ্ত হলো। হিন্দুদের প্রবল তীর ও বর্শা বর্ষণের কারণে তারা একে অন্যের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলো। দুর্গ প্রাচীরে আরোহণ সচেষ্ট মুসলিম সেনাদের কারো পক্ষেই জীবন নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হলো না।

সুলতান মাহমূদ দেখলেন, সূর্য দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে চলে গেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তিনি আরো খেয়াল করলেন তার যোদ্ধাদের মধ্যে আহতের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। এমতাবস্থায় তিনি দুর্গ প্রাচীরের কাছে থাকা সেনাদেরকে পিছিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন এবং যুদ্ধে বিরতি ঘোষণা করলেন।

রাতব্যাপী সুলতান এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমালেন না। তিনি সেনাপতি ও কমান্ডারদের দিক-নির্দেশনা দিলেন। ঘুরে ঘুরে আহতদের চিকিৎসার খোঁজ খবর নিলেন এবং যেসব যোদ্ধা বহিঃশত্রুদের পথরোধ করার জন্য শিবির থেকে দূরে অবস্থান করছিলো তাদের সাথেও সাক্ষাত করলেন। মনে মনে তিনি কিছুটা চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। দৃশ্যত তার কাছে বিজয় সুদূর পরাহত মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাতেও তিনি হতোদ্যম হলেন না। বস্তুত হতোদ্যম হয়ে রণেভঙ্গ দেয়ার ব্যক্তি তিনি ছিলেন না।

পরদিন সূর্য উঠার সাথে সাথেই নব উদ্যমে তিনি সেনাদেরকে দুর্গ প্রাচীরে আঘাত হানার নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে সেনারা মই বেয়ে দুর্গ প্রাচীরে উঠার চেষ্টা করলো কিন্তু হিন্দুরা তাদের কোন চেষ্টাই সফল হতে দিলো না। সারাদিন চললো আঘাত প্রত্যাঘাত। কিন্তু কোন পক্ষেরই তেমন সফলতা এলো না। দিন শেষে সুলতান সেনাদের ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন।

* * *

১০২৬ সালের ৯ জানুয়ারি। মহারাজা রায়কুমার একটি দুঃসাহসী চাল দিলেন। তিনি ভোরের সূর্য উদিত হওয়ার আগেই দুর্গফটক খুলে দিলেন। খোলা দরজা দিয়ে দুর্গের ভেতর থেকে দু'টি সেনাদল বের হয়ে মুসলিম শিবিরে আঘাত হানলো। হিন্দুরা ভেবেছিলো, মুসলিম যোদ্ধারা হয়তো তখনো ঘুমিয়ে আছে, নয়তো প্রস্তুতিতে লিপ্ত রয়েছে। বস্তুত সময়টা ছিলো ফজরের নামাযের। গযনীর সেনারা নামায শেষ করেছিলো মাত্র। হিন্দুরা ছিলো অশ্বসজ্জিত পক্ষান্ত রে গযনী সেনাদের পক্ষে অশ্বারোহণের জন্য ঘোড়ার কাছে যাওয়ার অবকাশ ছিলো না। এমতাবস্থায়ও সুলতান মাহমূদ দূতের মাধ্যমে খবর ছড়িয়ে দিলেন হিন্দু সেনাদেরকে ঘেরাও করে ফেল। হিন্দুরা অত্যধিক দুঃসাহস নিয়ে হামলে পড়েছিলো। তারা বুঝতে পারলো না তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলা হচ্ছে।

গযনীর একটি প্রহরী দল হিন্দু সেনাদেরকে মূল শিবিরে আঘাত হানার আগেই পথরোধ করে দাঁড়ালো। আর এদিকে হিন্দুদের উপর ডান ও বাম দিক থেকে প্রচণ্ড আঘাত হানা হলো। কিন্তু হিন্দুরা ছিলো মরিয়া। তারা মরণত্যাগী হয়ে লড়তে শুরু করলো ফলে তাদের পরাস্ত করতে মুসলিম সেনাদেরকেও ঘাম ঝরাতে হলো। অবশেষে কিছু হিন্দু সেনা ঘেরাও ডিঙিয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হলো, আর তাদের জন্য পুনরায় খুলে গেলো দুর্গফটক। তারা ভেতরে চলে গেলো। কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধা পলায়নপর হিন্দুদের পিছু ধাওয়া করলে সুলতান তাদের নিষেধ করলেন। কারণ খোলা ফটক মুসলিম যোদ্ধাদের জন্যে মরণ ফাঁদে পরিণত হতে পারে।

হিন্দু সেনাদের দুঃসাহসিকতায় সুলতান মাহমূদকে তাঁর রণকৌশল পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করলো। হিন্দুদের মোকাবেলায় সুলতান মাহমূদ অত্যন্ত অভিজ্ঞ হলেও সোমনাতের হিন্দুদের রণকৌশল ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের নারীশিশু বৃদ্ধ আবাল বণিতা সকলেই ছিলো ধর্মীয় ভাবাবেগে উন্মাদ। হিন্দুদের আগ্রাসী তৎপরতায় যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন সুলতান। তিনি গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন। ঠিক এই মুহূর্তে তার কানে ভেসে এলো শোরগোলের আওয়াজ। এ ধরনের শোরগোলের সাথে সুলতান পরিচিত।

মুহূর্তের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন, অন্য একটি ফটক খুলে সোমনাথ দুর্গ থেকে দু'টি অশ্বারোহী দল ও একটি পদাতিক দল দ্রুতগতিতে ধেয়ে এসে গযনী সেনাদের উপর হামলে পড়েছে। কিন্তু এবার আর ডানবাম দিক থেকে হিন্দুদের ঘিরে ফেলার কৌশল অবলম্বনের কোন সুযোগ হিন্দুরা রাখেনি। কারণ, দুর্গ প্রাচীর ও বুরুজের উপর থেকে অসংখ্য তীরন্দাজ তাদের সহায়তা করছিলো যাতে গযনী বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলতে না পারে।

প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ ঘেরাও কাজে নিয়োজিত সেনাদের পিছনে সরে আসার নির্দেশ দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন হিন্দুসেনারা এগিয়ে এলে দুর্গ প্রাচীর ও তাদের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাবে। তখন দুর্গ প্রাচীরে অবস্থানরত তীরন্দাজদের তীরবৃষ্টির আওতামুক্ত হয়ে গযনীর সেনারা হিন্দুদের ঘেরাও করতে সক্ষম হবে এবং দুর্গ ফটক অতিক্রম করারও সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মহারাজা রায়কুমারের দেমাগ অস্বাভাবিক কৌশলী চাল দিচ্ছিল, তার প্রতিটি যুদ্ধ চালই ছিলো নিপুণ ও কার্যকর। রায়কুমার তার সেনাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তোমরা কোন অবস্থাতেই দুর্গপ্রাচীরের তীরন্দাজদের

আওতার বাইরে যাবে না। রায়কুমার আবু আব্দুল্লাহর চাল অকার্যকর করে দিলেন। হিন্দু সেনারা তাদের আওতার বাইরে এলো না।

হিন্দু সেনারা সামনে অগ্রসর না হয়ে ডানে বামে ছড়িয়ে পড়লো এবং অবরোধকারী সেনাদের উপর খণ্ড খণ্ড হামলা করতে লাগলো। হিন্দুরা অবরোধ ভাংতে এবং গযনী বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি বাড়ানোর প্রচেষ্টা করছিল। এক পর্যায়ে হিন্দুদের উত্তেজনা উন্মাদনায় রূপ নিলো। এমন সময় দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে গযনী সেনাদের কানে ভেসে এলো মহিলাদের চিৎকার। সোমনাথ দুর্গের হিন্দুমহিলারা তাদের যোদ্ধাদের আরো উত্তেজিত ও উৎসাহিত করতে সমস্বরে চিৎকার করে নানা ধ্বনি দিচ্ছিলো। তারা বলছিলো– 'সোমনাথের সুপুত্ররা! তোমরা ম্লেচদের কচুকাটা করে ফেলো, নয়তো এরা তোমাদের মাবোনদের অপহরণ করে নিয়ে যাবে। এদের নিঃশেষ করে ফেলো, না হলে আমাদের কারো রক্ষা নেই... ।'

রণাঙ্গনের অবস্থা এতোটাই মুসলমানদের জন্যে শোচনীয় হয়ে পড়লো যে, সুলতান মাহমূদ কেন্দ্রীয় কমান্ড তার একান্ত বিশ্বস্ত কয়েকজন সেনাকর্মকর্তার কাঁধে ন্যস্ত করে একটি চৌকস বাহিনী নিয়ে নিজেই আক্রমণকারী হিন্দুদের প্রতিরোধে লিপ্ত হলেন।

ঐতিহাসিক আলবিরুনী ও আবুল কাসিম ফারিশতা লিখেছেন– এ সময় গযনী বাহিনীর জন্যে সবচেয়ে অসুবিধা সৃষ্টি করেছিলো দুর্গ প্রাচীর থেকে আসা তীর ও বর্শা। এ সময় সুলতান মাহমূদ নিজেকে এবং গোটা গযনী বাহিনীকে মারাত্মক ঝুকির মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। কারণ সুলতান মাহমূদের উপর শত্রুদের একটি তীরই গযনী বাহিনীকে পরাস্ত করার জন্যে যথেষ্ট ছিলো।

প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ সুলতানের এই বেপরোয়া অবস্থা দেখে দ্রুত একটি তীরন্দাজ ইউনিটকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা দুর্গ প্রাচীরের কাছাকাছি গিয়ে প্রাচীরের উপর অবস্থানরত তীরন্দাজদের নিশানা করে তীর নিক্ষেপ করতে থাক। তীরন্দাজরা যখন দেখতে পেল সুলতান মাহমূদ তার প্রতিরক্ষাব্যুহ ভেঙ্গে সম্মুক ভাগে আক্রমণ চালাচ্ছেন, তখন তারা জীবনের পরোয়া না করে একেবারে দুর্গ প্রাচীরের কাছে গিয়ে হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড তীর চালাতে লাগলো। হিন্দুদের নিক্ষিপ্ত বর্শায় একের পর এক গযনীর তীরন্দাজ ধরাশায়ী হচ্ছিলো কিন্তু তবুও তাদের তীর নিক্ষেপে কোনরূপ বিচ্যুতি ঘটলো

না। অবস্থা এমন হলো যে, বাতাসে উভয় পক্ষের নিক্ষিপ্ত তীরে তীরে সংঘর্ষ ঘটতে লাগলো।

আবু আব্দুল্লাহর এই চালে এতটুকু কাজ হলো যে, দুর্গ প্রাচীরের হিন্দু তীরন্দাজদের লক্ষ্য সুলতান মাহমূদের দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরে গেলো। সেই সাথে গযনীর অন্য যোদ্ধারা যখন দেখলো, তাদের সহযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করছে, তীরন্দাজদের এই আত্মত্যাগে তারাও উজ্জীবিত ও শত্রুদের বিরুদ্ধে এমন উত্তেজিত হলো যে, কমান্ডারের নির্দেশের অপেক্ষা না করে নিজেরাই অগ্রগামী হয়ে দুর্গ প্রাচীরে অবস্থানরত হিন্দু সেনাদের প্রতি প্রচণ্ড তীর বর্ষণ করতে লাগলো। তীব্র তীর বৃষ্টিতে টিকতে না পেরে শত্রুসেনারা দুর্গ প্রাচীর থেকে নেমে যেতে শুরু করলো এবং বহু সংখ্যক হিন্দু সেনা তীরবিদ্ধ হয়ে দুর্গ প্রাচীরের বাইরে গড়িয়ে পড়লো।

এর ফলে যেসব হিন্দু সেনা দুর্গের বাইরে এসে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিলো তারা স্বগোত্রীয় তীরন্দাজদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো।

এদিকে সুলতান মাহমূদ তখনো বেপরোয়া ভাবে সামনের শত্রুসেনাদের কচুকাটা করতে ব্যস্ত। তার যেন আর কিছুর খবর নেই। প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ মুহূর্তের জন্যেও সুলতানের উপর থেকে দৃষ্টি সরাননি। তিনি সুলতানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। সুলতান মাহমূদকে দৃশ্যত আবেগতাড়িত মনে হলেও তিনি মোটেও অসচেতন ছিলেন না, তীব্র লড়াইরত অবস্থায়ও তিনি এমনভাবে তার যোদ্ধাদের পরিচালনা করলেন যে, শত্রুসেনারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো।

আবু আব্দুল্লাহ যখন দেখলেন, হিন্দুসেনারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তখন তিনি একটি অশ্বারোহী ইউনিটকে দুর্গপ্রাচীরের দিক থেকে আক্রমণের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। দ্বিমুখী উপর্যুপরি আক্রমণে হিন্দুসেনারা হতোদ্যম হয়ে পড়লো। এতোক্ষণ তারা মুসলমানদের বিপর্যস্ত করে রেখেছিলো কিন্তু এখন গযনী সেনাদের হাতে কচুকাটা হতে লাগলো।

এদের মধ্যে যারা ঘেরাও ডিঙ্গাতে পেরেছিলো তারা দুর্গ ফটকের দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছিলো কিন্তু মহারাজা রায়কুমার এতোটা বোকা ছিলেন না যে, গুটিকয়েক সেনার জীবন বাঁচাতে তিনি ফটক খুলে দেয়ার মতো মারাত্মক ঝুঁকি নেবেন। কারণ তিনি দুর্গ প্রাচীরের উপরে সুরক্ষিত বুরুজে দাঁড়িয়ে রণাঙ্গনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ মুহূর্তে প্রধান ফটক

খুলে দিলে প্লাবনের পানির মতো গযনী সেনারা দুর্গে প্রবেশ করবে, তাদেরকে কোন অবস্থাতেই ঠেকানো যাবে না। তিনি বের হয়ে যাওয়া সেনাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। যেসব হিন্দু সেনা এই অভিযানে শরীক হয়েছিলো তাদের কারো পক্ষেই আর দুর্গে ফিরে যাওয়া সম্ভব হলো না এবং জীবন নিয়েও পালিয়ে যাওয়ার অবকাশ পেলো না কেউ। সবাইকে গযনী বাহিনীর হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো।

সুলতান মাহমূদ কখনো নির্বিচারে হত্যার পক্ষে ছিলেন না। তিনি বিজয়ের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছাড়া কোন শত্রু সেনাকে হত্যা করতেন না। কিন্তু এদিন হিন্দুদের কাবু করার সাথে সাথে প্রধান সেনাপতি সকল কমান্ডারের কানে এ খবর পৌঁছে দিয়েছিলেন, আমাদের কোন যুদ্ধবন্দীর দরকার নেই, সবাইকে হত্যা করে ফেলো। শত্রুদের যেখানে যে অবস্থায়ই পাও নিঃশেষ করে ফেলো।

কারণ এই পর্যায়ে গোটা যুদ্ধের অবস্থাই বদলে গিয়েছিলো। মরো এবং মারো এটাই হয়ে উঠেছিলো উভয় পক্ষের অঘোষিত লক্ষ্য। এমতাবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের সামলানোর ব্যাপার একটি বাড়তি ঝামেলা হয়ে পড়তো। তখন শত্রুসেনাদের বন্দী করার চেয়ে তাদের তরতাজা ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র বেশী প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে উঠেছিলো। গযনী বাহিনী শত্রুসেনাদের পরাস্ত করে তাদের তাজাদম ঘোড়া ও অস্ত্রগুলো কব্জা করলো। যুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন কোথাও শত্রু সেনাদের কাউকে আর দেখা গেলো না।

* * *

দিন শেষে রাতের বেলায় সুলতান মাহমূদ সকল সেনা কর্মকর্তা, কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডারদের সমবেত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি এর আগের কোন যুদ্ধে হিন্দুদেরকে এমন দুঃসাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছেন?

এদের আবেগ ও উন্মাদনা দেখেই বুঝা যায় সোমনাথ মন্দিরকে এরা কতোটা পবিত্র জ্ঞান করে। আমি আপনাদের সবাইকে একথা বলতে ডেকেছি, আপনারা নিজ নিজ ইউনিটের সেনাদের বলবেন, তোমরা হিন্দুসেনাদের আবেগ উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা দেখো এবং তা নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করো।

আমি সেইসব সেনাদের মোবারকবাদ জানাচ্ছি, যারা আজ নির্দেশের অপেক্ষা না করে নিজেরাই উদ্যোগী ও অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে শত্রুসেনাদের কাবু

করেছিলো। আল্লাহ তাআলা তাদের এই সাহসী ভূমিকার যথার্থ প্রতিদান দেবেন। আমি চাই সেনাদের এই আবেগ ও উচ্ছ্বাসে যেন কোনরূপ ভাটা না পড়ে। আমি বলতে পারবো না, আগামীকাল কি ঘটবে, তাও বলতে পারবো না, যুদ্ধের পরিণতি কি হবে! তবে আমি আমার সেনাদের কাছে পয়গাম পৌঁছে দিতে চাই, আমরা যদি এ যুদ্ধে পরাজিত হই, তাহলে ভবিষ্যতের লোকেরা বলবে, হিন্দুদের দেবদেবীরাই সত্য, মানুষের জীবনমৃত্যু তাদেরই হাতে। ইসলাম আসলেই কোন সত্য ধর্ম নয়। ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদেরকে লুটেরা ও খুনী সন্ত্রাসী বলবে। আমাদেরকে জীবন দিয়ে হলেও ইসলামের সততা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই যুদ্ধকে আপনারা অন্য দশটি যুদ্ধের মতো মনে করবেন না। আগামী দিন হয়তো বিগত দিনের চেয়ে আরো রক্তক্ষয়ী হবে এবং আরো বেশী ধৈর্য ও সাহসের পরীক্ষা দিতে হবে। আপনাদেরকে ইতিহাস সৃষ্টি করতে হবে। এমন ইতিহাসের জন্ম দিতে হবে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ যখনই গযনী বাহিনীর আলোচনা করবে সাথে সাথে আসবে সোমনাথের নাম। মানুষ বলতে বাধ্য হবে, গযনীর সিংহশাবকেরা সোমনাথের পাথরের মূর্তিগুলোকে তাদের পায়ে পড়তে বাধ্য করেছিলো।

এরপর সুলতান সেনাকর্মকর্তাদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে জরুরি দিক-নির্দেশনা দিয়ে বললেন– আমাদেরকে অতি দ্রুত এই যুদ্ধের ইতি টানতে হবে, কারণ আমাদের লোকবল ও রসদ দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। লোকবল ও রসদের ঘাটতি পূরণ করার মতো কোন ব্যবস্থা আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ যথেষ্ট দূরদর্শী ও সাহসী। অবশ্য তারা আমাদের উপর আক্রমণ না করে যদি আত্মরক্ষামূলক কৌশল নিতো আর অবরোধ প্রলম্বিত করতে বাধ্য করতো, তাহলে তাদের কোন জনবলই হারাতে হতো না, এক সময় রসদসামগ্রী নিঃশেষ হয়ে আমাদেরকে অভুক্ত থেকেই মরতে হতো। শত্রু বাহিনী এই কৌশলের আশ্রয় নেয়ার আগেই আমাদেরকে শহরে প্রবেশ করতে হবে। তবে আমরা আহত ক্ষুধার্ত বিড়ালের মতো নয় সিংহের মতো শহরে প্রবেশ করতে চাই।

এ রাতেও গযনী বাহিনীর কোন সদস্য ঘুমাতে পারেনি। সারারাত তারা রণপ্রস্তুতিতে কাটিয়েছে।

* * *

সেনা কর্মকর্তাদের বিদায় করার পর সুলতানকে জানানো হলো, এক বৃদ্ধ ঋষি এক তরুণীকে নিয়ে এসেছে। সে সুলতানের সাথে সাক্ষাত করতে চায়। ঋষি জানিয়েছে, তারা সোমনাথ মন্দির থেকে এসেছে।

সুলতান তাদেরকে ডাকালেন। তিনি ভেবেছিলেন, এরা মহারাজা রায়কুমারের কাছ থেকে কোন পয়গাম নিয়ে আসতে পারে, হয়তো যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব নিয়ে এরা আসতে পারে নয়তো কোন হুমকি ধমকি কিংবা চক্রান্তের বীজও এদের আগমনে থাকতে পারে। কাজেই এদের কাছ থেকে তা জানার জন্যেই সাক্ষাত হওয়া দরকার। ঋষি ও তার সঙ্গীনীকে সুলতানের সামনে পেশ করার আগেই তাদের দেহ তল্লাশী করা হয়েছে।

বৃদ্ধ ঋষির গায়ে ছিলো আজানু লম্বিত চৌগা। তার চুল মেয়েদের ন্যায় দীর্ঘ, দাড়ি ও গোঁফ ছিল লম্বা। সে ছিলো যথার্থই বয়স্ক, তার চুলদাড়ি শ্বেত শুভ্র। কিন্তু ঋষির চেহারায় ছিলো আভিজাত্যের ছাপ ও দীপ্তি। সাধারণত হিন্দুদের চেহারা এমন দীপ্তিময় হয় না।

সুলতান মাহমূদ ঋষির চেহারা ছবি দেখে মুগ্ধ হলেন। ঋষির সঙ্গী তরুণী ছিলো আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা। এক পর্যায়ে বৃদ্ধ ঋষি তরুণীর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন। সুলতান মাহমূদ তরুণীকে এক পলক দেখলেন, তার মনে হলো, এমন সুন্দরী তরুণী দ্বিতীয়টি তিনি কখনো দেখেননি। সুলতানের দৃষ্টি অনুপম সুন্দরীর প্রতি হঠাৎ যেনো থমকে গেলো। চকিতে তরুণীর চেহারা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বৃদ্ধ ঋষিকে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনি কেনো এসেছেন?' আপনাকে কি মহারাজা পাঠিয়েছেন? স্থানীয় একজন মুসলমান দুভাষীর মাধ্যমে ঋষির সাথে কথা বলছিলেন সুলতান।

আমি মহারাজার কাছ থেকে কোন পয়গাম নিয়ে আসিনি। দৃঢ়তার সাথে বললো বৃদ্ধ ঋষি। বৃদ্ধের কথার মধ্যে ভাবগাম্ভীর্য ও তীব্র সম্মোহনী শক্তি রয়েছে তা লক্ষ্য করলেন সুলতান। সুলতান তার প্রথম বাক্য থেকেই বুঝতে পারলেন, এই ঋষি কোন সাধারণ মানুষ নয়।

আমি মহারাজার পয়গাম নিয়ে আসিনি বটে তবে তার অনুমতি নিয়েই এসেছি। মহারাজাই চারজন অশ্বারোহী সহ আমাকে দুর্গ থেকে বের করে পথ বলে দিয়েছেন। অবশ্য আমি নিজের পক্ষ থেকে আপনার দরবারে একটি পয়গাম নিয়ে এসেছি। আমি সোমনাথ মন্দিরের পণ্ডিত নই। আমি প্রতি বছর পনেরো বিশ দিনের জন্যে এখানে আসি। আমার মূল ঠিকানা হিমালয়ের

পাদদেশে। সেখানে সারাবছর বরফ জমে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারো আমি যখন এখানে এসেছি ঠিক এর দু'দিন পরই আপনি এখানে এসেছেন, বললো ঋষি।

বিগত কয়েক দিনে আপনি দেখেছেন, সোমনাথ দুর্গের অধিবাসীরা কি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে আছে। এ কয়দিনে হওয়া আপনার ক্ষয়ক্ষতির দিকে একটু দৃষ্টি দিন। কত যোদ্ধাকে আপনার হারাতে হয়েছে! আসলে আপনার এই ক্ষয়ক্ষতির কারণ সোমনাথবাসীর ক্ষোভ ও জিঘাংসা নয় প্রকৃত পক্ষে সোমনাথ মন্দিরের মহাদেব-এর ক্ষোভই মানুষের রূপ ধারণ করে আপনার সেনাদের উপর আপতিত হয়েছে। যে দেবতার পা সাগরে আর মাথা আসমানে অধম সেই মহাদেব এর একজন খাস পূজারী।

আপনি কি আপনাদের দেবতা সম্পর্কে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন? আর এই তরুণীকে কি আপনাদের রীতি অনুযায়ী উপঢৌকন হিসেবে নিয়ে এসেছেন? মুচকি হেসে বললেন সুলতান।

নিজে নিজেকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলবেন না সুলতান। আমি আপনাকে ভয় দেখাতে আসিনি এবং কোন উপঢৌকন দিতেও আসিনি। আমি এসেছি আপনার উপকার করতে, আপনাকে মুক্তি দিতে। এ জন্য আমি একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

শিবদেব এর শক্তি সম্পর্কে আপনি জ্ঞাত নন। শিবদেব তার শক্তির সামান্য আমাকে দান করেছেন। আমার অর্জিত সামান্যটুকু এতোটাই নগণ্য যেমন সমুদ্রের মধ্যে এক ফোঁটা পানি কিংবা মরুভূমির একটি বালুর কণা। আপনি যদি চান তবে আমি এই কণা পরিমাণ অর্জিত শক্তির দাপট দেখাতে পারি। তা দেখলে আপনি শিবদেব-এর মহাশক্তির পরিমাণ আন্দাজ করতে পারবেন।

আর এই তরুণী? জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

এই তরুণী জীবিত নয় মৃত। এটি একটি মৃত আত্মার খাঁচা মাত্র। আপনাকে হয়তো কেউ এখনো জানায়নি, যারা মারা যায় তাদের সবার আত্মা সোমনাথে চলে আসে। এই আত্মাটি অনেক দূর থেকে এসেছিল। আমি এটিকে এখানে নিয়ে এসেছি। আপনি যদি বিশ্বাস না করেন, তবে আমি এটিকে বাতাসে ঝুলিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে পারি।

একথা বলেই ঋষি তরুণীর মাথা তার হাতের তালুতে নিয়ে তরুণীর চোখে চোখ রেখে বিড়বিড় করে কি যেন বললো। এর সাথে সাথেই তরুণীর মাথা দুলতে লাগলো। এরপর ঋষি তরুণীকে পাজাকোলা করে উঁচিয়ে ধরে বললো, তুমি এখন পালঙ্কের উপর শুয়ে আছো। দু'পা ও মাথা সোজা করে শুয়ে পড়ো। তরুণীর দু'পা এমন ভাবে সোজা হয়ে গেলো যেন সে পালঙ্কের উপর শুয়ে আছে। এ পর্যায়ে ঋষি তার দু'হাত তরুণীর দেহের নিচ থেকে সরিয়ে ফেললো। বিস্ময়কর ভাবে তরুণী শূন্যে ভাসতে লাগলো। ঋষি এবার তরুণীর উড়না দিয়ে তাকে আপাদমস্তক ঢেকে দিলো।

সুলতান মাহমূদের দুই প্রহরী তাঁবুর দরজার ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিলো। ঋষি তাদের একজনকে হাতের ইশারায় নির্দেশ দিলো, তরবারী বের করে তরুণীর পেটে এমনভাবে আঘাত করো যাতে মেয়েটি দুভাগে ভাগ হয়ে যায়।

প্রহরী ঋষির নির্দেশ বুঝতে পেরে সুলতানের দিকে তাকালো। কারণ সুলতানের নির্দেশ ছাড়া তার পক্ষে কিছু করার অবকাশ ছিলো না। সুলতান চোখের ইশারায় বললেন, ঋষি যা বলছে করো।

প্রহরী তরবারী কোষমুক্ত করে পূর্ণশক্তিতে আঘাত করলো। কিন্তু কিছুই কাটলো না। তরবারীর আঘাতে শুধু কাপড়টি গিয়ে তরবারী সাথে মাটিতে ঠেকলো। অবাক করার মতো তরুণীর দেহাবয়বের কোন অস্তিত্ব চাদরের ভেতরে ছিলো না।

এই অবস্থা দেখে বিস্ময়ে প্রহরীর চোখমুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। কিন্তু সুলতান তা দেখে মুচকি হাসলেন।

এখানে কোন দেহ ছিলো না। বললো ঋষি। এটি ছিলো আত্মা। তরবারী দিয়ে আপনি দেহ কাটতে পারেন কিন্তু আত্মা দেহাতীত, আত্মাকে কাটা যায় না। মহামান্য সুলতান! আপনি যদি চান তাহলে অল্প সময়ের জন্যে আমি আপনাকেও আত্মার জগতে পাঠিয়ে দিতে পারি, যেখান থেকে এই তরুণীর রূহ এসেছে।

ঐতিহাসিক ইবনুল জাওযী ও ইবনে যফির তৎকালীন দু'জন ঐতিহাসিকের বর্ণনা উল্লেখ করে লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ একবার তার আধ্যাত্মিক গুরু শায়খ আবুল হাসান কিরখানীর দরবারে উপস্থিত। শায়খ তাকে বললেন, হিন্দুস্তান যাদুগীর ও সাধু সন্ন্যাসীদের স্বর্গভূমি। এমন যেনো না হয় যে, আপনার

যেসব সেনাপতি ও কর্মকর্তা হিন্দুস্তানের বিজিত এলাকায় বসবাস করে তারা যাদুগীর ও সাধু সন্ন্যাসীদের হাতে বন্দী হয়ে পড়ে। হিন্দুরাও ইহুদী খ্রিস্টানদের মতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সুন্দরী ললনাদের ব্যবহার করে। মাকড়সা যেমন মশা মাছিকে তার জালের ফাঁদে আটকে হত্যা করে হিন্দুরাও সুন্দরী রূপসীদের ফাঁদে ফেলে মুসলিম ক্ষমতাবানদের নিঃশেষ করে ফেলে।

সুলতান মাহমূদ নিজেও ছিলেন তীক্ষ্ণধী আলেম। আলেমদের সাথে ছিলো তার গভীর সখ্য ও হৃদ্যতা। তিনি নিজেও হিন্দুস্তান সম্পর্কে গভীর পড়াশোনা করেছেন। তাছাড়া অসংখ্য যুদ্ধে হিন্দুস্তানের বহু শিক্ষিত লোককে যুদ্ধবন্দী করে তিনি গযনী নিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের কাছ থেকেও প্রচুর তথ্য তিনি আত্মস্থ করেন। হিন্দুস্তানীদের অনেক যাদুটোনার ক্ষমতা ও যোগীদের সাধনার ফলাফল দেখে তিনি বিস্ময়াভিভূত হতেন। বিশ্বাস করাই কঠিন হতো কোন মানুষ এতোটা ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে! তিনি হিন্দুস্তানী যোগীদের সাধনার এমন ঘটনাও শুনেছেন, কোন কোন যোগী নাকি আধা ঘন্টা পর্যন্ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিয়ে সারা শরীরের রক্তপ্রবাহ ও হৃদকম্পন স্তব্ধ করে দিতে পারে। দীর্ঘ সময় পরে আবার দেহে প্রাণ ও হৃদকম্পন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। যোগবাদ প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরনো সাধনা। যোগীরা যোগবাদ দিয়ে অসুস্থ মানুষকে যেমন সুস্থ করতে পারে আবার সুস্থ লোককেও অসুস্থ বানিয়ে ফেলতে পারে।

ঋষি তরুণীকে দৃশ্যত গায়েব করে দিয়ে সুলতানকেও কিছুক্ষণের জন্য আত্মার জগতে পাঠানোর উদ্দেশ্যে তার দিকে অগ্রসর হলো। সুলতান মুচকি হেসে হাতের ইশারায় তাকে থামতে বললেন। ঋষি তাতেও না দমলে এক প্রহরী ঋষিকে ধরে থামিয়ে দিল। এ সময় দুভাষী ঋষিকে বললো, সুলতানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ শোভনীয় নয়।

সুলতান দু'ভাষীর উদ্দেশ্যে বললেন, ঋষিকে বলে দাও, সে তো সামান্য সময়ের জন্য আমাকে রূহের জগতে পাঠাতে পারে কিন্তু আমি সব সময়েই রূহের জগতে বিচরণ করতে পারি। আর এই তরবারী দিয়ে যদি আমি ঋষির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি তবে ঠিকই তরুণীর দেহ দৃশ্যমান হয়ে যাবে। তাকে বলে দাও, এক্ষুণি যেন তরুণীকে দৃশ্যমান করে। আমি এখানে যোগীদের খেলা দেখতে আসিনি।

এরপর বৃদ্ধ ঋষি তরুণীর উড়নাটি দু'হাতে নিয়ে একটি ঝাড়া দিয়ে দু'হাত প্রসারিত করলে চাদরটি দীর্ঘায়িত হলো আর তরুণী এর আড়াল থেকে দৃশ্যমান

হয়ে উঠলো। তরুণীর চোখে মুখে আবেশমাখা। সুলতান ঋষিকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে যেতে প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন। প্রহরীরা ঋষিকে ধরে তাঁবুর বাইরে নিয়ে গেলো।

ঋষিকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে যাওয়ার পর সুলতান দুভাষীর মাধ্যমে তরুণীকে জিজ্ঞেস করলেন, এই বুড়ো কেন তোমাকে নিয়ে এখানে এসেছে, তা পরিষ্কার বলে দাও। যদি না বলো, তাহলে তোমাকে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে।

তরুণী একথা শুনে দীর্ঘ সময় সুলতানকে পর্যবেক্ষণ করলো এবং কিছুটা বিস্ময় ও আতঙ্কভাব তার চেহারায় ফুটে উঠলো। অতঃপর বললো–

আমাকে বলা হয়েছে, আপনি মুসলমানদের বাদশা...। আপনি কেমন বাদশা? আমাকে হাতে পেয়েও আপনি আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন; অথচ আমি এমন এক তরুণী যাকে হাত ছাড়া করতে চায় না কোন রাজা-মহারাজা। আপনি জানেন না, আমি রাজা মহারাজাদের কাছে কি মূল্যবান রত্ন?

দেখো, আমি যে জন্যে সোমনাথ আক্রমণ করেছি এ সম্পর্কে আমি মোটেও অসতর্ক নই। আমি জানি আমার মিশন কিভাবে সফল করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে কি কি বাধা বিপত্তি আসতে পারে। তরুণীর উদ্দেশ্যে বললেন সুলতান।

আমি তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি, এই বুড়োকে কি পাঠানো হয়েছে, না সে নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছে? তোমার রূপ সৌন্দর্য আর তোমার রূপের কূটনীতিতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। হিন্দু রাজাদের মতো আমরা মদ-নারীতে আসক্ত নই। আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না। তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও, তাহলে তোমাকে সসম্মানে ফেরত পাঠানো হবে।

তরুণী দুভাষীর দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি বাইরে চলে যান। দুভাষী সুলতানকে বললো, তরুণী আমাকে বাইরে চলে যেতে বলছে।

একথা শুনে সুলতান রাগত ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি যদি এখানে মরতে এসে থাকো, তাহলে এক্ষুণি আমি তোমার মৃত্যুর ব্যবস্থা করছি। তবে এই মৃত্যু তরবারীর আঘাতে হবে না, তোমার দু'পা দু'টি ঘোড়ার সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে আর ঘোড়াকে দুর্গ ফটকের দিকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। দুর্গ ফটক পর্যন্ত যাওয়ার আগেই তোমার দেহ দুভাগ হয়ে যাবে আর হাড় থেকে মাংস খসে খসে পড়বে।

একথা দুভাষীর মাধ্যমে শোনার পর তরুণী আতঙ্কিত হয়ে পড়লো এবং বললো, তাকে সোমনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহারাজার কাছে নিয়ে যায়, মহারাজা তাকে এই বৃদ্ধ ঋষির সাথে আসতে এবং তার নির্দেশ মেনে চলার হুকুম করেন। আমাকে বলা হয়েছে, তোমরা যদি গযনী সুলতানের তাঁবু পর্যন্ত যেতে পারো তাহলে ঋষি ঋষির কাজ করবে, তোমার কাজ হবে রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে নিজেকে সুলতানের জন্য মেলে ধরা। সুলতান যেহেতু পুরুষ তাই সে নিশ্চয়ই মদ ও নারীভোগ করে থাকে। সুলতানকে রূপের যাদুতে আটকে তার পানীয়ের মধ্যে আংটির টোপের ভেতরের বিষয় মিশিয়ে দেবে। তরুণীর ডান হাতের মধ্যমায় একটি স্বর্ণের দৃষ্টিনন্দন আংটি ছিলো। সে এটির টোপ খুলে দেখালো এর ভেতরে সামান্য তুলা আছে, যাতে রয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিষ। এই বিষই সুলতানের পানীয়ের মধ্যে মেশানোর কথা ছিলো।

দুর্গের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে সে বললো, মন্দিরে এক দিকে চলছে নর্তকীদের নাচ ও আরাধনা আর অপর দিকে পুরোহিত পণ্ডিতেরা মন্দিরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নর্তকী ও সেবাদাসীদের নিয়ে তাদের সাথে পাশবিকতায় মেতে উঠেছে; আর বলছে, শিবদেব তোমাদের ইজ্জতের নজরানা চাইছেন। অধিবাসীদের সম্পর্কে তরুণী বললো, প্রতিটি নাগরিকই শহর ও মন্দির রক্ষার জন্যে তাদের জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত কিন্তু দুঃসাহসী হলেও তাদের মধ্যে এখন আতঙ্কও বিরাজ করছে।

আমি এই মন্দিরের সবচেয়ে দামী সেবিকা। আমাকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। দেখতেও আমি সবচেয়ে সুন্দরী। সাধারণ হিন্দুরা এই মন্দির, পণ্ডিত ও আমাকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে। কিন্তু আমি জানি এই মন্দির, সেবাদাসী ও পুরোহিত পণ্ডিতেরা কতোটা পবিত্র। আমার কোন রীতি ধর্ম নেই। আপনি আমাকে যৌনদাসীরূপে গ্রহণ করুন। এ মুহূর্তে আপনার কাছে এটাই আমার প্রত্যাশা ও নিবেদন। আমি জীবন দিয়ে আপনার সেবা করবো কারণ প্রভুর সেবা ও মনোরঞ্জন আমার ধর্ম। আমার আর কোন ধর্ম নেই।

সুলতান মাহমূদ তরুণীর সাথে কথা আর দীর্ঘ না করে বৃদ্ধ ঋষিকে তাঁবুর ভেতরে ডেকে এনে বললেন, আমি বিগত পঁচিত বছর ধরে হিন্দুস্তানে আসা যাওয়া করছি। তুমি কি বুঝতে পারোনি, আমি হিন্দুস্তানের যোগী সন্ন্যাসীদের যাদুটোনা ও যোগসাধনা সম্পর্কে অনবহিত নই। আমি তোমাদের মতো মাটির নিষ্প্রাণ মূর্তির পূজারী নই ঋষি! আমি একটি পবিত্র ধর্মের অনুসারী। আমরা ধর্ম

ও রাজত্ব রক্ষার্থে আমাদের মা বোনদের ইজ্জতের সওদা করি না বরং যে কোন নারীর সম্ভ্রম রক্ষার্থে আমরা জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। আমরা তোমাদের মতো আমাদের তরুণীদের উলঙ্গ করে নাচাই না এবং শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করতে মা-বোনদের শত্রু শিবিরে প্রেরণ করি না।

কার ধর্ম সত্য আর কোন ধর্ম অসত্য আমি এখানে এই নিয়ে বিতর্ক করতে আসিনি সুলতান! দৃঢ়কণ্ঠে বললো ঋষি। আমাদের মেয়েরা ধর্মের জন্য নিজেদের জীবন ও ইজ্জত কুরবান করে দেয় এটা আমাদের ধর্মের শিক্ষা। আপনার চেয়ে আমার বয়স ঢের বেশী সুলতান। আপনি আপনার সেনাবাহিনীর দিকে তাকিয়ে দেখুন না, তারা প্রত্যেকেই কি আপনার মতোই ঈমানদার? আপনি কি তাদের ঈমান রক্ষার জন্য সব সময় তাদের পাশে থাকবেন?

আপনার অবর্তমানে ঠিকই আমাদের তরুণীরা আপনার সেনাদের ঈমান তাদের রূপ জৌলুসে কিনে নেবে।

আমি যে উদ্দেশ্যে এসেছিলাম, আমার পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। তাই জীবনের শেষ লগ্নে আপনাকে কিছু সত্য কথা বলে দিচ্ছি। আপনি একদিন থাকবেন না, কিন্তু আমাদের তরুণীরা থাকবে, তারা ঠিকই ইজ্জতের বিনিময়ে আপনার লোকদের দাসে পরিণত করবে। কারণ তাদেরকে আমরাই এ শিক্ষা দিয়ে থাকি। আপনি আমাকে হত্যা করে ফেলুন, এই তরুণীকেও মেরে ফেলুন বা আপনার যৌনদাসী রূপে রেখে দিন। একথা বাস্তব, হিন্দুরা ভারত মাতার কোলে ইসলামের উত্থান ঠেকাতে যা যা করণীয় এর সবকিছুই করবে। এক সময় ঠিকই ভারতের সীমানা থেকে ইসলাম বিতাড়িত হবে।

সুলতান মাহমূদ বৃদ্ধ ঋষির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তার মধ্যে না ছিলো ক্ষোভের লক্ষণ না ছিলো উদ্বেগ। তিনি স্মিত হাসছিলেন। বৃদ্ধ ঋষি বললো, মৃত্যুর আগে আমি আপনাকে মহারাজা রায়কুমারের একটি প্রস্তাব পেশ করছি। মহারাজা রায়কুমার বলেছেন, আপনার যতো ধন- দৌলত সোনা দানা ও এমন সুন্দরী দরকার সবই আপনার তাঁবুতে পৌঁছে দেয়া হবে যদি আপনি যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে ফিরে যান। আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি, আপনার ফিরে যাওয়ার পথে আমাদের কোন সেনা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। যদি আমার প্রস্তাব আপনার মনোপুত না হয় তবে আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে আরো তিন মহারাজার সৈন্যসামন্ত এখানে এসে পৌঁছে যাবে, তারা আপনাদের উপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে, তখন হিন্দু সমরশক্তি ও সোমনাথের মাঝখানে আপনি দু'দিকের

আক্রমণে ফেঁসে যাবেন। তখন হয়তো আপনার বাহিনীর কি পরিণতি হয়েছিলো এ খবরটি গযনীবাসীকে জানানোর জন্যেও আপনার কোন সেনা জীবন নিয়ে পালাতে পারবে না।

চুপ কর! হিন্দুস্তানের কুত্তা...! ভাবভঙ্গিতে ঋষির কথা অনুধাবন করে গর্জে উঠলো এক প্রহরী এবং সে উত্তেজিত হয়ে তরবারী বের করে ফেললো।

সুলতান মাহমূদ হাতের ইশারায় প্রহরীকে শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, 'আরে! একি করছো তুমি! এই বৃদ্ধ আমাদের বন্দী নয়, মেহমান। সে রাজার দূত হয়ে এসেছে।

সুলতান ঋষিকে বললেন, মাফ করবেন জনাব, আমার এই সৈনিক আপনার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে, এজন্য আমি আপনার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।

আমাদের কোন মহারাজার সামনে যদি এমন গোস্তাখী করা হতো, তাহলে এমন ঔদ্ধত্যের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হতো। বললো বৃদ্ধ ঋষি।

'আমরা এ মুহূর্তে আমাদের মহান প্রভু আল্লাহর দরবারে রয়েছি, বললেন সুলতান। এখানে কেউ কারো প্রভু কিংবা প্রজা নয়। তাই কেউ কাউকে হত্যা করার অধিকার রাখে না। এই সৈন্যরা আমার নির্দেশে এখানে আসেনি, আল্লাহর নির্দেশে এসেছে। আমাকে শুধু এদের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমি তাদের আবেগ, ক্ষোভ ও উল্লাসকে শিকল বন্দী করতে পারি না।

একথা বলতে বলতে সুলতান দাঁড়িয়ে এক প্রহরীকে বললেন, এই বৃদ্ধ ও তার সঙ্গী তরুণীকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে দুর্গের প্রধান ফটকের কাছে পৌঁছে দিয়ে আস। যাওয়ার সময় সুলতান ঋষির উদ্দেশ্যে বললেন, রাজাকে গিয়ে বলবেন, সোমনাথকে একটি নষ্ট নর্তকী আর এক বুড়ো যোগী ও কিছু সোনাদানার বিনিময়ে রক্ষা করা যাবে না। আমরা এখান থেকে জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে আসিনি। ঋষি বাবু, আপনার এই নষ্টা মেয়েটিকে নিয়ে যান।

বৃদ্ধ ঋষি দীর্ঘক্ষণ এক পলকে সুলতানের দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে সুলতানের ডান হাত ধরে চুমু খেয়ে বললো– আমি দিব্যি সুলতানের বিজয় দেখতে পাচ্ছি। একথা শেষ করেই সে দ্রুত মেয়েটিকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল।

* * *

সোমনাথের বিজয়ের ঘটনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করলে হাজার পৃষ্ঠা লেগে যাবে। হিন্দুরা জীবন সম্পদ করার পাশাপাশি চক্রান্তমূলক বহু অপচেষ্টা করেছে গযনী বাহিনীর সেনাদের বিভ্রান্ত করতে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ যুদ্ধে গযনী সেনারা যে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা ইতিহাসে বিরল। এছাড়া সুলতান মাহমূদের সোমনাথ অভিযানের তুলনা ইসলামের ইতিহাসের দু'একটির সাথে তুলনা করা চলে। মহাভারতের ইতিহাসে এটি ছিলো একটি অতুলনীয় স্মরণীয় যুদ্ধ। কিন্তু হিন্দু-ঐতিহাসিকগণ এই যুদ্ধকে গুরুত্বহীন করতে খুব কাটছাট করে তা বর্ণনা করেছেন।

যে রাত সুলতানের কাছে বৃদ্ধ ঋষি এসেছিলো, সুলতান মাহমূদের জীবনে সেই রাতটি ছিলো একটি স্মরণীয় রাত। তার কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছিলো, ইতোমধ্যে দুই হিন্দু মহারাজার সৈন্য মুসলিম বাহিনীকে ঘেরাও করার জন্যে অগ্রসর হচ্ছে। সুলতান সারারাত তার কমান্ডার ও সেনাদেরকে দুর্গ প্রাচীরে কার্যকর হামলার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

সুলতান বাইরের আক্রমণ আশঙ্কায় আগেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু তিনি অবাক হলেন, এই দুইটি বাহিনী এতোটা নীরবে কি করে এতোটা কাছে পৌঁছে গেলো!

সুলতান তার দূরদর্শিতায় হিন্দুদের আক্রমণ কৌশল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈকে বললেন, এখন হামলা করবেন না, আমদের পেছন দিক থেকে যখন আক্রমণ হবে তখন ভেতরের সৈন্যরা ফটক খুলে বেরিয়ে এসে আমাদের উপর আক্রমণ করবে, আপনি দু'বাহুকে যথাসম্ভব ছড়িয়ে দিন। ফটক খুলে যেতেই ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করতে হবে।

পিছন দিক থেকে আসা দু'মহারাজার সেনাদের মধ্যে এক দলের নেতৃত্বে ছিলেন মহারাজা পরমদেব। কোন কোন ঐতিহাসিক তার নাম ভ্রম্মদেব লিখেছেন আর অপরজন ছিলেন দেবআশ্রম।

পিছন দিকের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে যে সেনা ইউনিট সুলতান মাহমূদ নিয়োগ করেছিলেন, তার নেতৃত্বে ছিলেন সেনাপতি আবুল হাসান। এক পর্যায়ে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে সুলতান তাদের কাছে পৌঁছলেন। তখন অবস্থা খুব সঙ্গীন। সুলতান সেনাপতিকে বললেন, মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়িয়ে দুই বাহু দিয়ে আক্রমণ করো। সুলতান একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তখন উভয় দিকে সৈন্যরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে গেছে।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে অশ্বারোহী সৈন্যের ঘোড়া। গযনী সেনাদের নারায়ে তাকবীরে জমিন কাঁপছে।

এদিকে হামলা হতেই সোমনাথ দুর্গের প্রধান ফটক খুলে গেলো। বহু সংখ্যক সেনা দুর্গ থেকে বের হয়ে অবরোধকারীদের উপর একসাথে হামলে পড়লো। এবার হিন্দুরা নয় গযনী সেনারা ঘেরাও হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সুলতানের চেহারা মলিন হয়ে গেল। কারণ উভয় রাজার সৈন্যরা তাদের বাহুতে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলো। দ্রুতই তারা কৌশল বদল করে নিতে সক্ষম হলো।

অবস্থা এমন হলো যে, এটাকে কোন গতানুগতিক যুদ্ধ বলার অবকাশ ছিলো না। রীতিমতো একটা ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ। উভয় দিকের সৈন্যরাই হতাহত হচ্ছিল। জীবন দিতে আর জীবন নিতেই যেনো উভয় সেনাদল মরিয়া হয়ে পড়লো। অবশ্য প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ এমন অবস্থাতেও সাফল্যের সাথেই দুর্গ থেকে আসা হিন্দুসেনাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করছিলেন। এভাবে চলে গেলো দিনের অর্ধেক। সুলতান দেখলেন তার কোন চালই আশানুরূপ ফলপ্রসূ হচ্ছে না। দৃশ্যত গযনী বাহিনীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। কারণ হিন্দু সেনারা একেতো তাজাদম তদুপরি তারা নিত্য নতুন সৈন্য দিয়ে ঘাটতি পূরণ করে নিচ্ছে।

যুদ্ধের অবস্থা যখন চরম হতাশাজনক ঠিক এমন সময় সুলতান লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নীচে নেমে দু'রাকাত নফল নামায পড়লেন। এমনটি তিনি এবারই প্রথম করেননি। আরো বহু বার করেছেন এবং নামাযের পরই যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে যেতে দেখা গেছে। এবারও তিনি দু'রাকাত নামায পড়লেন। নামাযে তার দু'চোখ গড়িয়ে পড়লো অশ্রু। সেনাপতি আবুল হাসান তার কাছেই দাঁড়ানো। সুলতান নামায শেষ করে সেনাপতি আবুল হাসানের হাত ধরে উচ্ছাসের সাথে বললেন, "আবুল হাসান! বিজয় আমাদের!" তিনি আবুল হাসানকেও অশ্বারোহণ করার কথা বলে গযনী বাহিনীর পতাকা আরো উঁচু করে ধরার নির্দেশ দিয়ে নিজে সাধারণ সৈনিকের মতোই লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে গেলেন। সেনারা তখন চিৎকার দিয়ে একে অপরকে জানিয়ে দিলো, গযনীর যোদ্ধারা! সুলতান নিজে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছেন, এগিয়ে যাও, মুশরিকদের কেটে ফেলো।

অন্যান্য যুদ্ধের মতো সুলতান হাতে তরবারী নেয়ার পর যুদ্ধের কায়া বদলে গেল। ঐতিহাসিক ফারিশতা লিখেছেন, সুলতান মাহমূদের নেতৃত্বের এই হামলা এতোটাই ভয়াবহ ছিলো যে, অল্পক্ষণের মধ্যে দুই রাজার সৈন্যদের মধ্যকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং গযনীর কিছু সংখ্যক যোদ্ধা উভয় রাজার রক্ষণভাগে আক্রমণ করে তাদের ঝাণ্ডা গুড়িয়ে দিলো। ফলে উভয় রাজা জীবন বাঁচাতে রণাঙ্গন ছেড়ে পালালো। এরপর শুরু হলো উভয় রাজার সৈন্যদের কচুকাটা। কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচ হাজার হিন্দু সৈন্যের মরদেহ গযনী সেনাদের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হতে লাগলো। কিছু সংখ্যক হিন্দু সেনা পালানোর চেষ্টা করলো কিন্তু গযনীর সিংহশাবকেরা তাদের পালাতে দিলো না। তরবারীর আঘাতে সবাইকে ধরাশায়ী করে ফেললো।

****

যুদ্ধরত অবস্থাতেও সুলতানের কাছে প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহর দুর্গ থেকে আসা হিন্দুদের মোকাবেলার পুনঃপুনঃ রিপোর্ট আসছিলো। এদিকের যুদ্ধ শেষ হলে সুলতান আবু আব্দুল্লাহর কাছে খবর পাঠালেন, তুমি যুদ্ধ করতে করতে ওদের না বুঝতে দিয়ে পিছিয়ে এসো। প্রধান সেনাপতি এই কৌশল অবলম্বন করলে সোমনাথ দুর্গের সৈন্যরা গযনী বাহিনীর উপর চাপ বৃদ্ধি করার লোভে অনেক খানি এগিয়ে এলো। এ পর্যায়ে সুলতান সেনাপতি আবু হাসানকে নির্দেশ দিলেন, তুমি দুর্গপ্রাচীর থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে হিন্দুদের উপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করো। তখন দুর্গের ফটক বন্ধ ছিল।

গযনী বাহিনী যখন হিন্দুদের উপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করল, তখন তারা জানতে পারলো তাদের সহায়তার জন্যে রাজা ব্রহ্ম ও রাজা দেবআশ্রমের নেতৃত্বে যে দুটি সেনাদল এসেছিলো তাদের সবাই নিহত হয়েছে এবং তারা এখন গযনী বাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে রয়েছে। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে হিন্দুদের মনোবল ভেঙ্গে গেল। ঝিমিয়ে পড়লো তাদের আক্রমণের তেজ। তখন হিন্দু সেনারা আত্মরক্ষার লড়াইয়ে লিপ্ত হলো এবং পিছিয়ে এসে দুর্গে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু গযনীর সেনারা তাদের পিছনে সরে যাওয়ার অবকাশ দিলো না। সামনে যাওয়া মাত্রই কচুকাটা করছিলো।

অপরদিকে গযনীর একদল প্রশিক্ষিত সৈনিক দুর্গ প্রাচীর ও ফটক ভাঙ্গার কাজে লেগে গেল। যেসব হিন্দু দুর্গপ্রাচীরের উপরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের অবস্থা

পর্যবেক্ষণ করছিলো এরা চিৎকার শুরু করে দিলো, সোমনাথের সব সেনা মারা গেছে। মুহূর্তের মধ্যে সারা শহরে এখবর ছড়িয়ে পড়লো। এ খবর শুনে যেসব সেনা দুর্গের ভেতরে ছিল তারা দুর্গের পেছন তথা সমুদ্রপাড়ের ফটক খুলে নৌকা করে পালাতে শুরু করে দিলো। এ খবর সুলতান মাহমূদের কানে পৌঁছলে তিনি বললেন, ওপাশের সেনা ইউনিট যেন নৌকা কব্জা করে ওই ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে।

নির্দেশ পৌঁছা মাত্রই ওইপাশে কর্তব্যরত সেনা ইউনিট কিছু নৌকা কব্জা করে পলায়নপর হিন্দুসেনাদের উপর তীর বর্ষণ শুরু করলো আর কিছু সেনা নৌকায় আরোহণ করে সমুদ্রের দিকের ফটকে পৌঁছে গেল। ফটক ছিলো খোলা এবং সেখানে কোন নিরাপত্তারক্ষী ছিলো না। ফলে বিনা বাধায় তারা দুর্গে প্রবেশ করলো।

এদিকে তখন প্রধান দুই ফটক খুলে ফেলা হয়েছে। কারো কারো মতে শহরের চোরা গলিতে গযনী সেনাদের নাস্তানাবুদ করার জন্যে হিন্দুরাই দুর্গ ফটক খুলে দিয়েছিলো।

বস্তুত দুর্গে তখন গযনী সেনারা দলে দলে ঢুকে পড়েছে। শহরের অধিবাসীরা তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সবাই কাটা পড়ছে। শহরের হিন্দুরা উপর থেকে তীর ছুঁড়ে অনেক গযনী সেনাকে আহত করেছে। বহু হিন্দু মহিলা ছাদের উপর থেকে গযনী সেনাদের উপর পাথর ছুঁড়ে হতাহত করেছে। এই অবস্থা দেখে কিছু সেনা কয়েকটি বাড়ি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলে হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে প্রতিরোধের আশা ত্যাগ করে আত্মরক্ষার জন্যে ছুটাছুটি শুরু করে। শহরের লোকদের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে সোমনাথের সকল প্রতিরোধ যোদ্ধা নিহত হয়েছে। যারা দুর্গের ভেতরে ছিলো তারাও সমুদ্র পথে পালিয়ে গেছে। এ খবর শোনার পর সাধারণ হিন্দুদের প্রতিরোধ যুদ্ধ থেমে যায়। তারা পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে যে যার মতো করে জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধ থেমে যায়।

এ যুদ্ধে সোমনাথ ও বাইরে থেকে আসা যোদ্ধারা মিলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দু নিহত হয়। প্রায় চার হাজার হিন্দু সমুদ্রপথে পালাতে চেষ্টা করে কিন্তু তাদের অনেকেই তীরাঘাতে নিহত হয়। কেউ সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ে মারা যায়। নৌকা উল্টে অনেকের সলিল সমাধি ঘটে।

১০২৬ সালের ৯ জানুয়ারি ৪১৭ হিজরী সনের ১৬ যিলহজ্জ সোমনাথ মন্দির সুলতান মাহমূদের করতলগত হয়।

* * *

বিজয়ী সুলতান সোমনাথ মন্দির এবং মন্দিরের কারুকার্য দেখে অভিভূত হন। তখনকার সোমনাথ মন্দির ছিলো ভারতীয় স্থাপত্য শৈলীর অনুপম নিদর্শন। সোমনাথ মন্দিরের সিঁড়িতে হাজারো পুরোহিত পণ্ডিত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। সুলতান পণ্ডিতদের এমন অবস্থা দেখে দুভাষীর মাধ্যমে বললেন, ওদেরকে বলো হাত গুটিয়ে নিতে, আমি সোমনাথের মূর্তি নই। এদের বলে দাও, তাদের উপর কোন অত্যাচার করা হবে না।

সুলতান মন্দিরের সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে উঠতে এক প্রহরীকে একটি সামরিক অস্ত্রভাণ্ডারের কুড়াল আনার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি মন্দিরের মূলবেদিতে আরোহণ করে মন্দিরের প্রধান শিবমূর্তির নাক ভেঙ্গে ফেললেন। সেনাদের নির্দেশ দিলেন, এই মূর্তিটিকে ভেঙ্গে ফেলো। সমবেত হাজার হাজার পণ্ডিত পুরোহিত আর্তচিৎকার করে উঠলো। শীর্ষস্থানীয় পুরোহিতেরা সুলতানের কাছে শিবমূর্তি না ভাঙ্গার জন্যে অনুরোধ করলো। তারা সুলতানের পায়ে পড়ে নিবেদন করলো, মন্দিরের সকল গোপন ভাণ্ডার আমরা আপনার পায়ে লুটিয়ে দেবো, দয়া করে এই শিবমূর্তি ও মন্দির অক্ষত রাখুন।

সুলতান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তাদের বললেন, গযনীর হাজার হাজার মায়ের বুক খালি করে এবং বোনকে বিধবা ও শিশুকে এতিম করে আমি এখানে সওদা করতে আসিনি। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, সুলতানের দুই সেনাপতিও তার বড় ছেলে মাসউদ পণ্ডিতদের আবেদন মেনে নেয়ার জন্য সুলতানকে প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সুলতান তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, তোমরা কি আমার আখেরাত বরবাদ করে দেয়ার চেষ্টা করছো? আমি চাই, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমাকে ডেকে বলুন, সবচেয়ে বড় মূর্তি সংহারী কোথায়? তাকে হাজির করো। আল্লাহ তাআলা যেন এভাবে না ডাকেন, সোনাদানার বিনিময়ে যে মূর্তিপূজারীদের মূর্তিদান করেছিলো সেই ব্যবসায়ী মাহমূদকে আমার সামনে হাজির করো। এই আহ্বানকে আমি ভয় পাই। ইতিহাস আমাকে মূর্তিপূজা সহায়ক না বলে মূর্তি সংহারী বলে অভিহিত করুক, এটা কি ভালো নয়?

সুলতান নির্দেশ দিলেন, শিবমূর্তির দু'টুকরো গযনী যাবে। একটি আমার বাড়ির সামনে রাখা হবে আর অপরটি রাখা হবে গযনী জামে মসজিদের সামনে। আর অন্য দুটি অংশ মক্কা মদীনায় পাঠানো হবে। অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন, সুলতানের নির্দেশ মতো শিবমূর্তির চারটি টুকরো সেভাবেই পাঠানো হয় এবং তা আজো সেভাবেই সংরক্ষিত আছে।

শিবমূর্তিকে ভেঙ্গে মন্দিরের বাইরে নিয়ে এলে সোমনাথ মন্দিরের কারুকার্যময় সেগুন কাঠের গায়ে দাহ্যপদার্থ ছিটিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। মুহূর্তের মধ্যে মহাভারতের হিন্দুদের গর্ব ও ঐতিহ্যের চন্দ্রদেবতার দেবালয় আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠলো। বিশাল অগ্নিকুণ্ডলী ধোয়া আর পোড়ার শব্দে হিন্দুদের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ছাইভস্মে পরিণত হলো। যে দেবতারা ছিলো হিন্দুদের মতে জীবনমৃত্যুর মালিক তারা আজ নিজের অস্তিত্বকেই রক্ষা করতে পারলো না।

সোমনাথের মহারাজা রায়কুমার ছিলেন নিখোঁজ। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। সুলতান মাহমূদের সেনারা মন্দির থেকে যেসব সোনাদানা মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছিলো বর্তমানের মূল্যে তা কয়েকশ হাজার কোটি টাকা মূল্যমান ছিলো।

মন্দির যখন জ্বলছিল, সুলতান তখন দুর্গ প্রাচীরে উঠে একটি বুরুজে দাঁড়িয়ে চারদিকের দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। শহরের বহু জায়গা থেকে আগুনের কুণ্ডলী উঠছে। দলে দলে হিন্দু অধিবাসী ফটক গলে শহর ছেড়ে যাচ্ছে। তাদেরকে কেউ বাধা দিচ্ছে না। চতুর্দিকে রক্ত আর রক্ত। শহরের বাইরে শুধু লাশ আর লাশ। চারদিকে রক্ত আর লাশের স্তূপ। দুর্গের বাইরে অনেক আহত লোক উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, কেউ কেউ মাথা উঁচু করে আবার পড়ে যাচ্ছে। আহতরা সবাই হিন্দু সেনা। তাদের সেবা তো দূরে থাক, যারা শহর ছেড়ে যাচ্ছে, তারা আহত সেনাদের তাকিয়ে দেখারও প্রয়োজন বোধ করছে না।

গযনী সেনারা সহযোদ্ধাদের লাশগুলো উঠিয়ে এনে এক জায়গায় জড়ো করছে আর আহতদের তুলে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে। সুলতান মাহমূদের দৃষ্টি রণাঙ্গনের চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করছিলো। না জানি তার মনের মধ্যে কি ভাবনা তখন বিরাজ করছিল। তিনি দেখতে পেলেন, দুর্গের ফটক পেরিয়ে দলে দলে হিন্দু নারীপুরুষ ছেলে বুড়ো কন্যা জায়া দুঃখভারাক্রান্ত মনে দুর্গ ছেড়ে

যাচ্ছে। এই অবস্থা দেখে তিনি পাশে দাঁড়ানো একসেনা কর্মকর্তাকে বললেন, নীচে গিয়ে দুর্গ ফটকে ঘোষণা করে দাও, গযনীবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে কোন শহরবাসীকে শহর ছেড়ে যেতে হবে না। সাধারণ নাগরিকদের উপর গযনী বাহিনী কোন জুলুম করবে না। এ সময় সুলতান আপন মনেই স্বগোতোক্তি করলেন– এরা কি এখনো বুঝতে পারেনি, জয় পরাজয় জীবনমৃত্যুর মালিক এসব পাথুরে মূর্তির হাতে নয় লা শারিক আল্লাহর হাতে? তার একথার কোন জবাব কারো মুখে উচ্চারিত হলো না।

সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা শাখা স্থানীয় কয়েকজনকে গোয়েন্দা বিভাগে নিয়োগ দেয়। তারা জানায়, যেসব সেনা গযনী বাহিনীর উপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করেছিলো, তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলো রাজা পরমদেব। এই আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে গযনী বাহিনীর তিনহাজার সেনাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। স্থানীয় গোয়েন্দারা জানালো, সোমনাথ থেকে একশ বিশ মাইল উত্তরে গন্দভী নামক স্থানে রাজা পরমদেবের রাজধানী অবস্থিত। গন্দভী চারদিক থেকে সাগর বেষ্টিত।

এই আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমূদ এতোটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তিনি তাৎক্ষণিক গন্দভী অভিযানের নির্দেশ দিলেন। সুলতান সেখানে পৌঁছে দেখলেন, গন্দভী দুর্গে পৌঁছা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ চতুর্দিকেই অথৈই পানি। অবশ্য একপাশে পানি কিছুটা কম। আরো খবর পাওয়া গেলো, পরমদেব নিজেই নিজেকে দুর্গবন্দী করে রেখেছে।

আবুল কাসিম ফারিশতা লিখেছেন, একরাতে সুলতান মাহমূদ কুরআন কারীম তেলাওয়াত করলেন। কিছু বিশেষ আয়াত পাঠ করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে সাহায্যের জন্য মোনাজাত করলেন। পরদিন সকালে দেখা গেলো, সমুদ্রের পানি অনেক কমে গেছে। যেদিকে পানি কমছিল সেদিকের এলাকাটিতে পানি নেই বটে, কিন্তু অনেক কাদা। সুলতান তার সেনাদেরকে কাদার মধ্য দিয়ে অভিযানের নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও সেনাদের সাথে দুর্গের কাছে পৌঁছে গেলেন।

গযনী বাহিনী দুর্গে আক্রমণ পরিচালনার কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্গফটক খুলে গেল। দুর্গে প্রবেশ করে জানা গেল, রাজা পরমদেব সমুদ্রপথে পালিয়ে গেছেন। গন্দভীর হিন্দু সেনারা সোমনাথ যুদ্ধে গযনী বাহিনীর ভয়ঙ্কর আক্রমণে বিপর্যস্ত

হয়ে হাজার হাজার সহযোদ্ধাকে হারিয়ে মাত্র কিছুসংখ্যক প্রাণ নিয়ে গন্দভীতে পালিয়ে আসতে পেরেছিল। এরা এমনিতেই ছিলো হতোদ্যম হীনবল। তারা প্রতিরোধের কোন চেষ্টা না করেই আত্মসমর্পণ করলো। সুলতান গন্ধভী দুর্গ লোকশূন্য করার নির্দেশ দিলেন।

সুলতান এ দুর্গে কিছুদিন অবস্থান করলেন। জায়গাটি ছিলো বর্তমান গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত। এখানকার আবহাওয়া ছিলো খুবই স্বাস্থ্যকর এবং পরিবেশ খুবই মনোমুগ্ধকর। সুলতানের জায়গাটি খুব পছন্দ হলো। তিনি এটি গযনী সালতানাতের কেন্দ্রীয় রাজধানী করার মত ব্যক্ত করলেন।

সুলতান তার ছেলে মাসউদকে বললেন, তুমি গযনী চলে যাও। সেখানকার প্রশাসনের দায়িত্ব তোমার হাতে নাও, আমি এখানেই থাকতে চাই।

আপনি এখানে থেকে গেলে সেলজুকী ও খোরাসানীরা কি বলবে না সুলতান মাহমূদ ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেছে? বললেন মাসউদ। অথচ বহু রক্ত ক্ষয়ের বিনিময়ে আমরা খোরাসান জয় করেছি।

আপনি এখানকার কোন স্থানীয় লোককে এই অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করুন সুলতান! প্রস্তাব করলো সুলতানের এক উপদেষ্টা। কারণ গযনীর অবস্থা এমন যে, আপনার অনুপস্থিতিতে তার কেন্দ্রীয় মর্যাদা ও গুরুত্ব ধরে রাখতে পারবে না।

অনেক চিন্তা ভাবনা করে অবশেষে উপদেষ্টাদের পরামর্শ মেনে নিলেন সুলতান। তিনি পুনরায় সোমনাথ দুর্গে ফিরে গেলেন। যথেষ্ট যাচাই বাছাই করে অবশেষে রাজা দেবআশ্রমকে সোমনাতের গভর্নর নিযুক্ত করে তিনি গযনী ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে সেনাদের নির্দেশ দিলেন।

সুলতান নবনিযুক্ত গভর্নর দেবআশ্রমকে জানালেন, তিনি মুলতানের পথে ফিরে যেতে চান না। অন্য কোন সহজগম্য ও কম দূরত্বের পথে তিনি গযনী ফিরতে চান, তবে তার অন্য কোন পথ জানা নেই।

গভর্নর দেবআশ্রম সুলতানকে রানকোচ হয়ে বেলুচিস্তানের মাঝ দিয়ে গযনী যাওয়ার পথের কথা জানালেন। কারণ বেলুচিস্তান পৌঁছে গেলে সুলতান সহজেই গযনী পৌঁছতে পারবেন।

এ সময় রাজা দেবআশ্রমের রানী সেখানে উপস্থিত ছিল। রানী বললো, আমরা সুলতানকে এমন দুজন গাইড দেবো যারা সহজেই আপনাদের নিয়ে

যেতে পারবে। কারণ রানকোচের পর যে মরু এলাকা সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত লোকের পক্ষে পানির উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

* * *

বিজয়ী আবেশে ফিরে যাচ্ছিল গযনী বাহিনী। তাদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কয়েক হাজার সহযোদ্ধাকে হারিয়ে ছিল গযনী সেনারা। সহযোদ্ধাদের লাশগুলো সোমনাথ দুর্গের বাইরে একটি খোলা জায়গায় গণকবর দেয়া হয়। বহু আহত যোদ্ধাও ছিল কাফেলায়। ছিলো মাল পত্র ও মালে গনীমত বোঝাই বহুসংখ্যক উট। সাধারণ যোদ্ধারা এখন আর তাকবীর ধ্বনী দিচ্ছিল না, তারা সমস্বরে রণসঙ্গীত গেয়ে সানন্দে পথ অতিক্রম করছিল। সোমনাথ যাওয়ার পথে তারা যে ভয়ঙ্কর মরুভূমি অতিক্রম করেছিলো, এই মরু ভয়াবহতার কথা তাদের আজীবন মনে থাকবে। এখনও তাদের সামনে ছিল জীবনহরণকারী মরুভূমি কিন্তু বিজয়ানন্দের উষ্ণতায় তাদের মধ্যে মরুকষ্টের যাতনা ছিলো না।

পথ চলতে চলতে বিজয়ী গযনী বাহিনী ভয়ঙ্কর মরুতে প্রবেশ করল। তিনদিন মরুর মধ্যেই তাদের চলে গেছে কিন্তু এর মধ্যে কোথাও এক ফোঁটা পানির সন্ধান পাওয়া গেল না। এবার সুলতান মাহমূদ সেনাদেরকে বেশী করে পানি বহনের নির্দেশ দেননি। ফলে সেনারা তাদের আহারের জন্যে যে পরিমাণ পানি সঙ্গে এনেছিল তা ফুরিয়ে গেছে। ঘোড়া ও উটগুলো পিপাসার্ত হয়ে পড়েছিল। হিন্দু রাজা তাদের পথ দেখিয়ে নেয়ার জন্য যে দুজন গাইড দিয়েছিল এরা আশ্বাস দিয়েছিল এমন পথে কাফেলাকে নিয়ে যাবে, যে পথে অঢেল পানির উৎস রয়েছে। গাইডদের যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, পানি কোথায়? তারা আশ্বাস দিলো আগামীকাল নিশ্চয়ই আমরা পানির কাছে পৌঁছে যাবো। কিন্তু চতুর্থ দিনও এভাবেই তপ্ত মরুর মধ্যেই কেটে গেলো পানির দেখা পাওয়া গেল না।

পঞ্চম দিন সেনাদের অধিকাংশই তৃষ্ণা পিপাসায় কাতর হয়ে গেল। অনেকের মাথা চক্কর দিতে লাগল। ঘোড়াগুলো হারিয়ে ফেলল চলার শক্তি। সুলতান মাহমূদ প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ ও সেনাপতি আবুল হাসানকে বললেন, আমার কেন যেন গাইডদের ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে, ওদের ডেকে আনো। পিপাসায় দুই গাইডেরও মাথা দুলছিল। তাদেরকে সুলতানের সামনে হাজির করা হলে সুলতান তাদের জিজ্ঞেস করলেন–

তোমরাও তো পিপাসায় কষ্ট পাচ্ছো, তোমাদের অবস্থা তো আমাদের সেনাদের চেয়ে আরো খারাপ, তোমরা বলছিলে এই মরুভূমিতে পানির অভাব নেই। কোথায় পানি?

পানি ঠিকই আছে সুলতান! তবে পানি পর্যন্ত আপনাদের পক্ষে জীবন নিয়ে পৌঁছা সম্ভব নয়। জবাব দিলো এক গাইড।

তোমরা কি জেনে শুনেই আমাদেরকে পানি থেকে দূরে নিয়ে এসেছো?

জী হ্যাঁ সুলতান! আমরা জেনে বুঝেই একাজ করেছি।

তাহলে তোমরা কি আমাদেরকে বিপথে নিয়ে আসার জন্যেই গাইড সেজেছিলে? তোমরা কি জানো না, তোমাদের এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড?

আমরা বিলক্ষণ তা জানতাম সুলতান! আমরা শিবদেবের সম্মানে আমাদের জীবন উৎসর্গ করেই সোমনাথ থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম। আপনার কি মনে নেই, যখন মহারাজা দেবআশ্রম আপনাকে রাস্তার কথা বলছিলেন, তখন পাশে থাকা রাণী বলেছিলেন, তিনি আপনাকে এমন গাইড দেবেন, যারা আপনাকে এমন পথে নিয়ে যাবে যেপথে পানির কোন অভাব নেই। তিনি অবশ্য আপনার সাথে ওয়াদা করেছিলেন আপনাকে সৎ পথপ্রদর্শক দেবেন। কিন্তু আমরা দু'জন তার ওয়াদাকে ভঙ্গ করে আপনাদেরকে পানি থেকে দূরে নিয়ে এসেছি। আমরা রাজা দেবআশ্রমের সাথে সোমনাথ রক্ষার্থে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিলাম কিন্তু আমরা সোমনাথ পৌঁছে দেখি সোমনাথের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। এরপর আমরা একটি রাতও ঘুমাতে পারিনি। বহুবার আপনাকে হত্যার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন সুযোগ পাইনি। অবশেষে যখন শুনলাম, আপনার গাইডের দরকার, তখন আমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় আপনাদের গাইড হওয়ার জন্য নিজেদের পেশ করলাম এবং খুব সাফল্যের সাথেই আমরা আমাদের কাজ করতে পেরেছি। আমরা শুধু আপনাকে নয়, আপনার গোটা বাহিনীকেই পানি থেকে দূরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। এখন আপনার গোটা বাহিনীর বিরুদ্ধেই আমরা প্রতিশোধ নিতে পেরেছি। আগামীকাল পানির অভাবে আমরা এমনিতেই মরে যাব। কাজেই আপনার মৃত্যুদণ্ড বরং আমাদের মৃত্যুকে আরো সহজ করবে কিন্তু আপনার গোটা বাহিনীকেই জীবন দিয়ে সোমনাথ ধ্বংসের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সুলতান তাৎক্ষণিক এই দুই নরাধমকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। দুই সেনা কর্মকর্তা সাথে সাথে তরবারী দিয়ে ওদের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

* * *

দুই গাইড যা বলেছিলো তা ছিলো খুবই বাস্তব। সত্যিকার অর্থেই গোটা বাহিনীর অবস্থা পানির অভাবে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। অধিকাংশ সেনা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দুলছিল, কারো কারো শুরু হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুযন্ত্রণা।

ষষ্ঠ দিন শেষে রাতের বেলায় সেনা শিবিরের ঘোড়াগুলো তৃষ্ণায় ছটফট করছিল আর আর্তচিৎকার করে হ্রেষারব করছিল। ভারবাহী উটগুলোর গতিও শ্লথ হয়ে এসেছিল। সেনারা ঘোড়া ও উটের উপর বসে থাকার সামর্থটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল। সুলতান এশার নামাযের পর এমন করুণ অবস্থার মধ্যে শিবিরের বাইরে খোলা জায়গায় এসে কয়েক রাকাত নফল নামায পড়লেন। নামাযরত অবস্থায়ও সুলতানের কানে ভেসে আসছিল পিপাসার্ত উট ঘোড়া ও সেনাদের আর্তচিৎকার। অনেক সেনার কণ্ঠের আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। তারা যেন কান্নার সামর্থটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল।

সুলতান গোটা সেনাবাহিনীও ভারবাহী জন্তুদের করুণ অবস্থা সামনে রেখে আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে মোনাজাত শুরু করলেন। সুলতান এতোটাই কাঁদলেন যে, এক পর্যায়ে তাঁর কণ্ঠ থেকে আর কোন আওয়াজ বের হচ্ছিল না। কারণ, তিনি জানতে, আজ রাতে যে সেনারা তার সাথে আছে এভাবে পানিহীন অবস্থা থাকলে আগামী রাতে হয়তো তাদের অর্ধেকও বেঁচে থাকবে না।

সুলতানের দু'আ শেষ হতেই রাতের অন্ধকার আকাশে হঠাৎ একটি তারা ভেঙে পড়লো এবং অন্ধকার ভেদ করে একটি আলোর ঝলক একদিকে নেমে হারিয়ে গেলো। তা দেখে সুলতানের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, আল্লাহ তাআলা আমাদের ইশারা দিয়েছেন, আগামীকালের মধ্যেই ইনশাআল্লাহ আমরা পানির দেখা পাবো।

মরুভূমিতে এ কয়দিন তারা কোন পাখি উড়তে দেখেনি। কিন্তু সকাল বেলায় সুলতানের কানে উড়ন্ত পাখির কলরব ভেসে এলো। সুলতান আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এক ঝাক পাখি উড়ছে। তিনি পাখির ঝাঁকের দিকে এক পলকে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন পাখির ঝাকটি অনেকটা দূরে গিয়ে নীচে

নেমে গেছে। সুলতান উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, এগুলোই পানির পাখি। পাখিগুলো সেদিকেই গেছে। যেদিকে তারা ভেঙে পড়েছিল। সুলতান সূর্যের আলো প্রখর হওয়ার আগেই সবাইকে ওদিকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

প্রায় দ্বিপ্রহরের আগে আগে যখন গোটা কাফেলার অবস্থাই সঙ্গীন, বহু সেনার মধ্যে মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে ঠিক তখন তাদের নজরে এলো পানির অস্তিত্ব। এ পানি পানি নয়, রীতিমতো একটি ঝিল। ঘোড়াগুলো পানির গন্ধ পেয়ে লাগামহীন হয়ে পানির দিকে দৌড় দিলো। সেনারা অনেকেই পানিতে মাথা ভিজিয়ে শরীরে পানি ছিটালো আর প্রাণভরে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করল। কাফেলার সকল প্রাণি ও সেনা তৃপ্তিভরে পানি পান করে বিশ্রামের জন্য সেখানেই তাঁবু ফেললো এবং অবশিষ্ট দিন ও রাত আহারাদী সেরে বিশ্রাম করে শরীরটাকে তাজা করে নিল। সেই সাথে প্রত্যেকের সামর্থানুযায়ী পানি সাথে করেও নিয়ে নিলো।

* * *

তখনও গযনী বাহিনীর কষ্টের শেষ হয়নি। এবার তারা অজানা অচেনা পথে কোন জানাশোনা গাইড ছাড়াই অগ্রসর হচ্ছিল। এখন রাতের বেলা আসমানের তারা আর দিনের বেলা সূর্যই ছিলো তাদের পথ চেনার উপায়।

দু'দিন এভাবে চলার পর তারা একটি পল্লীর দেখা পেলো এবং স্থানীয় এক লোককে গাইড হিসেবে সাথে নিল। এই অজানা অচেনা গাইড গযনী বাহিনীকে সিন্ধু নদীর এমন কূলে নিয়ে গেল যেখানে নদীর গভীরতা ও প্রশস্ততা ছিলো অনেক বেশী।

এই গাইড সিন্ধু নদীর তীর ঘেঁষে কাফেলাকে একটি জটিল এলাকায় নিয়ে গেল আর সেখানে পৌঁছতেই সন্ধ্যা নেমে এলো। বাধ্য হয়েই গযনী বাহিনী সেখানে রাতযাপনের জন্য তাঁবু ফেললো। কিন্তু গভীর রাতে গযনী শিবিরে শুরু হয়ে গেল হৈ চৈ কোলাহল। পরিস্থিতি আঁচ করে সুলতান গাইডকে তলব করলেন, কিন্তু গাইডকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেলো, শিবিরের একটি অংশে অজ্ঞাত লোকেরা হামলা করেছিল। কিন্তু সতর্ক গযনীর সেনারা আক্রমণকারী কয়েকজনকে ঘেরাও করে ধরে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাদের কয়েকজন আহত হয়েও পালানোর শক্তি হারিয়ে

ফেলে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেলো, এই এলাকাটি হিন্দু জাঠদের এলাকা হিসেবে পরিচিত। এলাকাটি আমরকোটের অংশ। ধৃত জাঠরা জানালো, তাদের একটা চোটখাটো রাজত্ব আছে। জাঠরা খুবই দুঃসাহসী লড়াকু। লুটতরাজ করাই তাদের প্রধান পেশা।

ধৃতজাঠরা আরো জানালো, তাদের রাজা জানতে পেরেছিল গযনী বাহিনী সোমনাথ ধ্বংস করে সেখানকার সব সোনাদানা নিয়ে যাচ্ছে। ফলে সেই রাজাই এই গাইডকে কৌশলে পাঠিয়েছিলো। গাইড রাজার নির্দেশ মতো গযনী বাহিনীকে আক্রমণের উপযোগী জায়গায় এনে রাতের অন্ধকারে গায়েব হয়ে যায়। পরদিন দিনের বেলায় গযনী বাহিনী যখন রওয়ানা হলো, হঠাৎ পেছন দিকে জাঠদস্যুরা অতর্কিতে আক্রমণ করে দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে পালিয়ে গেলো। এভাবে কয়েকবার আক্রান্ত হওয়ার পর সুলতান কাফেলার গতি থামিয়ে ধৃতজাঠদের এনে জিজ্ঞেস করলেন, জাঠদের রাজধানী এখান থেকে কতোটা দূরে? ধৃত জাঠরা জানালো, 'জাঠদের নির্দিষ্ট কোন রাজধানী নেই। আপনি জাঠদের ধ্বংসের পেছনে পড়লে লজ্জিত হবেন। কারণ তারা কোথাও এক জায়গায় এক সাথে থাকে না। দুর্গ বা স্থায়ী নিবাস তৈরীও তাদের স্বভাব বিরোধী।

সুলতানের মনোভাব বুঝে তার সেনাপতিগণ তাকে পরামর্শ দিলেন, গযনীর সেনা সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তাছাড়া দীর্ঘ কষ্টকর সফরের কারণে অবশিষ্ট সেনাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে লড়াই কিংবা আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সামর্থ নেই। এই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা ও জনমানুষ সম্পর্কে আমাদের কোনই ধারণা নেই। জানা নেই এখানে আমরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে পরিণতি কি হয়? এমতাবস্থায় ধৃতকয়েদীদের উপরও ভরসা রাখা কঠিন। তাই যথাসম্ভব দ্রুত আমাদের উচিত গযনী পৌঁছার চেষ্টা করা।

সুলতান সেনানায়কদের যৌক্তিক পরামর্শ ও বাস্তবতা মেনে নিলেন। কিন্তু জাঠদের পরপর আক্রমণে বিপর্যস্ত গযনী সেনাদের প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির মোকাবেলা করতে না পারায় সুলতান রাগে ক্ষোভে দাঁতে দাঁত কামড়ে ক্ষোভ হজম করতে বাধ্য হলেন।

* * *

সোমনাথ জয় করে অজানা পথে গযনী পৌঁছতে গযনী বাহিনীর যে দুঃসহ যন্ত্রণা, অজানা শত্রুদের গেরিলা আক্রমণ এবং অচেনা মরুভূমিতে টানা ছয় সাতদিন পানিহীন পিপাসায় ছটফট করতে হয়েছে, যে কষ্ট সহ্য ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এই কুরবানী ও ক্ষয়ক্ষতি ছিলো যে কোন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের চেয়েও আরো বেশী। দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর ফিরতি সফর শেষে ১০২৬ সালের ৬ এপ্রিল মোতাবেক ৪১৭ হিজরী সনের ১০ সফর সুলতান মাহমূদ সোমনাথ জয়ী বেঁচে থাকা সেনাদের নিয়ে গযনী পৌঁছেন। গযনীর সীমানায় পৌঁছা মাত্রই তিনি ঘোড়া থেকে নেমে দু'রাকাত শোকরানা নামায আদায় করলেন। এ নামায যুদ্ধ জয়ের জন্য নয় বহু ত্যাগ জীবনহানি ও সম্পদ হারিয়ে হলেও আল্লাহ তাআলা যে বিজয়ী কাফেলাকে শেষ পর্যন্ত গযনী পৌঁছার তওফিক দিয়েছেন এ নামায ছিলো এরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য।

সেনাদের সোমনাথ জয় করে আসার খবর শুনে গোটা গযনীর আবাল বৃদ্ধ বণিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দে মেতে উঠলো। মহিলারা বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে বিজয়ী সেনাদের কাপড় নেড়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। ছোট শিশুরা আনন্দে নেচে গেয়ে উল্লাস প্রকাশ করছিল।

গযনী ফিরে রাতের বেলায় সুলতান মাহমূদ তার দেহে অস্বাভাবিক ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব করলেন। অবশ্য ক্লান্তি এর আগেও তার অনুভূত হতো কিন্তু এবার তার মনে সাক্ষ্য দিচ্ছিল তার শরীর কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রত্যেকবার যুদ্ধ থেকে ফেরত আসার পর সুলতানের একান্ত চিকিৎসক তার শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করতেন। চিকিৎসক এবারও রাতের বেলায় এসে সুলতানের দেহের অবস্থা জানার জন্য তাঁর রক্ত সঞ্চালন বুঝতে হাতের নার্ভ টিপে ধরলেন। এর পর বুকের হৃদকম্পন বুঝার জন্য বুকে হাত রাখলেন। সুলতানকে নানা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। সবকিছু বুঝে শুনে চিকিৎসকের কপালে ভাঁজ পড়লো। চিকিৎসক সুলতানের দেহের নাজুক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি সুলতানকে বললেন– সম্মানিত সুলতান! আপনার দেহের অবস্থা দেখে আমি যতোটা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, এমন চিন্তা আপনার মধ্যে দেখা গেলে আপনার দৈহিক অবস্থার কখনো অবনতি ঘটতো না। আপনি খুবই অসুস্থ সুলতান! কমপক্ষে আপনাকে এক বছর বিরতিহীন বিশ্রাম নিতে হবে।

আমার আবার কি হয়েছে? আপনি কি শুনেননি, আমি কোত্থেকে এসেছি, কি করে, কতো যাতনা সহ্য করে দীর্ঘ দিনের কঠিন সফর শেষ করেছি। সফরের এই ধকলকে আপনি অসুস্থতা বলছেন?

জী সুলতান! আমি সত্যিই বলছি, আপনি অসুস্থ। আপনার কাছে উট আর ঘোড়ার পার্থক্য করা যেমন সহজ আমার কাছে সুস্থ ও অসুস্থতার ব্যবধান অনুধাবন করা এমনই সহজ।

এ সময় সুলতানের বেগম সাহেবা এবং তার এক কন্যা পাশে দাঁড়ানো ছিলেন। চিকিৎসকের কণ্ঠে অসুখের কথা শুনে তারা জানতে চাইলেন- কি রোগ হয়েছে সুলতানের? চিকিৎসক তাদের আশ্বস্ত করতে বললেন, না তেমন মারাত্মক কিছু নয়।

সুলতান স্ত্রী ও কন্যার উদ্দেশ্যে বললেন, আরে তোমরা শুধু শুধু দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছো। এ কিছু না। সফরের ক্লান্তি আর কি? যাও তোমরা এ ঘর থেকে চলে যাও, আমি চিকিৎসকের সাথে কিছু প্রশাসনিক কথা বলবো।

স্ত্রী ও কন্যা সেই কক্ষ থেকে চলে যাওয়ার পর সুলতান চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কি রোগ হয়েছে শাইখুল আসফান্দ?

আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে গেছে সুলতান! আমি বহু আগেই এ ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক ও অবহিত করেছি সুলতান! এখন প্রায়ই আপনার বুকে ব্যথা হয়, কণ্ঠনালী ফুলে যায় তা কি আপনি অনুভব করেন না সুলতান?

আমি আপনাকে ভয় দেখানোর জন্যে বলছি না, শুধু সতর্ক করার জন্য বলছি। কারণ, এখন থেকে সতর্ক না হলে পরবর্তীতে অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়বে। আপনার যক্ষ্মা রোগ হয়েছে সুলতান। তবে এটা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে।

আরে যক্ষ্মা রোগ আমার কি আর বিগড়াবে?

সম্মানিত সুলতান! এটাকে আপনি শরীরের ঘুণ পোকা মনে করতে পারেন। ঘুণ পোকা যেমন ভেতর থেকে কাঠ খেয়ে শেষ করে ফেলে, যক্ষ্মা রোগও তেমনি দেখা যায় না কিন্তু ভেতরে ভেতরে শরীরের সবকিছুকে নষ্ট করে দেয়। এখন থেকে যদি আপনি কঠিন পরিশ্রমের কাজ না করে পূর্ণ বিশ্রামে থাকেন

এবং মাথা থেকে সব জটিল চিন্তা দূর করে দেন তাহলে আশা করা যায় রোগটি আর বাড়বে না। বর্তমানে আপনার শরীরের কাঠামো ভেঙে যাচ্ছে।

আপনি কি আত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন? শাইখুল আসফান্দ?

আত্মিক শক্তিতে আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি সুলতান। কিন্তু আত্মিক শক্তি ততোক্ষণই সক্রিয় থাকে যতক্ষণ দেহ আত্মাকে ধারণ করার সামর্থ রাখে। দেহ আত্মাকে ধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে আত্মা দেহ পিঞ্জিরার বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়।

আমি হিন্দুস্তানের এমন সব যোগী সন্ন্যাসীকে দেখেছি, যাদের আত্মিক ক্ষমতা এতোটাই বিস্ময়কর যে, সাধারণ মানুষ সেইসব ক্ষমতাকে অপার্থিব বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। যোগীরা আমাকে বলেছে, এ ধরনের ক্ষমতা ইচ্ছা করলে যে কেউ অর্জন করতে পারে। যোগীদের চেয়ে কি আমার আত্মশক্তিকে হীন মনে করেন আপনি? চিকিৎসকের উদ্দেশ্যে বললেন সুলতান।

সম্মানিত সুলতান! আপনি যাই বলুন না কেন, আমি তবুও বলবো, যক্ষ্মা যদি আপনার শরীরকে ভেতর থেকে ফোকলা করে ফেলে তবে সেই আত্মিক শক্তি কোত্থেকে পয়দা হবে?

দৈহিক শক্তি নয় আত্মিক শক্তির বলেই আমি সোমনাথের মতো কঠিন যুদ্ধ জয় করেছি এবং ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘ সফরও করেছি। আমার মনে আছে সোমনাথ অভিযানে যাওয়ার আগেই আপনি আমাকে বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তখন হয়তো আমাকে পরীক্ষা করে আপনি এই রোগের উপস্থিতি ধরতে পারেননি। আসলে রোগটি তখনও আমার মধ্যে ছিলো। এখন আপনি এটিকে স্বনামে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। অবশ্য আমি এটাকে একটা সাধারণ রোগই মনে করে আসছি। আজ আমি আপনার কাছ থেকে একটা প্রতিশ্রুতি নিতে চাই শাইফুল আসফান্দ! আমার এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথাটি কেউ যেনো জানতে না পারে।

এখনও পর্যন্ত আমি এটাকে যক্ষাই বলছি সুলতান! কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে এটা পাকস্থলীর রোগ। যদি তাই হয় তবে কিছু দিনের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে, তখন পরিষ্কার বোঝা যাবে এটি যক্ষ্মা না পাকস্থলীর রোগ। তবে আমি আপনাকে করজোড়ে নিবেদন করছি, এখন থেকে আপনি নিয়মিত বিশ্রাম, ওষুধ ও পথ্যের প্রতি মনোযোগী হবেন।

'আরে শাইখ!' আমি মরে গেলে কি আর ক্ষতি হবে! আমার ছেলেরা এখন বড় হয়েছে, আশা করি তারা সালতানাতকে সামলে নিতে পারবে।

আপনার খান্দানে সালতানাত চালানোর মতো লোকের অভাব হবে না। আরো বহু সুলতান হয়তো জন্ম নেবে কিন্তু মাহমূদ আর কেউ হবে না। আর কোন মূর্তি সংহারী জন্ম নেবে না। সবাই হয়তো আল্লাহ্ ও রাসূলের নামের উপরই সালতানাত চালাবে কিন্তু আল্লাহর নামে নিজেকে উৎসর্গ করার মতো শাসক আর পাওয়া যাবে না। হিন্দুস্তানের পাথুরে ভগবানদের টুকরো করে এনে গযনী শাহী মসজিদের পথে ছড়িয়ে দেয়ার শক্তি আর কারো হবে না। আমি আপনার ব্যক্তি স্বার্থে নয়, আপনার পরিবার, রাজত্ব কিংবা শাসন কার্যের স্বার্থে নয় ইসলামের স্বার্থে মুসলিম বিশ্বের মর্যাদার স্বার্থে আপনাকে আরো কিছুদিন জীবিত ও সক্ষম দেখতে চাই সুলতান!

জন্মমৃত্যু কোন মানুষের হাতে নয়, শাইখুল আসফান্দ! বললেন সুলতান মাহমূদ। আমাকে দুনিয়াতে আরো বহু কাজ করতে হবে। মুসলিম বিশ্বের প্রতি কতিপয় কেউটে সাপ উঁকি ঝুকি মারছে। হিন্দুস্তানের কালনাগিনী গুলোকেও আমার বিনাশ করতে হবে। এতোগুলো আক্রমণের পরও হিন্দুস্তানের কালনাগিনীগুলোকে নিঃশেষ করা সম্ভব হয়নি। সোমনাথ অভিযানে গিয়ে আমি হিন্দুস্তানের উপকূলীয় এলাকায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়কার মুসলমানদের উত্তরসূরীদের দেখেছি।

হিন্দু শাসকরা তাদের জীবন সংকীর্ণ করে ফেলেছিল। তার পরও তারা এখনও নিজেদের আরবী ভাষাভাষী হিসেবে অক্ষুণ্ন রেখেছে। আমার একান্ত কর্তব্য তাদের জীবনযাত্রাকে নির্বিঘ্ন করা এবং হিন্দুদের দুঃশাসন থেকে তাদের উদ্ধার করা। আমার আরো বহু কাজ করতে হবে শাইখুল আসফান্দ!

'আমি যদি আমার দায়িত্বপালন না করি তাহলে ইসলামের অবিস্মরণীয় সিপাহ্ সালারের অপমৃত্যুর দায় আমার কাঁধে চাপবে সুলতান! আমি আল্লাহর কাছেও তো কোন জবাব দিতে পারবো না সুলতান! বললেন চিকিৎসক।

আর কেউ না দেখলেও আল্লাহ ঠিকই দেখছেন শাইখ! আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমার অসুখের ব্যাপারটি গোপন রাখবেন। কারণ আমার শত্রুরা যদি আমার অসুখের খবর জেনে ফেলে, তাহলে তারা আমার মৃত্যুর জন্য আমার মোকাবেলা না করে অপেক্ষা করতে শুরু করবে, আমি ওদের সাক্ষাত পাবো না।

আমার লাশ যখন দাফনের জন্যে নেয়া হবে, তখন ওরা আমার রাজ্যে আক্রমণ করে বসবে। এমন দুর্যোগ মুহূর্তে আমার ছেলেদের পক্ষে হয়তো ওদের প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। শাইখুল আসফান্দ! আপনি কি দেখছেন না, সেলজুকীরা আবারো কী রকম ভয়ংকর হয়ে উঠছে? ওরা এখন গযনীর জন্যে হুমকিতে পরিণত হয়েছে।

আমি সবই দেখছি সুলতান! বললেন শাইখুল আসফান্দ!

আমাকে আরো একবার হিন্দুস্তান যেতে হবে, চিকিৎসকের উদ্দেশ্যে বললেন সুলতান। আমি যখন হিন্দুস্তান থেকে ফিরছিলাম তখন পথিমধ্যে জাঠ নামের একটি জনগোষ্ঠী আমার সেনাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করেছে। আমার সেনাদের পক্ষে তখন দৃঢ়ভাবে লড়াই করার মতো সামর্থ ছিলো না। এই দুর্বলতা আন্দাজ করে জাঠ দস্যুরা গেরিলা আক্রমণ করে আমার বহু সহযোদ্ধাকে হত্যা করেছে। তবুও সাহস করে আমার সেনারা ওদের কয়েকজনকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি জেনে নিয়েছি জাঠ জনগোষ্ঠীর জীবন যাপন রীতি পদ্ধতি ও সামরিক শক্তি। ধৃতরা জানিয়েছে, জাঠ জনগোষ্ঠী সোমনাথের শিবমূর্তির পূজারী। এরা খুবই লড়াকু ও সংখ্যায় বিপুল। এরা এতোটাই শক্তির অধিকারী, ইচ্ছা করলে আশেপাশের যে কোন মহারাজার ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। তাছাড়া এরা মুসলমানদের জঘন্য শত্রু। এই ভয়ংকর শত্রুদের শায়েস্তা করতে আমাকে আরেকবার হিন্দুস্তানে যেতেই হবে শাইখুল আসফান্দ! আমি যদি এই বেয়াড়া জনগোষ্ঠীর কোমড় ভেঙ্গে না দেই; তা হলে এরা আবার অন্য কোন জায়গায় শিবমূর্তি দাঁড় করিয়ে দেবে, আর মুসলমানদের ধরে ধরে শিবমূর্তির পায়ে বলি দিতে থাকবে।

আপনি একটু বিশ্রাম নিন সুলতান! আমি আপনাকে ওষুধ দেবো।

শুধু দাওয়া ওষুধ) নয় দু'আও করুন শাইখুল আসফান্দ! এখন দাওয়ার চেয়ে দু'আ আমার বেশী প্রয়োজন। বললেন সুলতান মাহমূদ।

ওষুধ পত্র দিয়ে চিকিৎসক চলে যাওয়া পর সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন সুলতানের স্ত্রী ও তার কন্যা।

চিকিৎসক কি বলে গেলেন? আপনি আমাদেরকে কক্ষ থেকে বের করে দিলেন কেন? এমন কি গোপন কথাছিলো চিকিৎসকের সাথে? এক নাগাড়ে প্রশ্ন কয়টি সুলতানের দিকে ছুড়ে দিলেন তার স্ত্রী।

'হু'! চিকিৎসক বললেন, আরাম করুন। দায়িত্ব কর্তব্যের কথা ভুলে যান। বললেন সুলতান।

চিকিৎসক যদি আপনাকে বিশ্রামের কথা বলে থাকেন, তাতে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। মায়ের কণ্ঠ থেমে যেতেই বললেন সুলতানের কন্যা। কন্যার উদ্দেশ্যে সুলতান বললেন, চিকিৎসক বলেছে আমার শরীর নাকি খুব ভেঙে পড়েছে, বিশ্রাম নিতে হবে।

শাইখুল আসফান্দ যেভাবে বিশ্রাম নিতে বলেছেন, আপনার উচিত সেভাবেই বিশ্রাম নেয়া। বললেন সুলতানের বেগম। আমার ছেলেরা আপনার দায়িত্ব ঠিকই পালন করতে পারবে।

তা পারবে বৈকি বেগম! কিন্তু সেলজুকীদেরকে এরা শায়েস্তা করতে পারবে না। হিন্দুস্তানের জাঠদের মাথা গুড়িয়ে দেয়াও এদের জন্যে কঠিন হবে বেগম! মরার আগে এই দু'টি কাজ করেই আমাকে মরতে হবে।

ঐতিহাসিক আলবিরুনী লিখেছেন, সত্যিকার অর্থেই তখন সুলতান মাহমূদের শরীর ভেঙে গিয়েছিল। দৃশ্যত তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি ক্লান্ত অসুস্থ। কিন্তু তিনি শরীরের তোয়াক্কা না করে চিকিৎসক চলে যাওয়ার পর বিশ্রাম না নিয়ে সেনাকর্মকর্তাদের ডেকে পাঠালেন এবং জরুরী নির্দেশনা দিয়ে বললেন, আগামীকাল সূর্য উঠার আগেই আমি গযনীর জামে মসজিদ ও আমার বাড়ীর সদর দরজার পথে সোমনাথ থেকে আনা শিবমূর্তির টুকরো এভাবে দেখতে চাই; যাতে মানুষ এগুলো মাড়িয়ে যাতায়াত করে এবং মক্কা ও মদীনার জন্যে দু'টি টুকরো আগামীকালই পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় দিনই সুলতান মাহমূদ হিন্দুস্তানের জাঠ উপজাতির বিরুদ্ধে সেনাভিযানে প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে সেনাদের নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে সৈন্য ঘাটতি পূরণে নতুন সেনা ভর্তির নির্দেশ দিয়ে তাদেরকে কঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চৌকস যোদ্ধায় পরিণত করার দিক নির্দেশনা দিলেন।

সুলতান মাহমূদ চিকিৎসকের সতর্কবাণীর পরোয়া না করে, অবসর ও বিশ্রাম নেয়ার কোন তোয়াক্কা না করে নতুন সেনা ভর্তি ও প্রশিক্ষণের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। সেই সাথে সরকারী প্রশাসনিক কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগ করলেন। অপর দিকে লাহোর ও মুলতানের গভর্নরের কাছে জাঠদের সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানোর জন্যে পয়গাম পাঠালেন।

সময় দ্রুত গড়িয়ে যেতে লাগলো। ইতোমধ্যে লাহোর ও মুলতান থেকে জাঠদের রিপোর্ট আসতে শুরু করলো। রিপোর্টে বলা হয়েছে, জাঠ জাতিগোষ্ঠী সিন্ধু অববাহিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ি রয়েছে। এরা জাতি হিসেবে লড়াকু এবং দুঃসাহসী। এদের সংখ্যা বিপুল। এরা সাধারণত ঝটিকা আক্রমণ, রাতের বেলায় চোরাগুপ্তা হামলা এবং নদী ও সাগরে দস্যিবৃত্তি করে। এরা নৌপথে লড়াইয়ে খুবই পটু।

তখনকার দিনে সিন্ধু নদী ছিলো খুবই চওড়া। নদীর মাঝে বহু চর ছিলো। যেগুলোর অবস্থা ছিলো অনেকটা দ্বীপের মতো। এসব দ্বীপ সদৃশ চরাঞ্চলগুলোতে ঘনজঙ্গলে বসবাস করতো হাজার হাজার জাঠ। সুলতান মাহমূদের কাছে খবর এলো, দিন দিন জাঠ জনগোষ্ঠী হিন্দুস্তানের মুসলমানদের জন্যে সমস্যারূপে আবির্ভূত হচ্ছে। এরা বংশানুক্রমে সোমনাথের পূজারী হওয়ায় নিরীহ হিন্দুস্তানী মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে সোমনাথের প্রতিশোধ নিতে তৎপর।

এসময় হিন্দুস্তানের লাহোর মুলতান ও বর্তমান পাঞ্জাবের গোটা অংশই ছিলো গযনী সালতানাতের দখলে। এবং কাশ্মীর থেকে কন্নৌজ পর্যন্ত গোটা এলাকা ছিলো গযনী সালতানাতের বিজিত এলাকা। এবং এ অঞ্চলের সকল রাজা মহারাজাই সুলতান মাহমূদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

মূলত হিন্দুস্তানের মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমূদ সম্ভাব্য হুমকি জাঠদের শক্তি খর্ব করতে চাচ্ছিলেন, যাতে ওরা মুসলমানদের জন্যে হুমকি হয়ে না উঠতে পারে এবং পুনর্বার সোমনাথ মন্দির নির্মাণ কিংবা শিবমূর্তির পূজার আয়োজন জোরদার না হয়।

১০২৬ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সুলতানের কাছে খবর পৌঁছলো জাঠ জনগোষ্ঠী গযনীর মোকাবেলায় যুদ্ধ ঘোষণার জন্যে বিশাল রণপ্রস্তুতি শুরু করেছে। জাঠদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে, স্থানীয় এক মুসলমান গযনীর পক্ষে গোয়েন্দাগিরী করতে গিয়ে জাঠদের হাতে গ্রেফতার হয়। পরবর্তীতে সে ফেরার হয়ে ফিরে এসে সুলতানকে জানায়, জাঠদের খবর নেয়ার জন্যে একজন ভবঘুরে হিসেবে ছদ্মবেশে আমি ওদের এলাকার অনেক ভেতরে যাওয়ার জন্যে একদিন একটি ছোট নৌকায় সওয়ার হই। কিন্তু আমি ঝড় তুফান কিংবা বিরূপ পরিস্থিতিতে কিভাবে নৌকা সামলাতে হয় তা জানতাম না। আমি যখন নৌকায় সওয়ার হই তখন নদী ছিলো শান্ত, তেমন ঢেউ ছিলো না। স্রোতের টানও আমি বেশী বুঝতে পারিনি। যেই নৌকায় আরোহণ করে নদীতে ভেসেছি স্রোতের টানে নৌকা ভেসে যেতে লাগলো।

আমি যতোই চেষ্টা করছি কূলে নৌকা ভেড়াতে, নৌকা আরো নদীর গভীরে যেতে লাগলো। ঠিক সেই সময় আকাশ অন্ধকার করে এলো প্রবল ঝড় বৃষ্টি। আমি নৌকাকে সামলাতে পারলাম না। নৌকা ঢেউ ও স্রোতের দ্বিমুখী নাচনে হঠাৎ উল্টে গেলো। আমি পানিতে হাবু ডুবু খেয়ে কোন মতে ভাসমান নৌকা আঁকড়ে থাকলাম। স্রোতের টান ও ঢেউ এর ধাক্কায় একসময় একটি দ্বীপ চড়ে গিয়ে আমার নৌকা আঁছড়ে পড়লো। আমি কোন মতে শরীরটাকে টেনে ডাঙ্গায় উঠালাম ঠিকই কিন্তু অচেনা অজানা বিজন জঙ্গল দেখে আমার দেহের অবশিষ্ট শক্তিও নিঃশেষ হয়ে গেলো।

একসময় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন দেখি আমি জাঠদের একটি ঝুপড়িতে শুয়ে আছি। আমার কাছে দুজন জাঠ মহিলা বসা ছিলো। হুঁশ ফিরতেই যুবতী মহিলা জানতে চাইলো তুমি কে? কোত্থেকে এসেছো? পানিতে পড়েছো কিভাবে? সে মহিলাদের কাছে নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে কথা বললো। কিন্তু জাঠ পুরুষরা যখন তার সাথে কথা বললো তখন তাদের কাছে এই গোয়েন্দার কথাবার্তা সন্দেহজনক মনে হলো। ফলে তারা বললো, তুই যদি তোর সত্যিকার পরিচয় না বলিস, তাহলে তোকে সাগরে ফেলে দেবো। এই বলে জাঠদের কয়েকজন তাকে ধরে সাগরে ফেলে আসার জন্যে কাধে উঠিয়ে নিলো। জীবন ভয়ে সে তখন তার আসল পরিচয় বলে দিলো। কিন্তু জাঠরা এতে সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তাকে বন্দি করে রাখলো এবং অধিকতর তথ্য বলার জন্য উৎপীড়ন করতে শুরু করলো। এক পর্যায়ে সে

বলে দিলো, আমি গযনীর গোয়েন্দা। গযনী সরকার তোমাদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অচিরেই তারা হামলা করবে।

কিন্তু তাতেও জাঠদের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেলো না সে। তাকে নজরবন্দি করে রাখলো। জাঠরা তার কাছ থেকে জানতে চাইতো গযনী বাহিনীর লড়াই করার কৌশল কি? এরা কিভাবে লড়াই করে। ডাঙ্গায় না পানিতে বেশী পটু ইত্যাদি। বন্দি গোয়েন্দা জাঠদের আস্থা অর্জনের জন্য গযনী বাহিনীর রণকৌশল, তাদের রণ প্রস্তুতি সম্পর্কে আরো বেশী করে তথ্য সরবরাহ করতে লাগলো। এক পর্যায়ে তার থাকা খাওয়ার সুবিধা কিছুটা বাড়ালেও তাকে সম্পূর্ণ নজর বন্দি থেকে মুক্তি দিলো না।

যে যুবতী মহিলা প্রথম দিন তার পাশে বসা ছিলো, সে ছিলো এক জাঠ সর্দারের স্ত্রী। প্রথম দিন থেকেই এই মহিলা বন্দি গোয়েন্দার প্রতি একটু বেশী অনুরাগ দেখাচ্ছিল। জাঠরা যখন বন্দির প্রতি কিছুটা প্রসন্ন হয়ে তাকে স্বাভাবিক খাবার দাবার ও বন্ধনহীন চলাফেরার সুবিধা দিলো, তখন এই যুবতী মহিলা তার সাথে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করলো। অল্প দিনের মধ্যেই বন্দি গোয়েন্দা ও যুবতীর মধ্যে গড়ে উঠলো হৃদ্যতা। একদিন সুবিধা পেয়ে মহিলা বললো, আমার স্বামী একজন জাঠ সর্দার। এই বুড়ো শয়তানটার সাথে ঘর করার চেয়ে মৃত্যু ভালো। আমার ইচ্ছা করে যদি কোথাও পালিয়ে যেতে পারতাম তাহলে চলে যেতাম।

সুযোগ পেয়ে বন্দি গোয়েন্দা বললো, তুমি যদি এখান থেকে আমার পালানোর ব্যবস্থা করতে পারো, তবে আমি তোমাকে সাথে নিয়ে মুলতান চলে যাবো। আর সেখানে গেলে তোমাকে বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে না। রাজরানী হয়ে থাকবে।

বন্দির মুখে একথা শুনে মহিলা তাকে জানালো, তোমার আগেও এক মুসলমানকে এরা গ্রেফতার করেছিলো। তার কাছ থেকেই এরা জানতে পারে গযনীর মুসলমানরা জাঠদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ খবর পাওয়ার পর থেকেই জাঠরা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। শত শত নৌকা তৈরীর কাজ শুরু হয়। কিন্তু সেই গোয়েন্দা তাদের অনেক তথ্য জানানোর পরও তারা তাকে মুক্তি দেয়নি, হত্যা করে সাগরে ফেলে দেয়।

এক চাঁদনী রাতে নদীতে ভাটা পড়েছে। কোন বাতাস নেই, ঢেউ নেই, শান্ত পরিবেশ । সেই সর্দার পত্নী অতি সন্তর্পণে বন্দি গোয়েন্দার কাছে এসে বললো,

যদি পালাতে চাও তাহলে তাড়াতাড়ি আমার সাথে এসো। যুবতী মহিলা গোয়েন্দাকে ঘর থেকে বের করে একটি জঙ্গলাকীর্ণ পথে নদী তীরে নিয়ে এসে একটি ছোট্ট নৌকায় বসিয়ে নৌকার বাঁধন খুলে পানিতে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে বললো, তাড়াতাড়ি বৈঠা হাতে নিয়ে পানিতে চাপ দাও। মহিলা নিজে নৌকার হাল ধরলো এবং দ্রুত নৌকা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো।

তারা নদীর তীর থেকে কিছুটা ভেতরে যেতে না যেতেই নদী তীরে অনেকগুলো মশালের দৌড়ঝাপ শুরু হয়ে গেলো। চাঁদনী রাতের আলোয় জাঠদের বুঝতে অসুবিধা হলো না, সর্দার পত্নীই বন্দীকে নিয়ে পালানোর জন্যে নৌকায় উঠেছে। জাঠরা তাদের লক্ষ করে হুমকি দিলো, যদি বাঁচতে চাও ফিরে এসো। কিন্তু তারা হুমকি শুনে আরো প্রাণপণে নৌকা চালানোর জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো। জাঠরা যখন দেখলো, তাদের ফেরার সম্ভাবনা নেই, তখন ওদের লক্ষ করে তীর বৃষ্টি শুরু করলো। হিংস্র ও জংলী জাতি হওয়ার কারণে জাঠরা ছিলো তীরন্দাজীতে পটু। ওদের প্রথম তীরটিই এসে বিদ্ধ হলো সর্দার পত্নীর গায়ে। সে আর্তচিৎকার দিয়ে নৌকায় পড়ে গেলো। অবস্থা বেগতিক দেখে গোয়েন্দা নৌকার তলায় শুয়ে পড়লো এবং জীবনের আশা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলো। গোয়েন্দাকেও পড়ে যেতে দেখে এবং পানির স্রোতে নৌকা ভাসতে দেখে জাঠরা নিশ্চিত হলো ওরা উভয়েই তীরবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেছে। ফলে শুধু নৌকা ধরার জন্য তাদের কেউ আর রাতের অন্ধকারে পানিতে ভাসতে চাইলো না।

নদীতে স্রোত ছিলো তীব্র। দেখতে দেখতে নৌকা জাঠদের আয়ত্বের বাইরে চলে গেলো এবং অদৃশ্য হয়ে গেলো! অনেকক্ষণ পর গোয়েন্দা যখন বুঝলো, আর কোন তীর নৌকায় আঘাতের শব্দ হচ্ছে না তখন সে আস্তে করে মাথা তুলে চারপাশটা দেখে নিলো। না, দৃষ্টি সীমার মধ্যে কোন বিপদের আশংকা নেই। তখন সে বৈঠা বেয়ে নৌকাকে বিপরীত তীরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করে দিলো।

অনেক ভাটিতে গিয়ে বিপরীত তীরে নৌকা ভেড়াতে সক্ষম হলো গোয়েন্দা। তার শরীরে একাধিক তীরের আঘাত লেগেছে কিন্তু কোনটাই বিদ্ধ হয়নি। রক্তক্ষরণ ও অস্বাভাবিক অবস্থায় নৌকা চালানোয় তার শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু তীরে উঠে থামেনি সে। রাতের অন্ধকারেই সে মুলতানের পথ ধরলো এবং কোথাও বিশ্রাম না নিয়ে একটানা হেঁটে বহু কষ্টে আধামরা

অবস্থায় কোনমতে মুলতান পৌঁছলো। মুলতান পৌঁছেই সে গযনীর কর্মকর্তাদের জানালো তার ইতিবৃত্ত। এ খবর গযনী পৌঁছালে সুলতান মাহমূদ মুলতানের গভর্নরকে নির্দেশ দিলেন, 'আপনি দ্রুত কুড়িজন করে সৈন্য ধারণ ক্ষমতার একটি নৌবহর তৈরি করুন। খাওয়ারিজম শাহীর বিরুদ্ধে জিউন নদীর নৌ যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় বিশেষ ধরনের রণতরী তৈরী করার জন্যে একটি বিশেষ ডিজাইন উদ্ভাবন করে ছিলেন। সুলতান মাহমূদ সেই ডিজাইন মতো রণতরী তৈরীর কারিগর ও কয়েকজন অভিজ্ঞ মাল্লাহ এবং একজন কর্মকর্তাকে নৌকা তৈরির কাজ তদারকীর জন্যে মুলতান পাঠিয়ে দিলেন সুলতান।

১০২৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সুলতানের কাছে খবর এলো, আপনার নির্দেশ অনুযায়ী এক হাজার রণতরী তৈরী হয়ে গেছে। তা ছাড়া জাঠদের রণ প্রস্তুতি এবং তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যও রিপোর্ট আকারে সুলতানের কাছে পৌঁছে গেলো। সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়, তিনি ধনরত্ন লুটতরাজ করার জন্যে বারবার হিন্দুস্তান আক্রমণ করেছেন। কিন্তু এই অভিযোগের অসাড়তা প্রমাণের জন্য জাঠদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তার সর্বশেষ অভিযানই যথেষ্ট। কেননা জাঠদের কোন স্থায়ী বসতি ছিলো না। ছিলো না কোন রাজ-রাজত্ব রাজধানী কিংবা দুর্গ ধনাগার।

মূলত জাঠরা ছিলো একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর যাযাবর উপজাতি। যারা সেলজুকীদের মতোই পয়সার বিনিময়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজার পক্ষে প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের কাজে ব্যবহৃত হতো। শিবমূর্তির পূজারী এই উপজাতি জনগোষ্ঠীর লোকগুলো সেলজুকীদের মতোই গযনী সালতানাত এবং হিন্দুস্তানের মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্যে হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যখন ব্যাপক দমন পীড়ন ও নির্মূল অভিযানে লিপ্ত হয় তখন বাধ্য হয়েই হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সুরক্ষার জন্যে সুলতান মাহমূদ জাঠ দমন অভিযানের সংকল্প করেন।

৪১৮ হিজরী সন মোতাকে ১০২৭ সালের মার্চ মাসের শেষ ভাগে সুলতান মাহমূদ গযনী থেকে জাঠদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। মুলতান পৌঁছে তিনি জানতে পারেন, এক হাজার চারশ ষাটটি রণতরী তার নির্দেশনা মতো তৈরি করা হয়েছে। সুলতান সফরের ক্লান্তি উপেক্ষা করে তখনি রণ তরীগুলো পর্যবেক্ষণ করার জন্যে নদী তীরে চলে গেলেন। তিনি নদী তীরে গিয়ে সরাসরি একটি রণতরীতে আরোহণ করে মাল্লাদের তা চালাতে বললেন। মাল্লাদের

রণতরী চালানোর কৌশল ও অভিজ্ঞতা দেখে তিনি কুড়িজন করে তীরন্দাজ ও বর্শাধারী সৈন্যকে একেকটি নৌকায় আরোহণ করিয়ে সবগুলো নৌকা নদী.তে ভাসিয়ে যুদ্ধের মহড়া দিতে নির্দেশ দিলেন। সৈন্যরা পরম উৎসাহে মনোমুগ্ধকর নৌ মহড়া দেখালো। মাল্লারা নৌকাগুলোকে তাদের অপার কৌশলে নানা দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত ও প্রত্যাঘাতের অবস্থা সুলতানকে দেখালো। সুলতান নৌ-মহড়া দেখে মুগ্ধ হলেন এবং মহড়া সমাপ্ত করে সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে আরো অধিকতর সামরিক দিক-নির্দেশনা দিলেন।

যেদিন সুলতান মুলতান পৌঁছলেন, সে দিনই জাঠদের অবস্থা জানার জন্যে গুপ্তচর পাঠিয়ে দেয়া হলো। অবশ্য সুলতানের নৌ-মহড়া এবং মুলতান আগমনের খবর জাঠদের কাছে গোপন রইলো না। কারণ তখন মুলতানেও ছিলো বিপুল হিন্দুর বসতি। এরা যথারীতি তাদের জ্ঞাতি জাঠদের কাছে সুলতানের নৌ প্রস্তুতির খবর পৌঁছে দিলো। অবশ্য জাঠরা এর বহু আগেই সুলতানের জাঠবিরোধী অভিযান প্রস্তুতির খবর পেয়ে গিয়েছিলো। তা ধৃত ও মুক্তিপ্রাপ্ত সুলতানের মুসলিম গোয়েন্দার জবানী থেকেই জানা গিয়েছিলো। পরবর্তীতে আরো জানা গেছে, জাঠরা তাদের বিরুদ্ধে গযনী সুলতানের অভিযানের খবর পেয়ে অন্তত চার হাজার বিশেষ ধরনের নৌকা তৈরী করেছিলো। জাঠদের ধারণা ছিলো জাঠবিরোধী অভিযানে নদীপথের বিভিন্ন বাধা থাকার কারণে গযনী বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে স্থলযুদ্ধ করতে বাহন হিসেবে নৌকা ব্যবহার করবে। ফলে গযনী বাহিনীকে তারা ডাঙায় উঠার আগে নদীতেই প্রতিরোধ করবে এবং নদীতেই সবার সলিল সমাধি ঘটাবে।

গোয়েন্দারা জানিয়ে ছিলো, জাঠ জনগোষ্ঠী তাদের স্ত্রী সন্তানসহ নদীর চরাঞ্চলের দ্বীপগুলোয় গিয়ে আস্তানা গেড়ে ছিলো এবং যুদ্ধের জন্যে তৈরী হচ্ছিলো। তখন নদীর চরাঞ্চল ছাড়া মূল ভূখণ্ডে জাঠ জনগোষ্ঠীর কোন লোকজন ছিলো না।

এ খবর পেয়ে সুলতান মাহমূদ তার সেনাপতিদের নির্দেশ দেন, পরিণতি যাই হোক, আমাদেরকে নদীতে ওদের মোকাবেলা করতে হবে অধিকাংশ ইন্ডিয়ান ও ইংরেজ ঐতিহাসিকের কাছে সুলতান মাহমূদের জাঠ বিরোধী নৌ যুদ্ধ তেমন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু যারা সেই সময়কার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সার্বিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করেছেন, তাদের বর্ণনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, জাঠদের বিরুদ্ধে পরিচালিত গযনী বাহিনীর নৌ যুদ্ধ ছিলো গযনী বাহিনীর

সামরিক উৎকর্ষ ও নৈপুণ্যের অন্যতম নিদর্শন। অবশ্য অধিকাংশ ঐতিহাসিকের বর্ণনায় ঠিক কোন জায়গায় এই যুদ্ধ হয়েছিলো তা সবিশদ বলা হয়নি। কিন্তু মানচিত্র গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, চন্নাব নদীর তীরে মুলতান শহর অবস্থিত। এর ভাটিতে এক জায়গায় ঝিলম নদী ও রাবী নদী গিয়ে চন্নাব নদীর সাথে মিলিত হয়ে বিশাল মোহনার সৃষ্টি করেছে। এরপর আরো কয়েকটি নদী এই নদীর সাথে মিলিত হয়ে সবগুলোর সম্মিলিত স্রোতধারা গিয়ে সিন্ধু নদীতে পড়েছে।

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে ছোট বড় কোন নদীতেই কোন বাধ ড্যাম সেতু তথা কোন প্রতিবন্ধকতা ছিলো না। ফলে স্রোতের পানি বন্ধনহীন ভাবে সব কিছু ভাসিয়ে নিতো। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায়, তখনকার সিন্ধুনদীর আকার ছিলো আরো বিশাল। এবং নদীর মাঝে প্রায় জায়গাই চর জেগে উঠেছিলো, যেগুলো ধারণ করেছিলো ছোট দ্বীপের আকার।

ঠিক কোন তারিখে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাস এ সম্পর্কে নীরব। জানা যায়, প্রায় চৌদ্দশ নৌযান নিয়ে মুলতান থেকে সুলতান মাহমূদের কাফেলা জাঠদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে। ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফারিশতা লিখেছেন, গযনী বাহিনীর নৌযানগুলো ছিলো খুব শক্ত। তদুপরি এগুলোর চারপাশে বর্শার মতো ধারালো লোহার পাত সেঁটে দেয়া হয়েছিলো। যাতে সাধারণ কাঠের নৌকা আঘাত করলে এগুলোর কোন ক্ষতি না হয় এবং কাঠের নৌকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানি থেকে নৌকায় কেউ যাতে আরোহণ করতে না পারে এজন্যও গযনীর নৌযানগুলোতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা রাখা হয়েছিলো। তাছাড়া প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে এই নৌ যুদ্ধেই প্রথম সুলতান মাহমূদ আগুনের ঢিল ব্যবহার করেছেন।

মূলত তখনকার দিনে সেগুলো ছিলো জ্বালানী ভর্তি মাটির ঘটি; যাকে বর্তমানের হ্যান্ড গ্রেনেডের সাথে তুলনা করা যায়। মুলতান থেকে জাঠদের অবস্থান ছিলো ভাটিতে। ফলে গযনী বাহিনীর নৌযানগুলো স্রোতের টানে বিনা কষ্টেই ভাটির দিকে ভেসে যাচ্ছিল। প্রতিটি নৌযান ছিলো সমদূরত্বে। মাঝে ছিলো সুলতান মাহমূদের নৌকা। তা ছাড়া দ্রুত খবর পৌছানোর জন্য কিছু নৌকা ছিলো সংবাদবাহক। এগুলো ছিলো দ্রুতগামী এবং তাতে মাল্লাও ছিলো বেশী।

পঞ্চনদের মিলনস্থল পেরিয়ে কিছুটা এগুতেই জাঠদের নৌবহর দেখা গেলো। জাঠদের নৌকাগুলো ছিলো অর্ধবৃত্তাকারে রাখা। তাদের নৌযানের

সংখ্যা এতোটাই বিশাল ছিলো যে, দেখে মনে হচ্ছিল পানি নয় শুধু নৌকা আর নৌকা। যেন বিশাল এলাকা জুড়ে নৌকার মেলা বসেছে। সুলতান মাহমূদ এক সারিতে আসা নৌকাগুলোর গতি থামিয়ে সবগুলোকে পাশাপাশি এক সারিতে স্থাপন করলেন, যাতে জাঠরা তাদেরকে ঘেরাও এর মধ্যে ফেলতে না পারে।

প্রথমে জাঠরা গযনী বাহিনীর দিকে তীর ছুঁড়ে আক্রমণের সূচনা করলো। এরপর সুলতান মাহমূদ আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। তিনি প্রতিটি নৌযানের মধ্যে পর্যাপ্ত জায়গা ফাঁকা রাখলেন, যাতে প্রতিটি নৌযান প্রয়োজনে ঘুরতে এবং অগ্রপশ্চাত হতে পারে। এক্ষেত্রে নদীর স্রোত ছিলো গযনী বাহিনীর পক্ষে কারণ তাদেরকে আক্রমণের জন্যে তেমন কষ্ট করতে হচ্ছিল না। কিন্তু জাঠদেরকে আক্রমণ করতে হতো স্রোতের বিপরীতে নৌকা বেয়ে। যাতে প্রচুর জনবল নিয়োগ করতে হতো। ফলে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের জন্যে জাঠরা ততোটা সুবিধা পাচ্ছিল না।

এক পর্যায়ে সুলতান মাহমূদ পূর্ণ শক্তিতে জাঠদের প্রতি তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। জাঠদের তীর ছিলো গযনীর তীরের চেয়ে আরো বেশী সর্বনাসী।

গযনী সৈন্যরা 'আল্লাহু আকবার' বলে বীর বিক্রমে হামলে পড়লো জাঠদের উপর। জাঠরাও তাদের ভাষায় চিৎকার দিচ্ছিল কিন্তু তাদের ভাষার চিৎকারের মধ্যে বাস্তবে উদ্দীপনামূলক কিছু ছিলো না। তবে তারা ছিলো লড়াকু ও নির্ভিক। দেখতে দেখতে অল্পক্ষণের মধ্যে উভয় বাহিনীর নৌযানের মধ্যে শুরু হলো সংঘর্ষ। গযনীর সৈন্যরা হঠাৎ করে তীরের পাশাপাশি জাঠদের নৌকার দিকে ছুড়তে শুরু করলো অগ্নিবাহি জ্বালানী ভর্তি ঘটি সদৃশ বোমা। এসব ঘটি নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি নৌযানে আগুন ছড়িয়ে পড়ছিলো এবং মানুষ আসবাব নৌকাসহ সবকিছুকেই গ্রাস করছিলো আগুন প্রাণ বাঁচাতে নদীতে ঝাপিয়ে পড়ছিলো জাঠযোদ্ধারা কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত এই অগ্নি বোমার আঘাতেও জাঠরা হতোদ্যম হলো না। তারা পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে মুসলমানদের নৌকায় আরোহণ করার চেষ্টা করছিল কিন্তু আরোহণ করতে গিয়ে তারা গযনী বাহিনীর নৌযানের বহিরাবরণে সেঁটে রাখা ধারালো ইস্পাতের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল আর উপর থেকে গযনীর তীরন্দাজ ও বর্শাধারীরা তাদের বর্শা ও বল্লম বিদ্ধ করে পানিতে ডুবিয়ে দিচ্ছিলো।

জাঠদের রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছিল নদীর পানি কিন্তু তবুও তারা দমার পাত্র ছিলো না। জাঠদের চার হাজার নৌকার বিশাল বহরে গযনী বাহিনীর চৌদ্দশ নৌকা হারিয়ে গিয়েছিলো, দৃশতঃ গঠন শৈলী ভিন্নতর না হলে জাঠদের নৌকার ভীড়ের মধ্যে গযনী বাহিনীকে খুঁজে বের করাই মুশকিল হতো।

নৌকার সাথে নৌকার সংঘর্ষ ঘটিয়ে নৌকা উল্টে দেয়ার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো গযনী সেনাদের। তারা এই কৌশল ব্যবহার করে কয়েকটি জাঠতরী উল্টে দিয়েছিলো কিন্তু জাঠদের তাতে কিছুই হলো না। দেখে মনে হচ্ছিলো এরা যেন পানির কীট। এরা উল্টে যাওয়া নৌকার নীচ থেকে ডুব দিয়ে দূরে ভেসে উঠে প্রতিপক্ষের নৌযানে আরোহণের চেষ্টা করছিলো। জাঠরা প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে একটা নতুন চাল দিলো। তারা দৃশ্যত পলায়নপর এমন ভাব বোঝানোর জন্য বহু নৌকা তীরে ভিড়িয়ে ডাঙায় নেমে গেলো। এবং কিছুটা ঘুরে নদীরকূল থেকে মুসলমানদের উপর তীর আক্রমণের কৌশল নিলো। কিন্তু জাঠদের এই কৌশলে কোন ফলোদয় হলো না। তাদের সম্ভাব্য এমন পরিস্থিতি মোকাবেলার ব্যবস্থা সুলতান আগেই করে রেখেছিলেন। তিনি রাতের অন্ধকারে দুই ইউনিট তীরন্দাজকে ডাঙায় নামিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন তীর থেকে দূরে ঘনজঙ্গল ও ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে। জাঠরা ওদিকে গেলে অজ্ঞাতস্থান থেকে তীর মেরে ইহলিলা সাঙ্গ করে দিতে। জাঠরা মোটেও জানতো না নৌযানের বাইরেও গযনীর সেনারা ডাঙায় লুকিয়ে থাকতে পারে। যেই না তারা ডাঙায় উঠে পথঘুরে মুসলমানদের উপর আক্রমণের চেষ্টা করলো অমনিতেই তারা গযনীর তীরন্দাজদের অজ্ঞাত তীর বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকলো। ফলে ফলাফল দাঁড়ালো, যেসব জাঠ ডাঙায় গিয়েছিলো এদের পক্ষে আর আক্রমণে ফিরে আসা সম্ভব হলো না। এদিকে নদীতে জাঠদের সবচেয়ে বেশী সমস্যা তৈরী করেছিলো গযনী বাহিনীর অগ্নিবোমা। অগ্নিবোমায় যেসব নৌযানে আগুন জ্বলে উঠেছিলো গযনীর মাল্লারা সেইসব জ্বলন্ত নৌকার দিকে অন্য জাঠ নৌকাগুলোকে ধাক্কা দিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছিলো ফলে একটির আগুন ছড়িয়ে পড়ছিলো আরেকটিতে।

কোন মানুষই পুড়ে মরতে চায় না। জাঠরা অগ্নিদগ্ধ হওয়া থেকে বাঁচার জন্য নদীতে ঝাপিয়ে পড়তো আর মুসলমানদের নৌকায় আরোহণের চেষ্টা করতে গিয়ে তাদের তীরবর্শা বিদ্ধ হয়ে নদীতে হাবুডুবু খেয়ে তলিয়ে যেতো। আর ডাঙায় গযনীর তীরন্দাজদের অজ্ঞাত তীরে বেঘুরে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছিলো

আবেগতাড়িত লড়াকু জাঠরা। তাদের শক্তি সামর্থ সাহস সবকিছুই ছিলো কিন্তু সুলতান মাহমূদের কৌশলের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছিলো জাঠদের দুঃসাহস বীরত্ব। সময় যতোই গড়াতে লাগলো সিন্ধুনদীর পানি জাঠদের রক্তে লাল হতে শুরু করলো। আহত জাঠরা পানিতে তরফাতে তরফাতে হাবুডুবু খেয়ে তলিয়ে যেতে লাগলো। সুলতান মাহমূদ তার মাল্লাদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা তরীগুলোকে তীরের কাছাকাছি রাখবে। এই নির্দেশের ফলে গযনীর মাল্লারা যখন তাদের তরীগুলোকে তীরের দিকে চাপাতে শুরু করলো যুদ্ধরত জাঠরা চাপে পড়ে গযনী বাহিনীর ঘেরাও-এর মধ্যে পড়ে এক জায়গায় আটকে গেলো। তারা না পারছিলো ডাঙায় উঠতে না পারছিলো গযনী সেনাদের উপর চড়াও হতে।

এর কিছুক্ষণ পরেই জাঠদের অবস্থা এমন হলো যে, তারা প্রতিরোধ যুদ্ধ চালানোর সামর্থও হারিয়ে ফেললো। যারা তখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। কারণ তাদেরকে সুবিন্যস্তভাবে যুদ্ধ করানোর মতো নেতৃস্থানীয় কেউ অবশিষ্ট ছিলো না। ফলে বেশীক্ষণ আর জাঠদের পক্ষে দৃঢ়ভাবে গযনী বাহিনীর মোকাবেলা করা সম্ভব হলো না। তারা বিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ভেবে অনেকেই নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে তীরে উঠে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছিলো, কিন্তু তীরে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো মৃত্যু। কারণ আগে থেকেই গযনীর সেনারা তীরের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কব্জায় নিয়ে নিয়েছিলো। যারাই তীরে উঠে ছিলো তাদের পক্ষে আর বেঁচে থাকা সম্ভব হলো না।

এক পর্যায়ে যখন নৌকা নিয়ে পালাতে শুরু করলো জাঠরা তখন গযনী বাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করতে লাগলো। এবং যখনই তারা কোন চর বা দ্বীপে উঠতে চেষ্টা করেছে গযনীর সেনারা সেই চরে অগ্নিবোমা নিক্ষেপ করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এভাবে চর ও দ্বীপের যেসব ঝুপড়িতে জাঠদের স্ত্রী সন্তানরা অবস্থান করছিলো সেগুলোও বোমার আগুনে পুড়তে লাগলো। আর নারী শিশুরা আর্তচিৎকার করে বাঁচার জন্যে পানিতে ঝাপিয়ে পড়লো কিন্তু তাদের আশ্রয় কিংবা বাঁচানোর মতো কোন সক্ষম জাঠ অবশিষ্ট ছিলো না। যেসব জাঠ প্রাণ ভয়ে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে ছিলো এদেরকেও ধরে ধরে গযনীর সেনারা নদীতে নয়তো নৌকায় নিক্ষেপ করছিলো। যেসব নারী শিশু বেঁচে ছিলো এরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেলো। বস্তুত সংঘবদ্ধ জাঠ জনগোষ্ঠী

বলে আর অবশিষ্ট কিছুই রইলো না। জাঠরা অতি আত্মবিশ্বাসে কচুকাটা হয়ে গেলো।

১০২৭ সালের জুলাই মাসে সুলতান মাহমূদ জাঠদের নির্মূল করে গযনী ফিরলেন। এবার চিকিৎসক তাকে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কারণ তখন অসুস্থতা ও দুর্বলতার ছাপ সুলতানের চেহারায় ফুটে উঠেছিলো। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এবার সুলতান যখন দ্বীপাঞ্চলে জাঠদের সাথে যুদ্ধ করতে গেলেন তখন চর দ্বীপের ম্যালেরিয়াবাহী মশা তার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর সংক্রমণ ঘটায়। কিন্তু যুদ্ধে থাকার কারণে তিনি তার অসুস্থতার কথা সফরসঙ্গী চিকিৎসকদের বলেননি।

তিনি গযনী ফিরে এলে দীর্ঘদিনের ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপে তার বুকে ব্যথা শুরু হয়ে গেলো। এক পর্যায়ে দেখা গেলো তার পাকস্থলীর কার্যকারিতাও রহিত হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে।

সুলতানের বয়স তখন ৫৭ বছর। এর মধ্যে ৪০ বছর তার কেটেছে যুদ্ধ ময়দান কিংবা রণ প্রস্তুতি কিংবা যুদ্ধ সফরে। এর মধ্যে যতটুকু সময় তিনি গযনী থেকেছেন তখন ব্যস্ত থেকেছেন শাসনযন্ত্র, সেনাবাহিনীর ঘাটতি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়ে। তাছাড়া চতুর্মুখী প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করে অভিষ্ট লক্ষে উপনীত হওয়ার পাহাড়সম দুশ্চিন্তা তাকে সারাক্ষণ পেরেশান করে রাখতো। সুলতানের আশংকাজনক শারীরিক অবনতি দেখে তার একান্ত চিকিৎসক একদিন উজির ও প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ আলতাঈ, সেনাপতি আরসালান জাযেব ও সেনাপতি আবুল হাসানকে একত্রিত করে বললেন—

সুলতান তার মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্যে আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন, কিন্তু এখন তার শারীরিক অবস্থা এতোটাই অবনতি ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে যে, না জানানোটাকে আমি খেয়ানত মনে করছি। কারণ সুলতান মাহমূদ এর সুস্থতা শুধু তার পরিবার পরিজন স্ত্রী সন্তানের ব্যাপার নয়।

সুলতান মাহমূদ মুসলিম উম্মাহর জন্য অমূল্য সম্পদ। আপনারা জানেন, মুহাম্মদ বিন কাসিমের বহু বছর পর গযনী একজন সুলতান মাহমূদ জন্ম দিয়েছে কিন্তু ততো দিনে হিন্দুস্তান আবারো মূর্তি পূজার অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিলো এবং বিন কাসিমের জ্বালানো ইসলামের আলো বিলীন হয়ে পড়েছিলো। এখন সেই ক্ষণজন্মা সুলতান মাহমূদও যাওয়ার পথে। না জানি তিনি চলে গেলে

আবার ইসলামের আলো নিষ্প্রভ হতে শুরু করে কি-না। কে জানে! আবার কখন আরেকজন বিন কাসিম আসবে আবার কখন আরেকজন সুলতান মাহমূদ আসবে। কে জানে আবার ইসলাম ও মুসলমানরা কাফেবদের রক্ত চক্ষুর শিকার হয়ে পড়ে কি-না?

কি হয়েছে সুলতানের? জানতে চাইলেন উজির।

সুলতানের যক্ষ্মা হয়েছে! সেই সাথে তার হৃদযন্ত্র ও পাকস্থলিও বিগড়ে গেছে। এটা আজ নয়, আমি তিন বছর আগেই এই রোগ সনাক্ত করেছি, তাকে সতর্ক ও সচেতন হওয়ার অনুরোধ করেছি। বিশ্রাম ও ঠিকমতো ওষুধ সেবনের পরামর্শ দিয়েছি কিন্তু তিনি কাজের চাপে দায়িত্বের ব্যস্ততায় নিজের শরীরের প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। শরীরের যতটুকু বিশ্রাম ও যত্ন নেয়ার দরকার ছিলো তারপক্ষে মোটেও তা করা সম্ভব হয়নি। বরঞ্চ বলা চলে নিজের ভেতরে তিনি রোগ লালন করেছেন।

চিকিৎসক শাইখুল আসফান্দ বলেন, আমাদের সুলতান বড় বড় শক্তিধরকে পরাজিত করেছেন অবশেষে মৃত্যুকেও কাবু করে ফেলেছিলেন। কারণ যতো দিন থেকে তিনি এই অসুখে আক্রান্ত সুলতান ছাড়া যে কোন মানুষ হলে এতো দিনে নির্ঘাত মৃত্যু বরণ করতো কিন্তু সুলতানের দেহকোষকে এই মরণব্যাধি ভেঙে দেয়ার পরও তিনি আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে একের পর এক যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন, যদিও রোগ তার দেহের প্রতিরোধ শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিচ্ছিলো। সুলতান প্রমাণ করেছেন স্থির লক্ষবস্তু, অবিচল আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় সংকল্প এবং উদ্দেশ্য মহান ও পবিত্র হলে শরীর অক্ষম হলেও আত্মশক্তি দিয়ে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

বস্তুত সুলতানকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অচলই বলা যায়। আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ! যে কোন মূল্যে আপনারা সুলতানকে সবকিছু থেকে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেহের প্রতি মনোযোগী ও চিকিৎসার প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্যে রাজি করান। এটা শুধু সুলতানের পরিবারের প্রতি নয়, গোটা মুসলিম দুনিয়ার প্রতি খুবই কল্যাণকর হবে। সুলতানের সুস্থতা হিন্দুস্তানের মুসলমানদের জন্যেও রহমত বয়ে আনবে। যারা শতশত বছর পর নিজের অতীত ঐতিহ্য ফিরে পেয়েছে এবং হিন্দুদের নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম করতে পারছে। সুলতানের শারীরিক অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তার বিছানা থেকেই উঠা উচিত নয়।

রোগ ও অসুস্থতা সুলতান মাহমূদকে শয্যাশায়ী করতে পারলো না। কারণ তার উজির ও সেনাপতিগণ শুধু তার আজ্ঞাবহ ছিলেন না, ছিলেন তার বন্ধুও। তারা যেমন ছিলেন তার সহকর্মী তেমনই ছিলেন তার বহু গোপন রহস্য ও ভেদের বাহক। একদল নিবেদিত প্রাণ সহকর্মী যোদ্ধা এবং জীবনত্যাগী সঙ্গীর বদৌলতেই তিনি নতুন নতুন ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তার সহযোদ্ধারা বিন্দুমাত্র তার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাননি। আনুগত্যে নির্দেশ পালনে সামান্য ত্রুটি করেন নি। জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও সুলতান সহকর্মী ও উপদেষ্টাদের পরামর্শে বদল করেছেন। তাদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে সম্মান করেছেন।

কিন্তু তারাই যখন সুলতানকে অসুস্থতাজনিত কারণে বিশ্রাম ও চিকিৎসার প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিলেন, তখন হেসে সকলের পরামর্শই তিনি উড়িয়ে দিলেন। তিনি তার ছেলেদের ডেকে বললেন, আমার মধ্যে যে শক্তি আছে তা আল্লাহ তোমাদের মধ্যেও দিয়েছেন। সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোল, ইচ্ছাশক্তি ও লক্ষ উদ্দেশ্যকে পবিত্র রাখো। শুধু আল্লাহর সাহায্য কামনা করো এবং কুরআনকেই জীবনের পাথেয় এবং দিক নির্দেশক বানাও। তাহলে আত্মশক্তিতে তোমরা বলীয়ান হতে পারবে।

সুলতান মাহমূদের পরিবার এবং তার সহকর্মী ও কর্মকর্তাগণ যখন তার অসুস্থতা নিয়ে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় নিপতিত ঠিক সেই সময় সুলতান মাহমূদ শারীরিক এই দুরবস্থা উপেক্ষা করে নতুন এক রণক্ষেত্রে রওয়ানা হলেন। সেই রণক্ষেত্র ছিলো অবশিষ্ট সেলজুকী জনগোষ্ঠী। এরা সংগঠিত হয়ে আবারো গযনী সালতানাতের প্রতি হুমকি হয়ে উঠেছিলো এবং গযনী সালতানাতের প্রতি নানা ধরনের হুঁশিয়ারীও উচ্চারণ করেছিলো। সেলজুকীদের শেষবারের মতো পদানত করে সুলতান মাহমূদ ইস্পাহান ও রায় এলাকাকে গযনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং তার ছেলে মাসউদকে বিজিত এলাকার শাসক নিযুক্ত করলেন।

অবশেষে তিনি হাওয়া বদল করতে বলখ চলে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর পক্ষে পূর্ণ বিশ্রাম নেয়া সম্ভব হলো না। রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকলেন এবং বিভিন্ন প্রদেশ সফর করলেন। এভাবে ১০২৯ সালের শীত ও গ্রীষ্মকাল তিনি বলখেই কাটালেন। এক পর্যায়ে এখানকার আবহাওয়াও তার প্রতিকূল হয়ে উঠলো। আসলে তখন দুনিয়ার আবহাওয়াই তার জন্যে অসহ্য হয়ে উঠেছিলো।

একদিন তিনি বলখ ছেড়ে গযনী চলে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কর্মকর্তারা তাকে বিশেষ বাহনে গযনী নিয়ে এলেন। কিন্তু গযনী পৌঁছেই তিনি জ্ঞান হারালেন। সুলতানের একান্ত চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করলেন। চিকিৎসকের দু'চোখ গড়িয়ে অঝোরধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তিনি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন সুলতান। সুলতান কিছু একটা বলার জন্যে তার হাত উপরে উঠালেন কিন্তু হাত উচিয়ে রাখতে পারলেন না। হাত অসাড় হয়ে তার বুকে আঁচড়ে পড়লো। অন্তিম অবস্থা দেখে তাঁর স্ত্রী ডাকলেন, ছেলেরা আব্বা আব্বা করে বহু ডাকলো কিন্তু সুলতানের পক্ষে সাড়া দেয়া সম্ভব হলো না। তখন শুধু তার শ্বাসটুকুই অব্যাহত ছিলো কথা বলার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো।

এমতাবস্থায় শহরের সবচেয়ে সুকণ্ঠের অধিকারী হাফেযদেরকে তার শিয়রের কাছে কুরআন তেলাওয়াতের জন্যে বসিয়ে দেয়া হলো। কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের সময় মাঝে মধ্যেই সুলতানের শরীর দুলে উঠছিলো এবং তার ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠছিলো। তাতে বুঝা যাচ্ছিলো, কুরআনের ভাষা তিনি শুনছিলেন এবং অনুধাবন করতে পারছিলেন। তেলাওয়াত শুরুর আগে তার শরীর কিছুটা নীলাভ ও বিবর্ণরূপ ধারণ করেছিল কিন্তু তেলাওয়াতের সাথে সাথে তা কমে আসে এবং একটা মায়াবী ও আলোকিত ভাব তার সারা দেহে ফুটে উঠে।

যে ক্ষণজন্মা অমিততেজী জগৎশ্রেষ্ঠ বীর অসংখ্য বীর পাহলোয়ানকে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন, অক্ষয় অজেয় পাথুরে খোদাদের যিনি টুকরো টুকরো করে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করেছিলেন, সেই দিগ্বিজয়ী বীর পুরুষ এখন স্থবির নিশ্চল। তাঁর দেহে একটু নড়াচড়া করার সামর্থও নেই।

১০৩০ সালের ৩০ এপ্রিল মোতাবেক ৪২১ হিজরী সনের ২৩ রবিউচ্ছানী বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটায় শেষবারের মতো ইতিহাসের এই বীরপুরুষের ঠোঁটে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠে এবং তখনই তিনি শেষবারের মতো নিঃশ্বাস ত্যাগ করে দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নেন।

মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসক ডুকরে কেঁদে উঠেন। মুসলিম ইতিহাসে মূর্তি সংহারী নামে খ্যাত সুলতান মাহমূদকে সেই রাতের ইশার নামাযের পর

মশালের আলোয় তার প্রিয় বাগান ফিরোজীবাগে দাফন করা হয়। এই বাগানে প্রায়ই তিনি বিশ্রাম করতেন, পায়চারী করতেন।

দাফনের পর সুলতান মাহমূদের ছেলেরা তার পিতার কবরকে কেন্দ্র করে বিশাল স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু এই কবরস্থানের প্রতি সাধারণ মানুষ ও পরবর্তীকালের মুসলিম বিদ্বেষীরা বহু অন্যায় ও অত্যাচার করেছে। অতি ভক্তরা বরকতের উদ্দেশ্যে তার কবরের মাটি ও স্থাপনার চৌকাঠ কেটে নিতে শুরু করে। ফলে বাধ্য হয়ে তার কবরটির চিহ্ন মুছে দিয়ে সেখানে আরো বহু কবর তৈরী করা হয়।

গযনীর মুসলিম সালতানাত নিঃশেষ হয়ে যখন এলাকাটি ইংরেজদের কবলে চলে যায়, তখন ইতিহাসের নিষ্ঠুর ও মুসলিম বিদ্বেষী ইংরেজ লর্ড মৃত সুলতান মাহমূদের সাথে সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম আচরণ করেন। তিনি তার কবরে নির্মিত স্থাপনার প্রধান দরজাটি খুলে হিন্দুস্তানে নিয়ে আসেন। ইংরেজ লর্ড-এর ধারণা ছিল সুলতান মাহমূদ এই দরজাটি হিন্দুস্তানের সোমনাথ মন্দির থেকে নিয়েছিলেন। গযনী শহর থেকে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত ফিরোজীবাগের সেই ঐতিহাসিক কবরস্থানের আজ আর কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই। জায়গাটি একটি পরিত্যক্ত ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। কবর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও যতো দিন পৃথিবীর বুকে সূর্য উঠবে, মানুষ থাকবে, মুসলমান থাকবে ততোদিন অসংখ্য অগণিত মুসলমান সুলতানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে, আর মক্কা ও মদীনায় তার প্রেরিত শিবমূর্তির অবশিষ্ট টুকরোগুলো স্মরণ করিয়ে দেবে সুলতান মাহমূদ ইসলামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। অম্লান তাঁর কীর্তি, অনিঃশেষ তাঁর ঈমানী চেতনা। আজো তাঁর চেতনা ঈমানের দীপ্তি ছড়ায়। আল্লাহ আখেরাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আমীন!

সমাপ্ত

naJmul haider-01911031184 ▪ THE LIGHT

VAROT OVIJAN : 5 ISBN 984-70109-0000-3 SET